ঢাকা নগরীর মসজিদ স্থাপত্য

M.Phil.

শবনম ফারুকী

B
726.20954922
FAD ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

M.Phil.

382729

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা নগরীর মসজিদ স্থাপত্য

(প্রাকমুঘল ও মুঘল যুগের নিদর্শনের একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা)

শবনম ফারুকী

Dhaka University Library
382729

GIFT

382729

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, ফিল, ডিগ্রীর জন্য উপস্থাপিত

মে, ১৯৯৫

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে, 'ঢাকা নগরীর মসজিদ স্থাপত্য' (প্রাক্ মুঘল ও মুঘল যুগের নিদর্শনের একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা) শীর্ষক এম, ফিল থিসিসটি সম্পূর্ণভাবে আমার একক প্রচেষ্টায় লেখা একটি মৌলিক গবেষণা কর্ম। উপস্থাপিত থিসিসের সম্পূর্ণ পাণ্ডুলিপি বা এর কোন অংশ বিশেষ কোন প্রতিষ্ঠান বা সাময়িকীতে প্রকাশ করার জন্য প্রদত্ত হয়নি এবং এটি কোন ডিপ্লোমা, ডিগ্রী অথবা বৃত্তির জন্য ইতিপূর্বে কোথাও পেশ করা হয়নি।

শবনম ফারুকী

শবনম ফারুকী

382729

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Institutional Repository

সূচীপত্র

	পৃষ্ঠা
সার সংক্ষেপ	I
কৃতজ্ঞতা স্বীকার	III
ভূমিকা	১
প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি	৭
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকার মসজিদ স্থাপত্য	১৮
তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সুলতানী ও মুঘল যুগের মসজিদের রীতিগত শ্রেণী বিন্যাস	৭৯
চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের অবস্থান ও মুঘল ঢাকার ক্রমবিকাশ	৮৮
পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের সংস্কার ঃ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি	১০২
উপসংহার	১১৯
মানচিত্র, ভূমিনক্সা ও চিত্র	১ - ৮০

382729

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার

(পৃথক পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করা হয়েছে)

গ্রন্থপঞ্জী	১২৫

Dhaka University Institutional Repository

সারসংক্ষেপ

'ঢাকা নগরীর মসজিদ স্থাপত্য' শীর্ষক থিসিসে প্রাকমুঘল ও মুঘল যুগের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে ঢাকায় সুলতানী যুগের মসজিদ সংখ্যায় কম থাকায় মুঘল যুগের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বেশী।

মসজিদ স্থাপত্যের আলোচনার প্রারম্ভে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরীর বিকাশ সম্পর্কে একটি সামগ্রিক আলোচনা করা হয়েছে। লক্ষ্য করা যায় যে, সুলতানী যুগের সংক্ষিপ্ত পরিসরের ঢাকায় ১৬১০ সালে মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে ক্রামন্বয়ে ঢাকার বিকাশ হতে থাকে এবং এই বিকাশ প্রক্রিয়া ১৭১৭ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। ১৭১৭ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হবার ফলে ঢাকার গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং উপমহাদেশে ইংরেজ শাসনের সুচনা হলে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া এক রকম রুদ্ধ হয়ে আসে। এরপর ঢাকার প্রাধান্য ফিরে আসে ১৯৪৭ সালের পর। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হিসেবে ঢাকার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। এরপর থেকে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া আরো তরান্বিত হয়েছে।

সুলতানী যুগ থেকে ঢাকায় মসজিদ নির্মাণের যে প্রক্রিয়া সূচনা হয় মুঘল যুগে তা হয় ব্যাপকতর। মুঘল যুগে ঢাকায় অনেকগুলো মসজিদ নির্মিত হয়। তবে কালের বিবর্তনে আজ সেসব মসজিদের খুব কম সংখ্যকই টিকে রয়েছে। সুলতানী আর মুঘলযুগের সর্বমোট ৩৩ মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পুরানো এসব মসজিদ সম্পর্কে প্রাপ্ত সম্ভাব্য তথ্য এবং বর্তমান পর্যবেক্ষণ -এ দু'এর সমন্বয়ে এক একটি মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

মসজিদগুলোর রীতিগত শ্রেণীবিন্যাসে লক্ষ্য করা যায় যে, সুলতানী যুগের কেবল তিনটি মসজিদ বর্তমানে থাকায় এক্ষেত্রে বিরাট শূন্যতা রয়ে গেছে। মুঘলযুগের মসজিদগুলোর প্রতি দৃকপাত করলে দেখা যাবে ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যে বেশ অনেকগুলো রীতির সূচনা হয়েছিল। তবে এসব মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে খুব একটা পার্থক্য নেই। দু'একটি মসজিদে অবশ্য ব্যতিক্রমধর্মী স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য দৃষ্টি গোচর হয়।

ঢাকায় পুরানো মসজিদগুলোর অবস্থান লক্ষ্য করে মুঘলযুগে ঢাকার ব্যাপ্তি এবং জনসংখ্যার ক্রমবিকাশের একটি ধারণা পাওয়া যায়। সুলতানী যুগে ঢাকা গড়ে উঠেছিল মূলতঃ বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর-পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের এলাকা নিয়ে। মুঘল ঢাকা গড়ে উঠে প্রধানতঃ বাবু বাজারের পশ্চিম দি'ক দিয়ে। তবে বাবুবাজারকে সুলতানী ও মুঘল ঢাকার চুড়ান্ত সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, লক্ষ্য করা গেছে বাবুবাজারের পূর্ব এবং উত্তর পূর্বেও মুঘল বসতি ছিল। ইসলামপুর, চকবাজার, লালবাগ, আজিমপুর, মুহাম্মদপুর, প্রভৃতি মুঘলযুগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে মসজিদের সংখ্যাধিক্য থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, এসব স্থানে জনবসতি ছিল বেশী।

মসজিদগুলোর বর্তমান অবস্থাভেদে সামগ্রিকভাবে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়। প্রথম শ্রেণীভুক্ত মসজিদগুলোর সংস্কার ও সংরক্ষণ ভাল হচ্ছে। এই শ্রেণীর মসজিদগুলো মূলতঃ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন। দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত মসজিদগুলোতে দেখা যায় পুরাতন মসজিদের নানারূপ অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদই এই শ্রেণীর অন্তর্গত। তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত মসজিদগুলোতে আদি

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের কোন চিহ্নই বর্তমানে টিকে নেই। সম্পূর্ণ নবরূপায়ন ঘটেছে এসব মসজিদের। এই শ্রেণীর অন্তর্গত মসজিদের সংখ্যাও অনেক।

মসজিদগুলোর অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বেশ কিছু কারণ ক্রিয়াশীল। এসব কারণের মধ্যে জনসচেতনতা, আর্থিক আনুকূল্য ও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা এই তিনটি বিষয়ের অভাবকে মুখ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সুতরাং এসকল ক্ষেত্রে অভাবপূরণের জন্য যদি সচেষ্ট হওয়া যায় তাহলে আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন গুলোকে ক্রমবিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

এই থিসিসের বক্তব্যকে সহজে উপলব্ধি করার উদ্দেশ্যে এখানে মানচিত্র, ভূমিনক্সা ও ছবি সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বস্তুতঃ স্থাপত্য এমন একটি বিষয় যা উপলব্ধি করার জন্য কেবল লেখনী যথেষ্ট নয়।

থিসিসটি নিম্নোক্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ-

প্রথম পরিচ্ছেদ ঃ ঐতিহাসিক পটভূমি

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকার মসজিদ স্থাপত্য

তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ সুলতানী ও মুঘলযুগের মসজিদ স্থাপত্যের রীতিগত শ্রেণীবিন্যাস

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ঃ মসজিদের অবস্থান ও মুঘল ঢাকার ক্রমবিকাশ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ ঃ ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের সংস্কার ঃ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার গবেষণার কাজটি সম্পন্ন করার জন্য আমি সবচেয়ে প্রথমে কৃতজ্ঞতা জানাই পরম করুনাময়ের কাছে। এই কাজ সম্পন্ন করার ব্যাপারে কয়েকজনের নাম বিশেষকরে উল্লেখ করতে হয় যাদের সাহায্য ও প্রেরণা সর্বমুহূর্তে উৎসাহের বারি সিঞ্চন করেছে।

আমি কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করি আমার তত্ত্বাবধায়ক ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় প্রফেসর আব্দুল মমিন চৌধুরীকে। থিসিস পরিকল্পনা, উপকরণ সংগ্রহ, পরিচ্ছেদ বিন্যাস - সর্বক্ষেত্রে তাঁর নিরলস তত্ত্বাবধান, সার্বক্ষণিক সাহায্য ও মূল্যবান উপদেশ এই গবেষণা কার্যের যাত্রাপথে পাথেয় হয়ে ছিল।

মসজিদের চিত্র সংগ্রহে 'ঢাকা নগর যাদুঘরের' সাহায্য প্রদানের জন্য ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর মুনতাসীর মামুন এবং স্থাপত্য সংরক্ষণ বিষয়ে নির্দেশনা দেয়ার জন্য বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের স্থাপত্য বিভাগের প্রফেসর আবু হায়দার ইমাম উদ্দীনের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আমাকে এম, ফিল বৃত্তি প্রদান করে আমার গবেষণার কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় সহায়তা করেছেন।

মসজিদের ছবি তোলা এবং ভূমিনক্সা প্রনয়নের ক্ষেত্রে স্থাপত্য বিভাগের ছাত্র আবু সাঈদ সালেহ, হাসিবুশ শহীদ এবং রুমানা কবীরের সহযোগিতা আমি পেয়েছি।

বিভিন্ন এলাকার মসজিদ পর্যবেক্ষণকালে মসজিদের সম্মানিত ইমাম সাহেব, মসজিদ কমিটির সদস্যবৃন্দ ও স্থানীয় এলাকাবাসীদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার কথা আমি স্মরণ করছি।

থিসিস মুদ্রণে জনাব রেজাউল হক এবং মুস্তাকিম বিল্লাহ্ আমাকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন।

আমার আত্মীয় স্বজন ও বন্ধুরা আমাকে নিরন্তর উৎসাহ জুগিয়ে গেছেন। এছাড়া আমাকে সার্বক্ষণিক অনুপ্রেরণা দিয়েছেন আমার মা।

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

স্থাপত্য এমন একটি মাধ্যম যার মধ্যে একটি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, শৈল্পিক ধ্যান–ধারণা এবং সামাজিক মূল্যবোধ এতটা সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যেমনটি অন্য কোন মাধ্যমে সম্ভব নয়। অনাদিকাল থেকে মানুষের সৃষ্ট স্থাপত্যে তার রুচিবোধ আর আশা আকাঙ্খার ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে, তাই স্থাপত্য নীরিক্ষণে অনুধাবন করা যায় আজ থেকে বহুকাল পূর্বের মানুষের চিন্তাচেতনার স্বরূপ।

বিশ্বের স্থাপত্যের ইতিহাসে মুসলিম স্থাপত্য এক বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রকৃতপক্ষে ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবে কোন উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম ছিল না। মুসলমান বিজেতারা বিভিন্ন দেশ জয় করার পর বিজিত দেশ সমূহের উন্নত স্থাপত্য কৌশল আয়ত্ত করেন এবং তারই সমন্বিত ব্যবহারে গড়ে উঠে মুসলিম স্থাপত্য। তথাপি বিভিন্ন দেশের মুসলিম স্থাপত্যের মধ্যেই স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূলতঃ স্থাপত্যের ওপর প্রতিটি দেশের ভূপ্রকৃতি, আবহাওয়া, নির্মাতার রুচিবোধ এবং সে দেশে প্রাপ্ত উপকরণ বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলে। এজন্য মুসলিম স্থাপত্যের একটি বিশেষ অঙ্গন মসজিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়, কিছু মূলনীতি অনুসরণ করা হলেও প্রতিটি দেশের মসজিদ স্থাপত্যই নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে।

ইসলাম ধর্মে কোন মূর্তি বা জীবন্ত প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা থাকায় মুসলিম স্থাপত্যের নির্মাতা কারিগরদের শিল্পী সত্তার বিকাশ ঘটে প্রধানতঃ ফুলপাতা আর জ্যামিতিক নক্সার মাধুর্যে, মোজাইক আর টাইলস্ এর বর্ণচ্ছটায়। এমনকি আরবী লিপির নমনীয়তাকে ব্যবহার করে তারা একে একটি চমৎকার অলংকরণ শিল্পে রূপান্তরিত করেন।

এই উপমহাদেশের মুসলিম স্থাপত্য স্বতন্ত্র এক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। এদেশের প্রাক মুসলিম স্থাপত্য কলা ছিল সুউন্নত। ফলে, নতুন একটি ভাবধারা হিসেবে যখন মুসলিম স্থাপত্যের আগমন ঘটল তখন প্রথমিক পর্যায়ে এদেশের কারিগরদের সেই নতুন ধারার রূপায়ন ঘটাতে কিছুটা অসুবিধা হলেও অল্পদিনের মধ্যেই তাদের হাতের নৈপুন্য আর উন্নত নির্মাণ শৈলীর পরিচায়ক হিসেবে নির্মিত হতে থাকে মুসলিম স্থাপত্যের এক একটি ইমারত। এখানে যেসব ইমারত নির্মিত হয়, সৌন্দর্য আর উন্নত নির্মাণ কুশলতার পরিচায়ক সেসব ইমারতের কোন কোনটি সমগ্র বিশ্বের বিস্ময়ের বস্তু। প্রকৃতপক্ষে, চমৎকার পাথর খোদাই এর কারুকাজই ভারতীয় মুসলিম স্থাপত্যের ইমারতগুলোকে অনন্যরূপ দিয়েছে। তবে ভারত অথবা পাকিস্থানের মুসলিম স্থাপত্যের ইমারত সমূহ নানা রকম পাথর খোদাই এর কারুকাজ মন্ডিত হলেও বাংলাদেশের স্থাপত্যে তেমন পাথর খোদাই এর কাজ লক্ষ্য করা

Dhaka University Institutional Repository

যায় না কারণ, এখানে পাথর ছিল দুষ্প্রাপ্য। বাংলাদেশের স্থাপত্যের উপকরণ বলতে একমাত্র ইটকেই বোঝাতো। এদেশের ভূপ্রকৃতি এখানকার স্থাপত্যের চরিত্র নির্ধারণ করে দিয়েছিল। উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে উন্মুক্ত (open variety) মসজিদ নির্মাণ করা সম্ভব হলেও বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তেমনটি সম্ভব ছিল না। কারণ, অতিবর্ষণের জন্য এখানে মসজিদগুলো আচ্ছাদিত পরিকল্পনানুযায়ী (colse variety) নির্মাণ করতে হয়। সুতরাং একদিকে অতিবর্ষণ অন্যদিকে ক্ষণস্থায়ী উপকরণ–এই উভয়বিধ কারণে বাংলাদেশের স্থাপত্য স্থায়িত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়। তথাপি বলা যায় এই ক্ষণস্থায়ী উপকরণ দিয়েই স্থাপত্যে সৌন্দর্য আনার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা করে গেছেন এদেশের নির্মাতা কারিগরেরা। নানারকম প্রতিকূলতার মধ্যদিয়ে এখনো সুলতানী আর মুঘল যুগের যেসব স্থাপত্য কর্ম টিকে রয়েছে, সেসব স্থাপত্য কর্মের গঠন শৈলী আর চমৎকার অলংকরণ দেখে বিস্মিত হতে হয়।

বস্তুতঃ এদেশের স্থাপত্যের অলংকরণ বলতে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ (টেরাকোটা) বোঝায়। বাংলাদেশে প্রাচীন কাল থেকেই ইমারতের অলংকরণ হিসেবে টেরাকোটা ব্যবহৃত হয়ে এসেছে। ময়নামতি, পাহাড়পুর, মহাস্থান গড়ের বৌদ্ধ বিহারে যেমন টেরাকোটার অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় তেমনি হিন্দু মন্দিরেও একই অলংকরণ রীতি ব্যবহৃত হয়েছে। আবার এদেশে যখন মসজিদ নির্মাণ আরম্ভ হলো তখন মসজিদের গাত্রালংকারে সুপ্রচলিত এই মাধ্যমটিকেই গ্রহণ করা হয়। তবে মসজিদের অলংকরণের নক্সাগুলো (motif) ছিল মূলতঃ ফুলপাতা আর জ্যামিতিক নক্সা নির্ভর। সবুজ প্রকৃতির মধ্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ সমৃদ্ধ লাল ইটের মসজিদগুলো দৃষ্টি নন্দন ছিল নিঃসন্দেহে। মুঘল যুগে ঢাকার স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ পরিহার করা হলেও ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানের মসজিদে সুলতানী ও মুঘল উভয় যুগেই টেরাকোটার প্রধান্য লক্ষ্য করা যায়।

উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানের বিশেষতঃ দিল্লী, আগ্রা, লাহোরের মুসলিম স্থাপত্যের সাথে বাংলার স্থাপত্যের হয়তো তুলনা করা চলে না তথাপি একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বাংলার স্থাপত্যের একটি স্বকীয়রূপ ছিল এবং এই স্বকীয়তা কেন্দ্রীয় স্থাপত্য রীতিকে প্রভাবিত করেছিল। কেন্দ্রীয় স্থাপত্য রীতির কোন কোন ইমারতে বাংলার দোচালা কুটিরের ছাদের অনুরূপ বাকানো প্রান্ত ইমারতের কার্নিশে (মতি মসজিদ, ১৬৬২) লক্ষ্য করা যায়।

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলায় স্বাধীন সুলতানী আমলের সূচনা লগ্নে সোনার গাঁর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং মোটামুটিভাবে তখন থেকেই সোনার গাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হিসেবে ঢাকায় মুসলমানদের পদযাত্রা শুরু হয় বলে অনুমান করা যায়। ১৬১০ সালে ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং এই গুরুত্ব ১৭১৩ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এই সময়ের মধ্যে ঢাকায় ব্যাপক জনসমাগম ঘটে এবং বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তি নির্মিত হয়।

ঢাকায় মুসলিম স্থাপত্যের ইমারত সমূহের মধ্যে দূর্গ, মসজিদ, সমাধি, সরাইখানা, পুল প্রভৃতি

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখযোগ্য। কালের বিবর্তনে এসব স্থাপত্যকীর্তির খুব কম সংখ্যকই বর্তমানে টিকে রয়েছে এবং লক্ষ্য করা যায় যে, বর্তমানে ঢাকায় টিকে থাকা স্বল্প সংখ্যক স্থাপত্যকীর্তির মধ্যে মসজিদই সংখ্যায় বেশি রয়েছে। ঢাকার সুবাদার আর দিওয়ানেরা মসজিদ নির্মাণ করে গেছেন অকাতরে। তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছেন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, বণিক-ব্যবসায়ী প্রমুখেরা। এজন্য অন্যান্য ইমারতের তুলনায় মসজিদ বেশি নির্মিত হয়। তবে সে সময় মসজিদ কেবল উপাসনার উদ্দেশ্যেই নির্মিত হতো না, মসজিদের নানাবিধ ভূমিকা ছিল। যেমন, আবাসিক মাদ্রাসা-মসজিদ হিসেবে ঢাকায় কয়েকটি দ্বিতল মসজিদ নির্মিত হয়। এছাড়া দ্বিতল মসজিদের নীচতলার ঘরগুলো দোকান হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মসজিদ বেশি নির্মিত হলেও এখানকার আদ্র জলবায়ু ও ক্ষণস্থায়ী উপকরণের কারণে মসজিদগুলো বিলীন হয়ে যাওয়ার কথা যেমনটি অনেক স্থাপত্যের ক্ষেত্রেই ঘটেছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যায় যে, ঢাকায় সুলতানী এবং প্রধানতঃ মুঘল যুগের টিকে থাকা স্থাপত্যকীর্তি বলতে মসজিদই প্রধান। এ ক্ষেত্রে বলা যায় ধর্মীয় ইমারত বিধায় জনসাধারণ মসজিদগুলোর রক্ষণাবেক্ষনে অনেকটা সক্রিয় ছিলেন। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ যথাযথ ভাবে রক্ষার বিষয়ে সচেতনতার অভাবের কারণে তারা মসজিদগুলোর সংস্কার বা সম্প্রসারণ করতে গিয়ে এর আদিরূপ বিনষ্ট করেছেন। এজন্য বলা যায় যে, আমাদের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের নিদর্শনগুলো এক অর্থে বিদ্যমান হয়েও যেন অদৃশ্য।

বর্তমান গবেষণার লক্ষ্য সুলতানী আর মুঘল যুগের মসজিদ স্থাপত্যের একটি ঐতিহাসিক সমীক্ষা। গবেষনার ক্ষেত্র ঢাকা নগরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। উল্লেখ্য যে, ঢাকায় সুলতানী যুগের মসজিদের স্বল্পতার কারণে মুঘল যুগের মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে বেশি।

মুঘল সুবার রাজধানী ঢাকায় এক সময় যে অনেক মসজিদ নির্মিত হয়েছিল তা চার্লস ড' য়লীর গ্রন্থ (১৮২৪-৩০ সালে প্রকাশিত) থেকেও অনেকটা প্রমাণিত হয়। তিনি ঢাকার বিভিন্ন স্থাপত্য কীর্তির উল্লেখ প্রসঙ্গে মসজিদের সংখ্যার উল্লেখ করেন দু'শ তেত্রিশটি। তবে তিনি এসব মসজিদের বিশদ বর্ণনা বা অবস্থানের (location) উল্লেখ করেননি। তিনি সুনির্দিষ্টভাবে যে ছয়টি স্থানের মসজিদের কথা বলেন তার মধ্যে বর্তমানে কেবল সাতগম্বুজ মসজিদ ও চক বাজার মসজিদকে সনাক্ত করা যায়। তাঁর উল্লেখিত মগবাজার মসজিদ এবং বর্তমানে মগবাজারে মুঘল যুগে নির্মিত (১৬৭০) যে মসজিদ রয়েছে তা একই মসজিদ কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ড'য়লী অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে অধিকাংশ স্থাপত্যকীর্তিই ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। সুতরাং, ড'য়লীর কালেক্টর থাকাকালীন সময় থেকে (১৮০৮-১১) বর্তমান সময় পর্যন্ত এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে অধিকাংশ পুরোনো মসজিদই যে বিলীন হয়ে গেছে তা নিশ্চিত রূপে বলা যায়।

সৈয়দ আওলাদ হাসান, রহমান আলী তায়েশ, সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর, আহমদ হাসান দানি প্রমুখদের গ্রন্থে (যথাক্রমে ১৯০৪, ১৯১০, ১৯৫৬, ১৯৬২ সালে প্রকাশিত) অধিক সংখ্যক পুরোনো মসজিদের উল্লেখ পাওয়া যায় না। এদের বর্ণনার মসজিদগুলো বর্তমানে টিকে রয়েছে তা ধরে নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়। মোহাম্মদ আব্দুর রশীদ তার 'ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকায়' (১৯৮৭ সালে

Dhaka University Institutional Repository

প্রকাশিত) নতুন পুরোনো মিলিয়ে যে তের'শ মসজিদের উল্লেখ করেন তার মধ্যে পূর্বে উল্লেখিত ঐতিহাসিকদের বর্ণনার মসজিদ ব্যতীত আরো কিছু পুরোনো মসজিদের সন্ধান পাওয়া যায়। সুতরাং নতুন পুরোনো উৎস থেকে সর্বমোট ৩৩টি মসজিদ আমাদের আলোচনায় আনা হয়েছে।

এই ৩৩টি মসজিদ সরেজমিনে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে অধিকাংশ মসজিদই পুরোনো ঢাকায় অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে মুঘল আমলে রাজধানী ঢাকা বলতে বর্তমানের পুরোনো ঢাকাই ছিল প্রধান। তবে বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ধরে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকেও বেশ কয়েকটি মসজিদের অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদ পর্যবেক্ষণ কালে এর যথার্থ অবস্থান (location) জানার বিষয়টি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, বর্তমানে ঢাকায় এত অধিক সংখ্যক মসজিদ রয়েছে যে সঠিক অবস্থান জানা না থাকলে কাঙ্খিত ঐতিহাসিক মসজিদটি খুঁজে বের করা দুরূহ ব্যাপার। পর্যবেক্ষণ কালে যে সকল বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ (ক) মসজিদের অবস্থান (location); (খ) আদি মসজিদের কাঠামোগত দিক ও অলংকরণ; (গ) সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন; (ঘ) ভূমিনক্সা ও ছবি; (ঙ) পারিপার্শ্বিক এলাকা এবং (চ) স্থানীয় বয়োজ্যেষ্ঠ্য ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার। শেষোক্ত বিষয়টির সংযোজন এজন্য করা হয় যে, পর্যবেক্ষণ করে লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক মসজিদই বর্তমানে তার আদিরূপে নেই। সুতরাং এলাকার বয়স্ক ব্যক্তিরা তাদের শৈশব অথবা কৈশরে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া মসজিদকে কিরূপ দেখেছেন তা থেকে মসজিদের আদিরূপের একটি চিত্র দাড় করানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

পর্যবেক্ষণ কালে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় তার মধ্যে প্রথমেই বলতে হয় পুরানো মসজিদগুলোর সঠিক অবস্থান বের করার মত কোন guide map না থাকায় কোন কোন মসজিদ খুঁজে বের করা রীতিমত দুঃসাধ্য ব্যপার। কারণ, পুরানো অনেক মসজিদই এখন সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। ফলে সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে আদি মসজিদের সন্ধান করতে গেলে বিভ্রান্তিতে পড়তে হয়। পুরানো মসজিদের অনেকগুলোই আজ আর পূর্বের নামে পরিচিত নয় এবং অনেক ক্ষেত্রে এদের নির্মাণ তারিখের কোণ উল্লেখ নেই। সুতরাং গঠন শৈলীর দিক থেকে না হোক অন্ততঃ নাম অথবা নির্মাণ তারিখ দেখে মসজিদের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করা যাবে তারও কোন উপায় নেই। এজন্য পুরানো মসজিদের যথার্থ অবস্থান (location) জানা থাকলে এটুকু বোঝা যাবে যে বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এই মসজিদটিই মুঘল অথবা সুলতানী আমলের প্রাচীন মসজিদ।

দ্বিতীয়তঃ অনেকক্ষেত্রেই মসজিদের ছবি তুলতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে মসজিদের চারপাশ ঘিরে দোকানপাট আর দালান কোঠা এমনভাবে উঠেছে যে সম্পূর্ণ মসজিদের ছবি তোলা আদৌ সম্ভব নয়। আবার মসজিদের সম্প্রসারণ এমনভাবে করা হয়েছে যে মসজিদের আদি অংশকে পৃথক করে চিহ্নিত করা যায় না। কাজেই এসকল প্রতিবন্ধকতা না থাকলে এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ হয়তো আরো সুষ্ঠু হতো।

Dhaka University Institutional Repository

আলোচ্য সমীক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গেলে বলা যায় ঢাকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের মধ্যে অধিকাংশই বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং বর্তমানে স্বল্প সংখ্যক পুরোনো মসজিদ যা অবশিষ্ট রয়েছে তাও যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে ক্রমবিলুপ্তির পথে। সুতরাং এসব ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্যগুলোর যতটুকু অবশিষ্ট রয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থা লিপিবদ্ধ করে রাখলে ভবিষ্যতের জন্য তা দলীল হয়ে থাকবে। এছাড়া আমাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ রক্ষার বিষয়ে জনমনে সচেতনতার উন্মেষ ঘটাতে এই সমীক্ষা সাহায্য করতে পারে বলে আশা করা যায়।

উল্লেখ্য যে, মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করাই গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য নয় বরং মসজিদগুলো নিরীক্ষণ করে তা থেকে সামাজিক উপাদান আহরণের প্রচেষ্টা এই গবেষণার অন্যতম চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করেছে। বস্তুতঃ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় অবস্থিত মসজিদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে মুঘলযুগে বিভিন্ন এলাকার গুরুত্ব এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা করা যায়। এছাড়া সুলতানী আর মুঘলযুগে ঢাকার ক্রমবিকাশের চিত্রও মসজিদগুলোর অবস্থান লক্ষ্য করে সুস্পষ্ট হয়। দেখা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ধরে ক্রমান্বয়ে পশ্চিম দিকে ঢাকার বিকাশ হয়েছিল। অন্যদিকে শহরের উত্তর দিকে স্বল্প সংখ্যক মসজিদের অবস্থান এটাই প্রমাণ করে যে, সেদিকে জনবসতি ছিল কম।

আলোচ্য সমীক্ষায় পুরোনো মসজিদ সমূহের সংরক্ষণের বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। কারণ, লক্ষ্য করা গেছে যে, অল্প কিছু মসজিদ ব্যতীত ঢাকার অধিকাংশ পুরোনো মসজিদই আদি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে বিলুপ্তির পথে ক্রমশঃ এগিয়ে যাচ্ছে। ঐতিহ্যবাহী ঢাকা নগরীর গৌরবময় ইতিহাসকে তুলে ধরতে হলে এসব প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ রক্ষার বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া প্রয়োজন।

পরিশেষে বলা যায়, 'মসজিদের নগরী ঢাকা' এই নামে ঢাকার যে পরিচিতি তা একারণেই যে ঢাকাই সম্ভবতঃ একমাত্র নগরী যেখানে এত অধিক সংখ্যক মসজিদ রয়েছে। সেই সুলতানী আমল থেকে এখানে মসজিদ নির্মাণের যে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে তা অদ্যাবধি চলছে। তবে অতীত কাল থেকে বর্তমান কালের মসজিদের মধ্যে লক্ষ্যনীয় পার্থক্য এই যে, পূর্বেকার মসজিদগুলো ব্যবহারিক দিকটি ছাড়াও শিল্প সংস্কৃতির পরিচয় বহন করতো। যার ফলশ্রুতিতে আজ সে সব পুরোনো মসজিদ প্রত্যক্ষ করে পূর্বের স্থাপত্য ও শৈল্পিক ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু আধুনিক কালের মসজিদে ব্যবহারিক উপযোগিতাকেই মূখ্য করে দেখা হয়, ঐতিহ্য হয় এখানে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত। বর্তমানে ইমারত নির্মাণে উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করার সাথে সাথে সবকিছুকে আধুনিক রূপ দেয়ার একটি প্রবনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং এই প্রবনতাটি এদেশের ঐতিহ্য সম্পর্কে আমাদের বিস্মৃত করে তুলছে ক্রমশঃ । দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মসজিদের পূর্ব দিকে প্রবেশ পথের একটি প্রাধান্য রয়েছে এবং এই বৈশিষ্ট্য পুরোনো সকল মসজিদেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু আধুনিক অনেক মসজিদেই এই বৈশিষ্ট্যটি অনুসরণ করা হয় না। এখন অনেক মসজিদেরই প্রধান প্রবেশ পথ কখনো উত্তর দিকে অথবা দক্ষিণ দিকে লক্ষ্য করা যায়। অলংকরণে ব্যয়বহুল মোজাইক ও টালি ব্যবহার না করে টেরাকোটা ব্যবহার করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

একটি জাতি হিসেবে নিজেদের উন্নত করতে হলে স্বদেশের ইতিহাস আর ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাশীল হতে হবে। এই শ্রদ্ধার বহিঃ প্রকাশ ঘটবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহের যথাযথ সংরক্ষণের মাধ্যমে, নতুন নির্মিত ইমারতে ঐতিহ্যের প্রতিফলনের মাধ্যমে। সুতরাং কেবল ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচনা না করে ঐতিহ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে যদি আধুনিক কালের মসজিদ গুলো নির্মাণ করা হয় তাহলে প্রতিটি মসজিদই এক একটি অনুপম স্থাপত্যকীর্তিতে রূপ নেবে এবং 'মসজিদের নগরী ঢাকা'র শ্রী এতে বৃদ্ধি পাবে বহুগুন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম পরিচ্ছেদ

ঐতিহাসিক পটভূমি

ঢাকা নগরীর মসজিদ স্থাপত্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ঐতিহাসিক ঢাকা নগরী সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করার প্রয়োজন রয়েছে। কারন, কোন একটি নগরীর রাজনৈতিক গুরুত্ব ও উথান পতনের সাথে ঐ নগরীর সমৃদ্ধি ও স্থাপত্য নির্মাণের সংযোগ রয়েছে।[১]

বুড়িগঙ্গা নদীতীরে অবস্থিত ঢাকা নগরীর প্রাক মুঘল ও মুঘল যুগের ইতিহাস সম্পর্কে জানা গেলেও ঢাকার প্রাক মুসলীম যুগের ইতিহাস তেমন জানা যায় না। ঢাকার নিকটবর্তী বিক্রমপুর চন্দ্র–বর্মন–সেন রাজবংশ সমূহের আমলে রাজধানী ছিল দশম থেকে এয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত। দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয় এয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে।এরপর থেকে সোনারগাঁর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়– প্রথমে টাকশাল ও প্রশাসনের একটি কেন্দ্র এবং পরবর্তিতে ইলিয়াস শাহী শাসনামলে রাজধানী হিসেবে। সোনারগাঁর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল হিসেবে এ সময় ঢাকার পরিচিতি ঘটে। নানা রকম শিল্পে ঢাকার সুখ্যাতি ছিল। ফলে, ঢাকায় মূলতঃ বিভিন্ন পেশাজীবি শ্রেণীর বসতি লক্ষ্য করা যায়। মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হলে (১৬১০) ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতপক্ষে মুঘলযুগ থেকেই ইতিহাসে ঢাকার পরিচিতি হয় সমাধিক।

একটি ছোট শহর থেকে ক্রমান্বয়ে রাজধানীতে পরিনত হওয়া এই ঢাকা নগরীর 'ঢাকা' নামের উৎস নিয়েও রয়েছে অনেক কিংবদন্তী ও কাহিনী এবং বলা যায় ঢাকা নামের উৎপত্তি অনেকটা রহস্যাবৃত্তই রয়ে গেছে। প্রচলিত কিংবদন্তীর ভিত্তিতে বলা হয় ঢাকায় এক সময় ছিল প্রচুর ঢাক গাছ (Butia Frondosa)। সেই থেকে উৎপত্তি ঢাকা নামের।[২] আরেকটি কিংবদন্তীর সাথে জড়িত বল্লাল সেনের নাম। বল্লাল সেন একবার জঙ্গলে একটি দেবী মূর্তি আচ্ছাদিত অবস্থায় পান এবং তাই দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন একটি মন্দিরের, যা আমাদের কাছে পরিচিত ঢাকেশ্বরী মন্দির নামে। মূর্তিটি যেহেতু জঙ্গলে ঢাকা ছিল সেহেতু দেবীর নাম ঢাকেশ্বরী। সেই ঢাকেশ্বরী থেকে কালক্রমে 'ঢেহাকা' বা 'ঢাকা' নামের উৎপত্তি।[৩]

অধ্যাপক ডি,সি সরকার বলেছেন, কলহনের 'রাজতরঙ্গিনী' গ্রন্থে 'ঢাক্কা' শব্দটি পাওয়া গেছে যার অর্থ পর্যবেক্ষণ ফাঁড়ি। বিক্রমপুর বা সোনার গাঁর পর্যবেক্ষণ ঘাটি হিসেবে একসময় উচুভূমিতে অবস্থিত এ অঞ্চলটিকেই বলা হতো 'ঢাক্কা'; সেই থেকে ঢাকা নামের উৎপত্তি। [৪]

আওলাদ হাসান বলেছেন, ইসলাম খান এখানে এসে ঢাকের আওয়াজকে কেন্দ্র করে ঢাকার সীমানা নির্দেশ করেন এবং ঢাক থেকে রাজধানীর নাম দিলেন ঢাকা। [৫]

বস্তুতঃ ইসলাম খান এখানে রাজধানী স্থাপন করে সম্রাট জাহাঙ্গিরের নামানুসারে শহরের নামকরণ করেন 'জাহাঙ্গির নগর।' তবে, সরকারি কাগজ পত্র, মুদ্রা প্রভৃতিতে মূলতঃ এই নামটি ব্যবহৃত হতো। সাধারণের কাছে আটপৌরে ঢাকা নামটিই ছিল পরিচিত।

ঢাকায় রাজধানী স্থাপনের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করতে হলে বলা যায় মূলতঃ ইসলাম খান বারো ভূঁইয়াদের আধিপত্য, মগ ও পর্তুগীজ জলদস্যুদের লুন্ঠন থেকে নিম্নবঙ্গকে রক্ষা করার জন্যে ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন।

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকার ভৌগলিক অবস্থানের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় ঢাকার অবস্থান ২৩°৪৩′ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯০°২৪′ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে।গঙ্গা নদীর মোহনা থেকে একশত মাইল দূরে বুড়ি গঙ্গা নদীর উত্তর তীরে ঢাকা নগরীর অবস্থান। প্রকৃত পক্ষে ঢাকার ভৌগলিক অবস্থান এরূপ যার ফলে প্রধান প্রধান নদী (গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা) ও তাদের শাখা নদীর সাথে ঢাকার সংযোগ স্থাপনের মাধ্যমে এসব নদ–নদীর পার্শ্ববর্তী জেলা সমূহের সাথে ঢাকার যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া ঢাকার ভূমি পার্শ্ববর্তী নিম্নাঞ্চলের মধ্যে অপেক্ষাকৃত উঁচু। কথিত আছে ইসলাম খান রাজধানীর উপযোগী স্থানের অন্বেষণে ঢাকায় আসেন এবং এখানকার মাটি উঁচু, শক্ত ও লাল দেখতে পান।[৬] সম্ভবতঃ ঢাকার এই উল্লেখযোগ্য ভৌগলিক অবস্থানই ইসলাম খানকে ১৬১০ সালে রাজমহল থেকে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকায় স্থানান্তরিত করতে অনুপ্রাণিত করেছিল।[৭]

সুলতানি যুগে একটি ছোট শহর হিসেবে ঢাকার পরিচিতি তুলে ধরেছে তিনটি মসজিদ শিলালিপি, কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, প্রচলিত লোক গাঁথা ও কাহিনী। [৮]

সুলাতানী যুগের মসজিদ শিলালিপির মধ্যে নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৬) শিলালিপি, নসওয়ালা গলির মসজিদ শিলালিপি (১৪৫৯), মিরপুর শাহ্ আলী বাগদাদীর মাযার মসজিদের (১৪৮০) শিলালিপি উল্লেখযোগ্য। বঙ্গভবন প্রাঙ্গনে শাহ্ জালাল দাক্ষিনীর মাযার (১৪৭৬), মিরপুরের শাহ্ আলী বাগদাদীর মাযার ও মসজিদ (১৪৮০), বিনত বিবির মসজিদ প্রভৃতি সুলতানী যুগের উল্লেখযোগ্য প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন।

আরবী লিপিতে ঢাকার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় উলুক আজলকা খান কর্তৃক নির্মিত মসজিদ প্রসঙ্গে, যেখানে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন 'কসবা ঢাকা খাস' এর প্রধান গোমস্তা তরবিয়াত খানের পুত্র।[৯] ১৫৫০ সালে দ্যা বেরসের আকা মানচিত্রে ঢাকা নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটাই ঢাকার অস্তিত্ব সম্পর্কে সর্ব প্রাচীন বস্তুনিষ্ঠ সূত্র।[১০]

এসব নিদর্শন থেকে এটুকু অন্ততঃ উপলব্ধি করা যায় যে, মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে পরিণত হবার পূর্বেও ঢাকার গুরুত্ব ছিল।

'আকবর নামায়' মুঘল সুবাদার শাহ্বাজ খান (১৫৮৩–৮৫) এবং মানসিংহ (১৫৯৪–১৬০৬)–এর যুদ্ধ বর্ণনা প্রসঙ্গে ঢাকা পুণঃ পুনঃ উল্লেখিত হয়েছে। ঢাকার থানাদার সাইয়েদ হুসেনের কথা বলা হয়েছে, তিনি ঈসা খানের হাতে বন্দী হয়েছিলেন।[১১]

ইউরোপীয় বনিকেরা 'বঙ্গলা' বা বাংলা নামে যে শহরের উল্লেখ করেছেন তা কি ঢাকা অথবা পৃথক কোন শহর তা স্পষ্ট নয়। 'বায়ান্ন বাজার তেপান্ন গলির শহর' নামে খ্যাত ছিলো কি বেঙ্গলা না ঢাকা তাও অস্পষ্ট।হতেপারে ঢাকার বায়ান্ন বাজারের একটি বুড়িগঙ্গা তীরস্থ ব্যবসাকেন্দ্র বাংলা বাজার, হয়তো ঐ বাজারের উল্লেখে ইউরোপীয় পর্যটকেরা ঢাকা শহরকে বোঝাতে চেয়েছেন।[১২]

আইন–ই–আকবরী থেকে জানা যায় যে, সুবা বাংলাকে ১৯ টি সরকার এবং প্রত্যেকটি সরকারকে কয়েকটি পরগনায় বিভক্ত করা হয়। ঢাকা বাজু নামে একটি পরগনা সরকার বাজুহার অধীনে ছিল এবং বর্তমান ঢাকা শহর ঢাকা বাজু পরগনারই অংশ বিশেষ ছিল বলে অনুমান করা যায়।[১৩]

পরবর্তী কালে আনুমানিক ১৭২২ সালে নবাব মুর্শিদ কুলী খান বাংলার প্রশাসন ব্যবস্থাকে পুনর্বিন্যাস্ত করেন এবং সুবা বাংলাকে ১৩ টি চাকলায় বিভক্ত করেন। এই তেরটি চাকলার অন্যতম ছিল চাকলা জাহাঙ্গির নগর। মোটামুটি ভাবে বলতে গেলে বর্তমান ঢাকা বিভাগকে নিয়েই চাকলা জাহাঙ্গির নগর গঠিত হয়েছিল। ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে চাকলা জাহাঙ্গির নগর 'ঢাকা প্রদেশ' নামে অভিহিত হয়।[১৪]

Dhaka University Institutional Repository

এন, কে, ভট্টশালী মির্যানাথানের 'বাহারিস্থান-ই-গায়বী'র তথ্যের ওপর ভিত্তি করে প্রাক মুঘল যুগের ঢাকা (পুরানো ঢাকা) এবং মুঘল ঢাকার (নতুন ঢাকা) মধ্যে সীমানা নির্দেশ করেছেন।[১৫] বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের এলাকা থেকে দোলাই খাল পর্যন্ত স্থান নিয়ে পুরাতন ঢাকা গড়ে উঠেছিল। এই পুরাতন ঢাকায় লক্ষ্মীবাজার, বাংলা বাজার, সূত্রাপুর, জালুয়া নগর, বানিয়া নগর, তাঁতি বাজার, শাঁখারী বাজার, পাটুয়াটুলী, কামারটুলী প্রভৃতি নামের এলাকা রয়েছে। এই নাম গুলো প্রাকমুসলীম যুগের আদি বসতির কথা তুলে ধরেছে। দোলাই খালটি সম্ভবতঃ পুরানো ঢাকার উত্তর পূর্ব সীমানা নির্দেশ করেছিল। (মানচিত্র-১)

বস্তুতঃ সোনার গাঁর নিকটবর্তী অঞ্চল হিসেবে ঢাকায় বিভিন্ন কারিগর ও পেশাজিবী শ্রেণীর বসতি গড়ে উঠে ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের দিক থেকে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়।

প্রাক মুঘল যুগে পুরাতন ঢাকার পশ্চিম সীমানার বিস্তার কতটুকু ছিল তা নির্দেশ করা সহজ ব্যপার নয়। বাবু বাজারের পশ্চিমে মুসলমান নামের বসতি লক্ষ্য করা যায়, অধিকিন্তু মির্যা নাথানের বর্ননার ওপর ভিত্তি করে পন্ডিত ব্যক্তিরা বাবু বাজারকে পুরাতন ঢাকার পশ্চিম সীমানা হিসেবে নির্দেশ করেন। মূলতঃ এরূপ ধারণার উদ্রেক হয়েছে এন, কে, ভট্টশালী কর্তৃক মির্যানাথানের বর্ননার পাকুরতলিকে বাবু বাজার হিসেবে সনাক্ত করার মধ্য দিয়ে।[১৬]

যদি নসওয়ালা গলির মসজিদ শিলালিপির ওপর ভিত্তি করে ঐ স্থানে সুলতানী যুগের একটি মসজিদের (জেলখানার পশ্চিম দিকে) অস্তিত্বের কথা ধারণা করা যায়, তাহলে বলা যায় সুলতানী যুগের ঢাকার সীমানা পশ্চিম দিকে বাবু বাজারকেও অতিক্রম করে গিয়েছিল।[১৭] অন্যদিকে মিরপুরে অবস্থিত শাহ্ আলী বাগদাদীর সমাধির (১৪৮০) অবস্থান ঐ স্থানে মুসলমানদের আদি বসতির কথা তুলে ধরে। প্রকৃতপক্ষে বুড়িগঙ্গা নদীর প্রবাহকে অনুসরণ করেই শহরের দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিমে সুলতানী যুগে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছিল।

ইসলাম খান কর্তৃক ১৬১০ সালে ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী স্থাপনের পরই যথার্থ অর্থে ঢাকার মর্যাদা ও গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজধানী ঢাকার পত্তন করার পর ইসলাম খান এখানে কেবল তিন বছর অবস্থান করেন। তার এই স্বল্প কালীন অবস্থানের মধ্যে তিনি শহরের তেমন বিকাশ ঘটাতে সক্ষম হননি।

ঢাকায় তার কীর্তি প্রধানতঃ দু'টি। প্রথমত, দূর্গ (বর্তমান কেন্দ্রিয় কারাগার) এবং চাঁদনী ঘাট। দূর্গ ও চাঁদনী ঘাটের মধ্যবর্তী বাজার এলাকা সম্ভবতঃ এ সময়ই গড়ে উঠে (বর্তমানের চকবাজার, পূর্বের বাদশাহী বাজার)। দূর্গের পশ্চিম দিকে এবং চকবাজারের নিকটবর্তী উর্দূ বাজারের বিকাশ সম্ভবতঃ সমসাময়িক কালেই।

ইসলাম খানের আরেকটি অবদান হচ্ছে খাল খননের মাধ্যমে বুড়ি গঙ্গার সাথে দোলাই খালের সংযোগ স্থাপন। এই খালটি নতুন ও পুরাতন ঢাকার মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করেছে।[১৮]

শহরের পুরানো অংশও ইসলাম খানের মনোযোগ আকর্ষন করেছিল, নদীর তীর ধরে সমান্তরাল ভাবে বাবু বাজার থেকে পাটুয়াটুলী পর্যন্ত এলাকা ইসলামপুর নামে পরিচিত হয় এবং ইসলাম খান কর্তৃক একটি মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয় (১৬১০-১৩)।[১৯] ইসলাম খান কর্তৃক দূর্গ, চাঁদনী ঘাট ও চকবাজার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যে নতুন ঢাকার পত্তন হলো, মুঘল সুবাদারদের অধীনে তার ক্রমবিকাশ হতে থাকে ১৭১৭ সাল সময় পর্যন্ত। ১৭১৭ সালে সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়। সুতরাং এক শতাব্দীর কিছু উর্ধ্বকাল সময় পর্যন্ত ঢাকা প্রাদেশিক রাজধানীর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকে।এই সময়ের মধ্যে সামরিক ও প্রশাসনিক প্রয়োজন এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক তৎপরতার কারণে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া তরান্বিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

বিদেশী পর্যটকদের বর্ননা, ঢাকার বিভিন্ন স্থানে অবিস্থিত মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন এবং বিভিন্ন এলাকার নাম থেকে মুঘল আমলে ঢাকার বিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায়।

১৬৪০ সালে ম্যানরিক ঢাকায় আসেন। তার সময় ঢাকার ব্যপ্তি ছিল পশ্চিম দিকে মনেশ্বর থেকে হাজারি বাগ পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে নারিন্দা পর্যন্ত। সুতরাং এটা উপলব্ধি করা যায় যে, সুলতানী যুগের ঢাকাকে অন্তর্ভূক্ত করেই নতুন ঢাকার বিকাশ হতে থাকে।[২০] পুরাতন মুঘল টুলীর অবস্থান থেকেও এটি প্রমানিত হয় যে, সুলতানী যুগের ঢাকার সীমানার অভ্যন্তরে মুঘল বসতি গড়ে উঠেছিল। ম্যানরিকের বর্ননার আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উত্তর দিকে ফুলবাড়িয়া পর্যন্ত শহরের বিকাশ (বর্তমান কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ এলাকা)। শহরের উত্তর দিকে পিল খানার পত্তন হয়। সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী প্রভৃতিদের আবাসিক এলাকা গঠনের লক্ষ্যে পশ্চিম দিকে দূর্গ ও পিল খানার মধ্যবর্তী এলাকা এবং উত্তর দিকে দূর্গ ও ফুলবাড়িয়ার মধ্যবর্তী এলাকা নির্ধারন করা হয়। দূর্গের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিম থেকে নদীতীর পর্যন্ত এলাকা মূলতঃ বাণিজ্যিক এলাকা এবং উত্তর পূর্ব দিকের এলাকা আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে।

শহরের উত্তর সীমা নির্ধারিত হয় মিরজুমলা (১৬৬০–৬৩) কর্তৃক নির্মিত তোরণ পর্যন্ত। বর্তমানে এই স্থানে (সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে) তিন নেতার সমাধি রয়েছে।ঢাকা ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকার নির্মাণ কাজের সাথে মিরজুমলার নাম বিশেষ ভাবে জড়িত। সড়ক পথে সৈন্যসামন্ত ও অস্ত্রশস্ত্র দ্রুত পরিবহনের জন্য তিনি দু'টি সড়ক নির্মাণ করেন, ঢাকা–ময়মনসিংহ সড়ক ও ঢাকা–নারায়নগঞ্জ সড়ক।এই সড়ক দু'টির একটির (ময়মনসিংহ সড়ক) মাধ্যমে উত্তরের জেলাগুলোর সাথে ঢাকার সংযোগ স্থাপিত হয়েছে। এই সড়ক পথেই টঙ্গি জামালপুরের কাছে একটি দূর্গ তৈরী হয়। টঙ্গি পুলটিও তিনি নির্মাণ করেন। অপর সড়কটি পূর্ব দিকে বিস্তৃত হয়ে ঢাকার সাথে ফতুল্লার সংযোগ স্থাপন করেছে (ঢাকা–নারায়নগঞ্জ সড়ক)।[২১] মির জুমলা কর্তৃক এ দু'টি সড়ক নির্মাণ ঢাকার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে।

শায়েস্তা খানের সুবাদারীর আমলে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া তরান্বিত হয় এবং তাঁর দু'দফার সুবাদারীর সময় কাল (১৬৬৪–৭৭, ১৬৮০–৮৮) ঢাকায় মুঘল স্থাপত্য নির্মানের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। ১৬৬৬ সালে ট্যাভার্নিয়ার ঢাকায় আসেন এবং ঢাকার বিকাশ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে ঢাকা এমন একটি শহর যার বিস্তার ঘটেছে কেবল দৈর্ঘ্যেই। কারণ, প্রত্যেকেই নদীর তীরবর্তী এলাকায় বসবাস করতে আগ্রহী। দৈর্ঘ্যে শহরটি ছিল দেড় লীগ পর্যন্ত বিস্তৃত।[২২]

টমাস বাওরী ঢাকা সম্পর্কে বলেছেন যে, নীচু ও জলাভূমি (Low marshy and swampy ground) পরিবেষ্টিত ঢাকার বিস্তার ৪০ মাইলের বেশী হবে না।[২৩]

ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রাপ্ত সম্ভাব্য দলিল থেকে (১৭৮৬ এবং ১৮০০) ঢাকার সীমানা নির্দেশ করা হয় দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে টঙ্গি জামালপুর, পশ্চিমে মিরপুর এবং পূর্বে পোস্ত গোলা।[২৪] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এটাই মুঘল ঢাকার সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত হয়।

ঢাকায় অবস্থিত মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন গুলোর প্রতি দৃকপাত করলে এবিষয়টি সুস্পষ্ট হয় যে, শহরের বিকাশ হয়েছে মূলতঃ দূর্গের পশ্চিম দিক দিয়ে এবং নদীর তীর ধরে ক্রমান্বয়ে মুঘল বসতি শহরের উত্তর প্রান্তে মিরপুর জাফরাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছে। মুহাম্মদপুরের দক্ষিণ–পশ্চিম কোনে বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদ নির্মিত হয়। এই এলাকার অন্যান্য মুঘল স্থাপত্য কর্ম লক্ষ্য করে অনুমান করা যায় যে, এই স্থানে একটি উল্লেখযোগ্য মুঘল বসতি গড়ে উঠেছিল। প্রকৃতপক্ষে উত্তর পশ্চিম দিক থেকে নদীপথকে প্রহরা দেয়ার ক্ষেত্রে

Dhaka University Institutional Repository

এই স্থানটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা শহরের সম্পূর্ণটাই উঁচু ভূমি নয়। দক্ষিণ পূর্ব দিকে বুড়ি গঙ্গার সমান্তরালে পোস্তগোলা পর্যন্ত এবং উত্তর পশ্চিমে হাজারী বাগ পর্যন্ত এলাকা উঁচুভূমি। এই উঁচু ভূমির উত্তর সীমানায় অবস্থিত রমনায় ছিল মুঘলদের বাগ-ই-বাদশাহী।

মুঘল আমলে ধানমন্ডি ছিল নীচু এলাকা এবং ধানক্ষেত পরিবেষ্টিত। এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকেও ঢাকা কলেজ, নিউমার্কেট পর্যন্ত এলাকায় ধানক্ষেতের বিস্তার লক্ষ্য করা গেছে।

ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়। ঢাকা বাংলার পণ্য দ্রব্যের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়।[২৫] মিরপুরের শাহ্ বন্দরে প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।[২৬] ঢাকার বাণিজ্যিক গুরুত্বের কারণে ইউরোপীয় বণিকেরা ঢাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়।পর্তুগীজ, দিনেমার, ফরাসী, ইংরেজ এবং আর্মেনীয় বনিকেরা ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে তারা প্রধানতঃ তেঁজগায়ে তাদের বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করেন।[২৭] (মানচিত্র-২) কাওরান বাজারের উত্তরদিকেও ইউরোপীয় বসতি গড়ে উঠে। ১৭১৭ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে ঢাকার ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অবসান ঘটে। এসময় থেকে ঢাকা নায়েব নাজিমদের প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। তবে পূর্ব বাংলায় মুঘল সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর প্রধান ঘাটি হিসেবে ঢাকার ভূমিকা অব্যাহত থাকে।[২৮] এসময় ইউরোপীয় বণিকদের তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং ১৭১৭ সালে ঢাকা রাজধানীর মর্যাদা হারালেও একটি শহর হিসেবে এর ভূমিকা অব্যাহত থাকে, তবে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া স্তিমিত হয়ে যায়। ১৭৬৫ সালে কোম্পানী দিওয়ানী লাভ করার পর ঢাকার পতনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।ঢাকার প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

রাজনৈতিক সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে কলকাতার উত্থান এবং সেই সাথে ঢাকার পতন একই সূত্রে গাঁথা। দিওয়ানী লাভ করার পর কোম্পানী সরকারী কাঠামোর পুনর্বিন্যাসের কাজে হাত দেয়। ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ঢাকার নাওয়ারা (মুঘল নৌঘাটি) অবলুপ্ত করে দেয়া হয়। এরপর প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাসের অংশ হিসেবে পুরানো ঢাকা নিয়াবতকে ছোট ছোট জেলায় বিভক্ত করা হয়। ১৮২৮ সালের মধ্যে ঢাকা নগরীকে কেবল একটি জেলা সদরে পরিণত করা হয়। এসব পুনর্বিন্যাসের পরিণতিতে প্রশাসন, পুলিশ এবং বিচার বিভাগীয় বহু কাজ এবং তৎসংশ্লিষ্ট খাজনা ও অন্যান্য আয় থেকে ঢাকা বঞ্চিত হয়। ১৮১৭ সালে ঢাকায় ইংরেজদের ফ্যাক্টরী বন্ধ করে দেয়া হয়। একই সময় ঢাকার বস্ত্রশিল্প যুগপৎ মুঘল পৃষ্ঠপোষকতা হারায় এবং বিলেতী মিলের তৈরী বস্ত্রশিল্পের অসম প্রতিযোগীতার সম্মুখীন হয়। এসবের মোট ফলাফল হলো ঢাকা তথাকথিত Pax Britannica -র অধীনে কয়েক দশকের মধ্যে এমন মৃত্যুর শান্তিতে ঢলে পড়ে যা কোন পরিপূর্ণ বিধ্বংসী যুদ্ধের পক্ষেও ঘটানো সম্ভব হতো না।[২৯]

শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি, প্রশাসন, পরিবহন কর ব্যবস্থা, ভূমি স্বত্ব সকল ক্ষেত্রে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত পুরোপুরি বেনিয়া দৃষ্টি ভঙ্গির ফলে অবহেলা, বঞ্চনা, শোষণ ও পুনর্বিন্যাসের শিকার হল ঢাকা সহ ভারতের প্রায় প্রতিটি মুঘল নগরী।[৩০] পুনর্বিন্যাসকৃত পরিস্থিতিতে ঢাকার আঞ্চলিক প্রধান্য পুনরুদ্ধার করে উন্নয়নের পথে অগ্রসর হওয়ার পূর্বে দীর্ঘ পথ তাকে পিছিয়ে যেতে হয়েছিল। লোক সংখ্যা ৯ লক্ষ থেকে ৫২ হাজার এবং আয়তন ১৫০ বর্গমাইল থেকে ৪ বর্গ মাইলে নেমে আসা দীর্ঘ পিছু হটে আসা বৈকি।[৩১] এই পথ পরিক্রমায় ঢাকা পরিণত হয়েছিল বৃহৎ ধ্বংসস্তুপে। ঢাকার দূর্গ, মসজিদ, তোরণ, সড়ক, সেতু ও নহবৎ খানা ঢেকে গিয়েছিল মৌসুমী

Dhaka University Institutional Repository

জলবায়ুতে দ্রুত বেড়ে উঠা বৃক্ষলতা ও গুল্মে, জীর্ণ হয়ে গিয়েছিল শতাব্দীর অব্যবহারে ও অবহেলায়। উজাড় হয়ে যাওয়া বিরান এই পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন গুলো ১৮০৮ থেকে ১৮১১ সালের মধ্যে স্যার চার্লস ড'য়লীর আঁকা স্কেচে লক্ষ্য করা যায়।[৩২]

১৮২৪ সালে বিশপ হেবর ঢাকার আসলে তিনিও মুঘল ইমারত, ইউরোপীয় বাণিজ্যিক কুঠি প্রভৃতি ধ্বংস প্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। ১৮০১ সাল থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে পূর্ব দিকে নারিন্দা, ফরিদাবাদ, ওয়ারি এবং পশ্চিম দিকে আলমগঞ্জ, ফুলবাড়িয়া, দিওয়ান বাজার, আজিমপুর এবং এনায়েত গঞ্জ প্রায় সম্পূর্ণ জনশূন্য হয়ে যায়।[৩৩] ঢাকা ব্যাপটিস্ট মিশনের রেভারেন্ড উইলিয়াম রবিনসন রমনায় জঙ্গলাকীর্ণ উত্তরাংশে একদা অবস্থিত বহু বাগান বাড়ির প্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ প্রত্যক্ষ করেন। তেজ গাঁ এলাকাটি তিনি সম্পূর্ন পরিত্যক্ত অবস্থায় লক্ষ্য করেন।[৩৪]

১৮১৮ সালে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌছায় যে কেবল ঢাকার উত্তরের উপকণ্ঠেই নয়, শহরের ভেতরেও জঙ্গলের অনুপ্রবেশ ঘটে। বাধ্য হয়ে বিচারক জন আমুটি (John Ahmutti) প্রাদেশিক কোর্ট সমীপে জঙ্গল পরিষ্কারের ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য আবেদন জানান। এই আবেদনেরও ২২ বছর পর ১৮৪০ সালে কর্ণেল ডেভিডসনের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, ঢাকার জনসংখ্যা দ্রুত কমে যাওয়ার কারণে শহর থেকে মাত্র আধ মাইল দূরে যে ঘন জঙ্গল অবস্থিত ছিল, শহরের একেবারে সংলগ্ন এলাকাও তেমনি জঙ্গলাকীর্ণ হয়ে যায়।[৩৫] ১৮৫৯ সালের আঁকা একটি মানচিত্রে শহরের সংক্ষিপ্ত পরিধি পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। (মানচিত্র–৩)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ঢাকায় এক নতুন ধারার সূত্র পাত হয়। এসময় ঢাকার বিকাশ না হলেও মধ্যযুগীয় ঢাকাকে আধুনিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা চলে। ঢাকায় পাকা, প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়।পানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়।[৩৬]

বস্তুতঃ ঢাকার আধুনিকীকরনের প্রক্রিয়ার সূচনা হয় ১৮২৫ সালে ইংরেজ ম্যাজিষ্ট্রেট চার্লস ডজ এর সময়। রমনা এলাকার জঙ্গল পরিষ্কার করে রেস কোর্স প্রতিষ্ঠা করা হয় (বর্তমানের সোহরাওয়ার্দী উদ্যান)।[৩৭]

১৮৪০ সালে রাসেন স্কিনার রমনার বিকাশ প্রক্রিয়াকে আরো তরান্বিত করেন। আরাথুস নামের একটি বিখ্যাত আর্মেনীয় জমিদার পরিবার রেসকোর্সের পশ্চিম দিকে ভূমি ক্রয় করেন এবং একটি বাড়ি নির্মাণ করেন।[৩৮] এর কিছুটা উত্তরে জর্জ জন এফ, জি, কুক বেশ বড় অংশের জমি কেনেন এবং সে খানে একটি বাংলো নির্মাণ করেন, এটি পরে খাজা আব্দুল গনি (১৮৪৪–৪৫) কিনে নেন।অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকার নবাবেরা রেসকোর্সের পশ্চিম দিকের এলাকার উন্নয়ন করে সেখানে বড় বড় ইমারত ও উদ্যান তৈরী করেন। এলাকাটি তখন শাহ্‌বাগ নামে পরিচিতি লাভ করে।[৩৯]

ডজ নবাবপুরের উত্তর পূর্ব দিকের এলাকাটিরও উন্নয়ন করেন, সম্পূর্ন এলাকাটি তখন নতুন সামরিক ঘাঁটিতে পরিণত হয়। এস্থানটি পরবর্তীতে পুরানা পল্টন নামে পরিচিত হয়।[৪০] ১৮৫৩ সালে লালবাগে সামরিক ঘাঁটি স্থানান্তরিত করা হলেও পূর্বতন এলাকাটি সেপাইদের প্যারেড ও প্রশিক্ষনের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হতে থাকে। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিপ্লবের পর চুড়ান্ত ভাবে সামরিক ঘাটি শহরের পূর্ব প্রান্তে নদীর তীর ধরে মিল ব্যারাকে স্থানান্তরিত করা হয়।নবাবপুর থেকে পুরানাপল্টন পর্যন্ত এলাকা পৌরসভা কর্তৃক উন্মুক্ত এলাকা (Open space) হিসেবে রক্ষনাবেক্ষণ করা হয়।[৪১]

পূর্ব বাংলার উপর ঢাকার বাণিজ্যিক প্রধান্যের কারণে ১৮৮৫–৮৬ সালে ঢাকা–নারায়নগঞ্জ–ময়মনসিংহের মধ্যে সরাসরি রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয়। [৪২]

Dhaka University Institutional Repository

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ঢাকার অভ্যন্তরে কোন রকম সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ছাড়াই সড়ক নির্মাণ ও ইমারত তৈরী হতে থাকে। ঢাকার কমিশনার সি, টি বাকল্যান্ড (C.T.Buckland) প্লাবনের হাত থেকে শহরকে রক্ষা করার জন্য বুড়িগঙ্গা তীর ধরে ১৮৬৫ সালে একটি বাধ নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, এই বাধ নির্মাণ তিনটি পর্যায়ে শেষ হয়। সাধারণভাবে এই বাধটি বাকল্যান্ড বাধ নামে পরিচিত।[৪৩] এ সময় একমাত্র ওয়ারী এলাকারই পরিকল্পনা মাফিক বিকাশ হয়। ১৮৮৫ সালে ঢাকার কালেক্টর ফ্রেডারিক ওয়ের (Frederic Wyer) প্রশস্ত সড়ক ও পয়ঃ প্রনালী নির্মাণের মাধ্যমে ওয়ারী এলাকায় উন্নয়ন করেন।[৪৪] বস্তুতঃ ওয়ারী সেসময় উচ্চমধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকায় পরিণত হয়।[৪৫]

ঢাকার উন্নয়নে ঢাকার নবাব পরিবারের (খাজা আলিমউল্লাহ্‌র পরিবার) উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।[৪৬] শাহ্‌বাগ ছাড়াও তারা দিলকুশা ও মতিঝিল এলাকার উন্নয়ন করেন। এসব এলাকায় তারা বাগান বাড়ি নির্মাণ করেন।[৪৭] সুতরাং এ বিষয় সুস্পষ্ট যে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ঢাকার আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টার মাধ্যমে কিছুটা প্রাণ চাঞ্চল্যের সূচনা হয়।

১৯০৫ সালে ঢাকার ইতিহাসে আরেক অধ্যায়ের সূচনা হয়। এ সময় বঙ্গভঙ্গের মাধ্যমে ঢাকা নূতন প্রদেশ পূর্ববঙ্গ ও আসামের রাজধানীতে পরিনত হয়, ঢাকায় নবজাগরণের সূচনা হয়।

লর্ড কার্জন বাগ-ই-বাদশাহীতে মুসা খানের মসজিদের উত্তর পূর্বে কার্জন হল প্রতিষ্ঠা করলেন।[৪৮] নতুন শহরের বিকাশ হয় প্রধানত রমনা এলাকায়। রমনায় ইউরোপীয় রীতির বিভিন্ন প্রশাসনিক ও আবাসিক ভবন নির্মাণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার (নীলক্ষেত) বিকাশ হয় এ সময়ই (১৯০৫-১১)।[৪৯] (মানচিত্র-৪) রমনা এলাকায় প্রশস্ত সড়ক নির্মাণ করা হয়। নীলক্ষেত এলাকায় মূলতঃ নীলের চাষ হতো। নতুন প্রদেশের প্রথম লেফটেন্যান্ট গভর্নর স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের নামানুসারে নীলক্ষেতে 'ফুলাররোড' নামে একটি সড়ক নির্মাণ করা হয়।[৫০] রেস কোর্সের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত সিদ্ধেশ্বরী এলাকাটিও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সরকারী উদ্যোগে সিদ্ধেশ্বরীর উন্নয়ন করে আবাসিক এলাকার পত্তন করা হয়। [৫১] এ সময় ঢাকেশ্বরী মন্দির এলাকাতেও জনবসতি গড়ে উঠে।[৫২]

বঙ্গভঙ্গের ফলে ঢাকায় যে নতুন প্রাণ চাঞ্চল্যের সূচনা হয় তা ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ হয়ে গেলে স্তিমিত হয়ে যায়। ১৯৪৭ সাল সময় পর্যন্ত একমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ঢাকার ইতিহাসে তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেনি। [৫৩]

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী হয়। নতুন প্রদেশের রাজধানী হিসেবে পরিণত হবার পর প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক প্রয়োজনে এবং সর্বোপরি ঢাকায় যে জন সমাগম ঘটলো তাদের আবাসিক প্রয়োজন মেটানোর তাগিদে ঢাকার ক্রমবিকাশ হতে থাকে। রমনা এলাকায় নির্মিত ভবন গুলো দিয়ে প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটানো হয়।[৫৪] সরকারী কর্মচারীদের আবাসিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ঢাকেশ্বরী, পলাশী ব্যারাক, আজিমপুর প্রভৃতি এলাকায় সরকারী বাসগৃহ নির্মাণ করা হয়।[৫৫] নিউমার্কেটের নির্মাণ কাজ শেষ হয় ১৯৫৪ সালে।[৫৬] পুরানা পল্টন থেকে নয়াপল্টন, ইস্কাটন থেকে মগবাজার, সিদ্ধেশ্বরী, কাকরাইল, কমলাপুর, রাজার বাগ, শান্তি নগর, প্রভৃতি স্থানে জনবসতি গড়ে উঠে। প্রকৃত পক্ষে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর ঢাকায় আকস্মিক যে জন সমাগম ঘটে তার ফলশ্রুতিতেই নতুন ঢাকার বিকাশ হতে থাকে।[৫৭] একদা পরিত্যক্ত মতিঝিল এলাকাকে বাণিজ্যিক এলাকায় পরিণত করার প্রক্রিয়া শুরু হয় ১৯৫৪ সাল থেকে।[৫৮]

Dhaka University Institutional Repository

নতুন শহরের ক্রমবর্ধমান আবাসিক চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৫ সালের পর থেকে ধানমন্ডি এলাকা আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠতে থাকে।[৫৯] ভারত থেকে আগত মুসলমানদের আবাসিক সমস্যার সমাধানের লক্ষ্যে ষাটদশকের মধ্যবর্তী সময়ে মিরপুর ও মুহম্মদপুরের উন্নয়ন করা হয়।[৬০]

ষাট দশকের দ্বিতীয় ভাগে ঢাকায় শেরে বাংলা নগর (Second Capital) গঠনের পরিকল্পনা প্রনয়ন করেন আমেরিকান স্থাপতি Louis Isador Kahn । তার পরিকল্পনায় নির্মিত ভবনগুলোর মধ্যে সংসদ ভবন, এম, পি, হষ্টেল, সোহরাওয়ার্দি হাসপাতাল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫৬ সালে D.I.T প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে (১৯৮৭ সালে রাজউক-এ রূপান্তরিত) শহরের উন্নয়নে পরিকল্পিত সড়ক ও গৃহনির্মাণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।D.I.T এর অধীনে ১৯৬১ সালে গুলশান, ১৯৬৪ সালে বনানী, ১৯৬৫ সালে উত্তরা এবং ১৯৭২ সালে বারিধারার উন্নয়ন করা হয়।[৬১]

সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, ১৬১০ সালে রাজধানীতে পরিণত হবার পর থেকে ঢাকা সুবা বাংলার রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডের কেন্দ্রস্থলে রূপ নেয় এবং পরবর্তী প্রায় একশত বছর বাংলার সকল কর্মকান্ডের ওপর প্রভাব বিস্তার করে চলে। অনেক বিদেশী পর্যটক এসময় ঢাকায় আসেন এবং ঢাকার সমৃদ্ধি ও বিকাশ প্রত্যক্ষ করে বিস্মিত হন।

১৭১৭ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে, ঢাকার ইতিহাসে গৌরব ও সমৃদ্ধির যে আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল, তা নিষ্প্রভ হয়ে আসে ক্রমশঃ। মুঘল রাজধানী পরিবর্তনের পর ক্ষয় শুরু হয়েছিল ঢাকার এবং কোম্পানী আমলে তা হয়ে উঠে দ্রুততর। শহর হয়ে উঠে জঙ্গলময়, প্রায় লুপ্ত হয় ব্যবসা বাণিজ্য। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে আবার পুনরুজ্জীবনের চিহ্ন চোখে পড়ে শহরের। রাস্তাঘাটের সংস্কার সাধন, শহরের আবর্জনা পরিস্কার এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রবর্তনের মাধ্যমে ঢাকার আধুনিক রূপায়নের প্রচেষ্টা চললেও বৃটিশ আমলে বস্তুতঃ ঢাকা পরিণত হয় বাংলা প্রদেশের একটি মফস্বল শহরে।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের পর ঢাকা পূর্ব বঙ্গ ও আসামের রাজধানীতে পরিণত হলে ঢাকায় নতুন করে প্রাণচাঞ্চল্যের সূচনা হয়।এসময় শহরের কাঠামোগত কিছু পরিবর্তন হয়। বঙ্গভঙ্গ রদ হলে রাজধানীর মর্যাদা হারায় ঢাকা এবং শহর উন্নয়নও স্থগিত হয়ে যায়।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর ঢাকা পুনরায় পরিণত হয় পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানীতে।তখন শহরের খানিকটা শ্রীবৃদ্ধি হয়। তবে, তা খুব সামান্যই। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানীতে পরিণত হয় ঢাকা। পৃথিবীতে ঢাকাই সম্ভবতঃ একমাত্র শহর যে শহর চারবার রাজধানী হবাব সৌভাগ্য অর্জন করেছে।এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য, বার বার রাজধানীর মর্যাদা হারানো সত্ত্বেও ঢাকা শহর হিসেবে একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি কখনোই। বাংলাদেশের রাজধানীতে পরিণত হবার পর থেকে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া আরো তরান্বিত হয়েছে। পূর্ব দিকে নীচু এলাকা যেমন, জুরাইন, গোরান, বাড্ডা, খিলগাও, রামপুরা, এবং পশ্চিম দিকে কামরাঙ্গির চর, শ্যামলি, কল্যাণপুর প্রভৃতি এলাকায় জনবসতি গড়ে উঠেছে। বর্তমানে ঢাকায় ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা ও উঁচু ভূমির স্বল্পতার কারণে আবাসিক ও বাণিজ্যিক উভয় এলাকাতেই বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে উঠছে। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপ এখানকার প্রাচীন ইমারত রাজির ওপরও এসে পড়েছে। স্থান সংকুলানের নিমিত্তে ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদ ও অন্যান্য ইমারত সমূহকে তাদের আদি বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট করে সম্প্রসারণ করা হচ্ছে।

প্রতিটি দেশের জন্যই তাদের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ মূল্যবান সম্পদ। এজন্য এদের যথার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা

Dhaka University Institutional Repository

নেয়া হয়। অথচ বাংলাদেশে এসব পুরাতন ইমারত সংরক্ষণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থা এখনো গ্রহন করা হয়নি। ফলে, ক্রমশঃ হারিয়ে যাচ্ছে ঐতিহ্যবাহি ঢাকা নগরীর বহু মূল্যবান ঐতিহাসিক নিদর্শন। আজকের ঢাকা নগরীর কেবল আধুনিক রূপ প্রত্যক্ষ করলেই চলবে না, ঢাকার অতীত ইতিহাসের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে পুরনো ইমারত সমূহের যথার্থ সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। তা যদি আমরা করতে সক্ষম হই তবেই ঢাকা সত্যিকার অর্থে বিশ্ববাসীর কাছে একটি উল্লেখযোগ্য নগরী হিসেবে প্রতিভাত হয়ে উঠবে।

পাদটীকা ঃ

১। মোঃ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৪

২। A. H. Dani, *Dacca, A Record of its Changing Fortune*, Dhaka, 1962, p, 12

৩। James Taylor, *Topography and Statistics of Dacca*, Calcutta, 1840, p, 21,

৪। মুনতাসির মামুন, *ঢাকা, স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ৮৯

৫। Sayed Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca*, Dhaka, 1904, p, 1-2

৬। রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, আ,স,ম শরফুদ্দীন (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৫, পৃঃ ৫০

৭। Abdul Karim. *Dacca, the Mughal Capital*, Dhaka, 1964, p, 8

৮। A. H. Dani, *Dacca*, p, 20-23

৯। Abdul Karim, *Dacca*, p, 26

১০। A. Karim, *Dacca*, p, 26

১১। রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, ঢাকা, ১৯৮২, পৃ, ৬

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬–৭

১৩। S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dhaka, 1956, p, 102

১৪। A. Karim, *Dacca*, p, 1

১৫। Abdul Momin Chowdhury, Shabnam Faruqui, 'Physical growth of Dhaka,' in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka, 1991, p, 45

১৬। A. Karim, *Dacca*. p, 31-33

১৭। Dani, *Dacca*, p, 21

১৮। A. Karim, *Dacca*, 31-34

১৯। Dani, *Dacca*, p, 203

২০। A. Karim, 'Origin and development of Mughal Dhaka,' in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka 1991, p, 31

২১। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩২

২২। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৩

২৩। A. Karim. *Dacca*, p, 37

২৪। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৬

Dhaka University Institutional Repository

২৫। প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৮

২৬। K. M. Mohsin, 'Commercial and Industrial Aspects of Dhaka' in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future,* Dhaka 1991, p, 69

২৭। A. Karim. *Dacca*. p. 47

২৮। Abdul Momin Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka,* p, 52

২৯। চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন,* শাহ্ মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১০

৩০। প্রগুক্ত, পৃঃ ১৩

৩১। প্রগুক্ত, পৃঃ ১৩

৩২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩

৩৩। S.U. Ahmed, *Dacca, A Study in Urban History and Development,* London, 1986, p, 129

৩৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১২৯

৩৫। চার্লস ড'য়লী , *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন,* পৃঃ ১২

৩৬। S. U. Ahmed, *Dacca*, p, 130-43

৩৭। A. M. Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka*, p, 54

৩৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

৩৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

৪০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

৪১। S.U. Ahmed, *Dacca*, p. 132

৪২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৯৯

৪৩। A. M. Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka,* p, 55.

৪৪। S. U. Ahmed, *Dacca,* p, 135.

৪৫। Hridayanath Majumder, *Reminiscences of Dacca,* Calcutta, 1926, p, 58

৪৬। Dani, *Dacca,* p, 117-119, S.U. Ahmed, *Dacca,* p, 201-207

৪৭। A. M. Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka,* p, 55

৪৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬

৪৯। Dani, *Dacca*, p, 127-33

৫০। A. M. Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka,* p, 56

৫১। H. Majumder, Reminiscences, p, 33

৫২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯

৫৩। A. M. Chowdhury, Shabnam Faruqui, *Dhaka,* p, 58

৫৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

৫৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

৫৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৮

Dhaka University Institutional Repository

৫৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৮
৫৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯
৫৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯
৬০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯
৬১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯

Dhaka University Institutional Repository

২য় পরিচ্ছেদ

ঢাকার মসজিদ স্থাপত্য

ঢাকার সুলতানী আর মুঘল যুগের খুব কম সংখ্যক মসজিদই বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় টিকে রয়েছে। বিশেষতঃ সুলতানী যুগের কেবল তিনটি মসজিদের অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে। মুঘল যুগের যে কয়টি মসজিদ আছে সামগ্রিকভাবে সে সকল মসজিদের অবস্থা ভাল নয়।

সুলতানী আর মুঘল যুগের সর্বমোট ৩৩টি মসজিদ আলোচনার জন্য নির্বাচন করা হয়। মসজিদগুলোকে কালানুক্রমিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মসজিদগুলোর আদিরূপ সম্পর্কে প্রাপ্ত সম্ভাব্য তথ্য এবং বর্তমান পর্যবেক্ষণ–উভয়ের সমন্বয়ে এক একটি মসজিদ আলোচনা করা হয়েছে। পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রতিটি মসজিদই অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে কতটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে তা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. বিনত বিবির মসজিদ, ১৪৫৬ ঃ

বর্তমানে ঢাকার সুলতানী যুগের যে তিনটি মসজিদ রয়েছে তার মধ্যে প্রাচীনতম মসজিদটির নাম বিনত বিবির মসজিদ। মসজিদটির অবস্থান নারিন্দায়। সুলতানী যুগের স্বল্প সংখ্যক টিকে থাকা স্থাপত্যের মধ্যে বিনত বিবির মসজিদের গুরুত্ব অপরিসীম। সুলতানী যুগে ঢাকায় মুসলিম স্থাপত্যের প্রকৃতি অনুধাবনে মসজিদটি অনেকটাই সহায়তা করে।

বিনত বিবির মসজিদ সৃষ্টিলগ্নে যেরূপ ছিল বর্তমানে তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আদিতে মসজিদটি ছিল বর্গাকৃতির (১২′×১২′)।[১] দেয়ালগুলো ছিল প্রায় ৬ ফুট চওড়া। মসজিদের চার কোনায় ছিল চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার।[২] মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ।[৩] মসজিদের প্যারাপেট বাংলার স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ছিল বাকানো (curved)।[৪] মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে ছিল মিহরাবের বর্ধিত অংশ এবং ছাদে ড্রামবিহীন অর্ধবৃত্তাকার একটি গম্বুজ।[৫] মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব ছিল (ভূমি নক্সা, পৃঃ ৬)। সমগ্র মসজিদ তৈরী হয় ইট দিয়ে। কারণ, মুঘল যুগের পূর্বে ইমারতে পলেস্তরা ব্যবহারের প্রচলন হয়নি।[৬] মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি রয়েছে। বিনত বিবির মসজিদে এই শিলালিপির অবস্থানের বিষয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কারণ, কোন পুরানো ইমারতের প্রাচীনত্ব প্রমানের প্রধান সাক্ষ্য বহন করে শিলালিপি, বিশেষ করে যেসব পুরানো ইমারত সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

বিনত বিবির মসজিদের ফার্সী শিলালিপির বাংলা তর্জমা এরূপ, "পরম দয়ালু ও করুনাময় আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্‌র রসুল।"

"এ গরীবের মসজিদে সকালে ও রাতে 'কৃতকার্য লাভ করার জন্য এসো' ধ্বনী দ্বারা সুশোভিত হলো।"[৭, ৮]

নির্মাণকারিণী মারহামাত কন্যা বখত্ বিনত, ৮৬১ হিজরী।

শিলালিপি থেকে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, মসজিদটি ১৪৫৬ সালে জনৈক মারহামাতের কন্যা বখত্ বিনত নির্মাণ করেন। শিলালিপিতে বাংলার সে সময়ের মুসলমান শাসকের নামের উল্লেখ নেই তবে সময়কাল বিচারে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যায় যে, মসজিদটি সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্ এর শাসনামলে (১৪৪২–১৪৫৯) নির্মিত হয়।[৯]
শামসুদ্দীন আহমেদ বিনত বিবির মসজিদের এই শিলালিপির প্রমানিকতার (authenticity) বিষয়ে সন্দেহ পোষন করে কতিপয় যুক্তির অবতারণা করেনঃ (ক) সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্ এর সময়কালের সকল শিলালিপি আরবী ভাষায় উৎকীর্ণ হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু ফার্সী শব্দের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু এই শিলালিপির সম্পূর্ণ বক্তব্যটি ফার্সীভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। কেবল 'বিসমিল্লাহ' ও 'কলিমা' ব্যতীত। (খ) সাধারণ ভাবে শিলালিপিতে সমসাময়িক মুসলমান শাসকের নামের উল্লেখ থাকে কিন্তু এই শিলালিপিতে তা অনুপস্থিত। (গ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে শিলালিপিতে সন তারিখ সংখ্যায় লেখা হয় কিন্তু এখানে সন তারিখ কথায় ব্যক্ত হয়েছে।[১০]
অন্যদিকে H.E. Stapleton বলেন, মসজিদের অবস্থান এলাকাটি পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় মসজিদটি যে উচু ভূমির দক্ষিণ পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত, সেই অঞ্চলেই ছিল ঢাকা শহরের প্রধান অংশ। সুতরাং শিলালিপির প্রাচীনত্বের বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১১]
শামসুদ্দীন আহমেদের বক্তব্য যে ভিত্তিহীন তা নয়। তবে, এ বিষয় স্বরণ রাখতে হবে যে, সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্–এর রাজত্বকালে ১৪৫৬ সালে ঢাকায় একটি মসজিদ নির্মাণ করা অসম্ভব কোন বিষয় নয়।[১২] সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহ্মুদ শাহ্র শাসনামলের পূর্বেই ঢাকা অঞ্চলে মুসলমানদের পদচারণা ঘটে। সোনার গাঁ এবং বাংলার পূর্বাঞ্চলে অর্থাৎ ময়মনসিংহ ও সিলেট সুলতান শামসুদ্দীন ফিরোজশাহ্ –এর শাসনামলে (১৩০১–১৩১১) মুসলমানদের দখলে আসে। ঢাকা সম্ভবতঃ এ সময়ই মুসলমানদের দ্বারা বিজিত হয়। অধিকন্তু সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ এর সময়কালের আরেকটি শিলালিপি পাওয়া যায় নারিন্দা থেকে পশ্চিমে অল্পদূরে নসওয়ালা গলিতে অবস্থিত একটি মসজিদে (১৪৫৯)।[১৩]
বস্তুতঃ বিনত বিবির মসজিদে পরবর্তী কালের বিভিন্ন সময়ের সংস্কারের ফলে অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, তবে আহমদ হাসান দানির বর্ননা থেকে মসজিদের আদিরূপ সম্পর্কে অনেকটা ধারণা পাওয়া যায়।[১৪] সুতরাং স্থাপত্য রীতি যেখানে মসজিদটিকে সুলতানী যুগের স্থাপত্য কর্ম হিসেবে প্রকাশ করছে সেখানে শিলালিপির প্রমানিকতার বিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।[১৫]
মসজিদের নির্মাণকারিণী বিনত বিবি সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। সৈয়দ আওলাদ হাসান মনে করেন মসজিদের নির্মাণ কারিনী বিনত বিবি সমাজের উচ্চ শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।[১৬] সম্ভবতঃ তিনি শিলালিপিতে বর্নিত 'গরীব' কথাটির অর্থ 'দরিদ্র' হিসেবে গ্রহন করে কথাটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।[১৭]
বস্তুতঃ 'গরীব; শব্দের অর্থ দরিদ্র হলেও এখানে তা বিনয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং এ বিষয় প্রতীয়মান হয় যে, বিনতবিবি সমাজের উচ্চ শ্রেণী ভুক্ত না হলেও তিনি সে সমাজের একেবারে নিম্ন শ্রেনীর অন্তর্ভূক্ত ছিলেন তা নয়।[১৮]
সৈয়দ মুহাম্মদ তৈফুর বিনত বিবি সম্পর্কে এধরণের মন্তব্য করেছেন যে, শিলালিপি পাঠ করে অনুমান করা যায় যে বিনত বিবি খুব ধর্ম প্রানা ব্যক্তি ছিলেন।[১৯]
বিনত বিবির মসজিদের বর্তমান সেক্রেটারী জনাব আব্দুল মালিকের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, বিনত বিবির পিতা জনাব মারহামাত উত্তর ভারত থেকে পরিবার পরিজন নিয়ে ব্যবসার উদ্দেশ্যে ঢাকায় আগমন করেছিলেন। সুতরাং মসজিদের সেক্রেটারীর বক্তব্য থেকে এ বিষয় অনুমান করা যায় যে বিনত বিবি ঢাকার স্থানীয় লোক ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বিনত বিবির মসজিদের আদিরূপ নির্ধারণ করা কষ্টকর কারণ; বিভিন্ন সময়ে মসজিদের ব্যপক পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। বর্তমানে এটি ত্রিতল মসজিদ (চিত্র–১)। প্রথম পর্যায়ে মসজিদের সম্প্রসারণ কালে দেখা যায় মসজিদের দক্ষিন দিকের দেয়াল সম্পূর্নভেঙ্গে দক্ষিন দিকে মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয় এবং সম্প্রসারিত অংশের ছাদে একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। ফলে, দৃশ্যতঃ এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির মসজিদটি দুই গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদে রূপান্তরিত হয়। এসময় মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়।[২০]

দ্বিতীয় পর্যায়ে মসজিদের সম্প্রসারণ করা হয় ১৯৬২ সালের পরবর্তী সময়ে।[২১] এ সময় মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়াল ভেঙ্গে মসজিদ কক্ষটিকে পশ্চিম দিকে সম্প্রসারণ করা হয়। সম্প্রসারিত পশ্চিম দেয়ালে নতুন করে মিহবার তৈরী করা হয়। পশ্চিম দিকে সম্প্রসারিত অংশের মধ্যবর্তী স্থানে দু'টি প্রশস্ত পিলার রয়েছে এবং ওপরে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ।[২২] মসজিদের পশ্চিম দিকের পেছনের আঙ্গিনায় একটি তারার আকৃতির চৌবাচ্চা তৈরী করা হয় (চিত্র –২)।

আদি মসজিদটি অলংকরণ বর্জিত সাদামাটা হলেও পরবর্তী কালে মসজিদের বিভিন্ন স্থানে বিশেষতঃ মসজিদের পূর্বদিকের বারান্দার সম্মুখভাগে (facade), উত্তর দিকের দেয়ালের বাইরের দিকে, গম্বুজ দু'টোর বহিরাবরণে, চৌবাচ্চার পাশগুলোতে চিনে মাটির বাসনের ভাঙ্গা টুকরো বসিয়ে অলংকরণ করা হয়। নতুন নির্মিত মিনারেও অনুরূপ অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। বিনত বিবির মসজিদের নতুন ও পুরোনো উভয় গম্বুজের বাকানো প্যারাপেটে মার্লন নক্সা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, বিনত বিবির মসজিদ সুলতানী যুগের স্থাপত্য কর্ম হলেও তার প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ সংযোজিত হয়েছে, অন্যদিকে সম্প্রসারিত অংশে নির্মিত গম্বুজের প্যারাপেট আদি গম্বুজের সাথে সাদৃশ্য রেখে বাকানো ভাবে তৈরি করা হয় এবং এর মধ্যে মার্লন অলংকরণ করা হয় অর্থাৎ বিভিন্ন সময়ের সংস্কার কালে দুই গম্বুজের মধ্যে একটি সাদৃশ্য আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয় (চিত্র–৩)।

সম্প্রসারণ কালে পূর্ব দিকের দেয়ালের ঘনত্ব কমানো হয় এবং সম্প্রসারিত পূর্বাংশে তিনটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করা হয়। লক্ষ্যনীয় যে, আদি মসজিদে এক সময় খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার থাকলেও এখন তা বোঝা যায় না কারণ, মসজিদের সবগুলো প্রবেশ দ্বারই সম্প্রসারণ কালে লিন্টেল যুক্ত করে সমান্তরাল করা হয়। তবে আদি মসজিদের উত্তর দিকের দেয়ালের বাইরের অংশে খিলান আকৃতির একটি বন্ধ প্রবেশ পথ রয়েছে, এই প্রবেশ পথটি এক সময় উন্মুক্ত ছিল তা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায়।

পুরোনো ও সম্প্রসারিত অংশের ওপর ১৯৮৫–৮৬ সনে দুটি তলা নির্মাণ করা হয়েছে।[২৩] দোতলায় নামাজ পড়ার ঘর ছাড়াও ছোট আরো দু'টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়, প্রধানতঃ বসবাসের জন্য। তিন তলায় নামাজ পড়ার জন্য একটি বড় কক্ষ রয়েছে। প্রতি তলাতেই পূর্বদিকে বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। বারান্দার সম্মুখ ভাগের দেয়ালে একাধিক (trifoil) ভাজযুক্ত খিলান করা হয়েছে। দোতলা ও তিনতলা নির্মাণ করার সময় বীম দিয়ে গম্বুজ দু'টো রক্ষা করা হয়। দোতলা ও তিনতলায় কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ রয়েছে। অধুনা মসজিদের বিভিন্ন স্থানে নানা বর্নের মোজাইক ও টালি ব্যবহার করা করা হয়েছে।

সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে বলা যায়, নতুন নির্মিত এই ত্রিতল মসজিদের মধ্যে বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট আদি মসজিদটি বিলুপ্ত প্রায়। পুরানো মসজিদের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে মসজিদের শিলালিপি, পূর্ব ও উত্তর দিকের দেয়াল, আদি গম্বুজ ও গম্বুজের নীচে বাকানো কার্নিশ, দক্ষিন ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের উপরিভাগের অংশ –এসবই আদি মসজিদের বর্তমানে টিকে থাকা চিহ্ন।[২৪]

Dhaka University Institutional Repository

বিনত বিবির মসজিদের যতটুকু অস্তিত্ব এখন টিকে রয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। কারণ, মসজিদের প্রাচীনত্বের মধ্যেই এর গুরুত্ব নিহিত।[২৫] অনেক লেখকই মন্তব্য করেছিলেন যে, ইসলামখান ঢাকায় আসার পুর্বে এখানে মুসলমানদের কোন স্থাপত্যকর্ম নির্মিত হয়নি। তাদের এই মন্তব্যকে ভ্রান্ত বলে প্রমান করেছে বিনত বিবির মসজিদ।[২৬]

২. নসওয়ালা গলির মসজিদ, ১৪৫৯ ঃ

কেন্দ্রিয় কারাগারের নিকটবর্তী উর্দূ রোডে অবস্থিত নসওয়ালা গলির মসজিদটি সুলতানী যুগে নির্মিত ঢাকার অপর আরেকটি মসজিদ। প্রাচীনত্বের দিক থেকে বিনত বিবির মসজিদের (১৪৫৬) পরই এর অবস্থান।[২৭] মসজিদ এলাকার প্রাচীন নাম গিরদকিল্লা এবং এই এলাকারই একটি রাস্তার নাম ছিল নসওয়ালা গলি।[২৮] এই নসওয়ালা গলিতে একটি উচু তোরণ তৈরী করা হয় এবং তোরনের সাথেই মসজিদটি নির্মিত হয়।[২৯]

মসজিদের আদিরূপ বহুপূর্বেই বিলুপ্ত হয়েছে, বর্তমানে মসজিদটির নবরূপায়ন হয়েছে। আদি মসজিদের শিলালিপি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ন শিলালিপির বাংলা তর্জমা নিম্নরূপঃ

"আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন, সকল মসজিদ একমাত্র আল্লাহ্র, অতএব, তোমরা আল্লাহ্র সাথে অন্য কারো উপাসনা করবে না। আল্লাহ্র সাহায্য প্রাপ্ত নাসির উদদুনিয়া আবুল মুজাফ্ফর মাহমুদ শাহ্ আস–সুলতানের খিলাফত কালে আল্লাহ্ পাক তার সাম্রাজ্যকে চিরস্থায়ী করুন। খাজা জাহান উপাধিধারী মুবারকবাদ ইকলিমের এলাকায় করুনাময় এ এলাকাকে বিচারের দিন পর্যন্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করুন। (খাজাজাহান) ৮৬৩ হিজরীর শাবান মাসের ২০ তারিখ এ তোরণ সুদৃঢ় ও নির্মাণ করেন।" [৩০]

শিলালিপি থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, মসজিদটি ১৪৫৯ সালে নাসিরউদ্দিন আবুল মুজাফ্ফর মাহ্মুদ শাহ্ –এর সময় নির্মিত হয়।[৩১] মসজিদটি নির্মাণ করেন তার মন্ত্রী খাজা জাহান।[৩২]

মসজিদের আদি রূপ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় মসজিদটি ছিল আয়তাকার (ভূমিনক্সা পৃঃ–৭)। ভেতর দিকে এর পরিমাপ দৈর্ঘ্য ২৮ ফুট ও প্রস্থে ১৬ ফুট এবং মসজিদের দেয়ালগুলো ছিল ৪ ফুট চওড়া।[৩৩] মসজিদে একটি গম্বুজ ছিল।[৩৪] গম্বুজটি বজ্রপাতে ভেঙ্গে পড়ে এবং ১৮৯৭ সালের ভূকম্পনে সমগ্র মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়।[৩৫] ১৯০৩ সালের দিকে সম্পূর্ন মসজিদটিই বিধ্বস্থ হয়।[৩৬]

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী জনাব হাবিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ কারের মাধ্যমে জানা যায় যে, মসজিদের প্রথম সংস্কার করা হয় ১৯৬৬ সালে। পুরোনো মসজিদের দেয়াল মাটির নীচে বসে গিয়েছিল।এসময় অদি মসজিদের পুনর্গঠনের কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, দেয়ালগুলো যেখানে বসে গিয়েছিল সেখানে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ না করে তার কিছুটা উত্তর দিকে নতুন মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ১৯৮৫ সালে পুনরায় মসজিদের সংস্কার করা হয়। এসময় আদি মসজিদের স্থানটি সম্পৃক্ত করে মসজিদটির সম্প্রসারণ করা হয়। সংস্কার কালে মাটি খুড়লে আদি মসজিদের ১০ ফুট উচু দেয়াল ও মিহরাব পাওয়া যায়। মিহরাবটি ফুল–পাতার নক্সা দিয়ে অলংকৃত ছিল।[৩৭] পুরোনো মসজিদের দেয়াল ও মিহরাবকে সেই অবস্থাতেই মাটি দিয়ে ভরাট করে তার ওপর মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

নব নির্মিত মসজিদটি কিছুটা উচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মসজিদে প্রবেশের জন্য বেশ কয়েকটি ধাপের সিড়ি

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। মসজিদ কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে দু'টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে, কক্ষটি বেশ প্রশস্ত। কক্ষের মধ্যবর্তী স্থানে চারটি পিলার রয়েছে এবং কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ। মসজিদ কক্ষের দক্ষিন দিকে তিনটি জানালা রয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ওজুর জন্য হাউজ রয়েছে। নব নির্মিত এই মসজিদটি মূলতঃ তিনতলা বিশিষ্ট (চিত্র–৫)। দোতলা ও তিন তলায় নামাজ পড়ার জন্য প্রশস্ত কক্ষ রয়েছে।

মসজিদের বাইরে সংলগ্ন অবস্থায় কতগুলো দোকান রয়েছে, যার ভাড়ায় মসজিদের রক্ষনাবেক্ষনের কাজগুলো চলে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায়, নসওয়ালা গলির প্রাচীন মসজিদটির কোন চিহ্নই আজ আধুনিক ত্রিতল এই মসজিদটি বহন করছে না। এমনকি মসজিদের শিলালিপিটিও যাদুঘরে। যদি মসজিদে লিপিটি পুনঃস্থাপন করা হতো তাহলে অন্ততঃ এটুকু বোঝা যেতো যে নব নির্মিত এই মসজিদটি প্রাচীন একটি মসজিদের স্থান দখল করে আছে।

৩. মিরপুর মাজার মসজিদ, ১৪৮০ ঃ

মিরপুরে অবস্থিত শাহ্ আলী বাগদাদীর মাজারটি প্রকৃতপক্ষে সুলতানী যুগে নির্মিত একটি মসজিদ (চিত্র–৬)। মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন হলেও এর মূল কাঠামো উপলব্ধি করা যায় (ভূমিনক্সা, পৃ, ৮)। মূলতঃ এটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির একটি মসজিদ, প্রতিদিকে পরিমাপ ৩৬ ফুট এবং মসজিদের চওড়া দেয়ালের ঘনত্ব ৭ ফুট।[৩৮] এই মাযার মসজিদের বর্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করলে দেখা যায় উচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এই মসজিদের চত্বরে প্রবেশ করার জন্য পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সিড়ি রয়েছে। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে, কর্নার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে প্লাস্টার করা কিয়স্ক বিদ্যমান; মসজিদের পূর্ব দিকে রয়েছে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ, খিলানগুলো আকৃতিতে four centred । মসজিদের উত্তর ও দক্ষিন দিকের তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ বর্তমানে জালি দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে মিহ্রাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে এবং ছাদে অষ্টভূজ ড্রামের ওপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজশীর্ষে কলস ফিনিয়াল বিদ্যমান। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহ্রাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহ্রাবটি প্রধান এবং আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজ (semi octagonal)। প্রধান মিহ্রাবের ফ্রেমের ওপর লতাপাতা নক্সা করা রয়েছে। অনুরূপ নক্সা গম্বুজের আবরনের নিম্নাংশেও লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদের মেঝেতে হযরত শাহ্ আলী বাগদাদীর কবর উচু করে বাধানো রয়েছে। শাহ্ আলী বাগদাদী সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে যে, "তিনি বাগদাদের একজন রাজকুমার ছিলেন। কিন্তু ঐশ্বর্য ও বিলাস ব্যসনের প্রতি নিরাসক্তির কারণে তিনি ইসলাম ধর্ম প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন; ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশ পরিভ্রমন করে একসময় ঢাকার মিরপুরে এসে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৫৯৯ সালে তিনি ৪০ দিন চিল্লায় থাকার পর প্রাণত্যাগ করেন"।[৩৯]

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে দু'টি শিলালিপি উৎকীর্ন করা রয়েছে। এর একটি আরবী নাস্তালিক লিপিতে উৎকীর্ন যার শেষের স্তবকটি ফার্সী ভাষায় শেখ সাদীর বস্তানী থেকে উদ্ধৃত। [৪০]

Dhaka University Institutional Repository

আরবী শিলালিপির ইংরেজী অনুবাদ ঃ

Allah, the most High has said, "surely he builds the mosques of Allah, who believes in Allah, and the last day and establishes prayer, pays poor-rates and fears no one except Allah, It is they that likely belong to such as are guided."

Quran, surah, 9, verse, 17.

The Prophet, peace and blessing be upon him, says, "He who builds a mosque in the world, Allah builds for him a house in paradise.

"This mosque was built during the reign of the Sultan of Sultans, shadow of Allah in the worlds, the khalifah of Allah in the lands, the Sultan, son of the Sultan, Shams-aldunya wal-din Abul Muzaffer Yusef Shah, the Sultan, son of Barbak Shah, the Sultan, son of Mahmud Shah, the Sultan, may Allah perpetuate his kingdom and sovereignty, and elevate his affairs and dignity, (built) by the Malik... the exalted khaqan, the hero of the period and the age.... Mohammad, the prophet, dated in the year 885 A.H. (1480-81 A.D) Allah's mercy reaches every moment, the soul of a man whose pious works continue after him." [৪১]

উল্লেখিত শিলালিপি থেকে এ বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, বাংলার সুলতান ইউসুফ শাহ্ এর সময় কালে অর্থাৎ ১৪৮০ খ্রীঃ এই মসজিদ নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় শিলালিপিটি ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ন। এর ইংরেজী অনুবাদ নিম্নরূপ–

This ground which is originally a masjid, was built in 885 A (1480 A.D.)

In the year 985 A.H. (1577-78 A.D.), out of misfortune it was in a ruinous condition. The Shah Ali came from the land of Bagdad to India. He sat on this spot and barred every door, so that the visit of mortals do not trouble him any more.

Till he joined the Truth (died) after leaving the decaying world. For him a new building was built, and the place of his rest became a place of renown. Its winter has turned to spring, from its ruinous condition it got life.

Now during the time of Nawab Nasir al-Mulk, in the year 1221 A.H, Its third re-building was made by Muhammadi Shah's piety of soul.

An unseen speaker said, 'O Allah', cover it completely with your shadow. 1221 A.H. (1806-07 A.D.) [৪২]

এই দ্বিতীয় শিলালিপি থেকে সংক্ষেপে মসজিদের আদি নির্মাণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে দু'বার এর সংস্কারের বিষয়টি জানা যায়। ১৪৮০ খ্রীঃ (৮৮৫ হিজরীতে) সুলতান শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ কর্তৃক এই মসজিদটি নির্মিত হয়।১৫৭৭ সালের দিকে মসজিদটি প্রায় ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে আসে। বাগদাদ থেকে শাহ্ আলী ভারতে আসেন এবং এই মসজিদের অভ্যন্তরে উপাসনায় মগ্ন হন। এখানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেন। তাঁকে উপলক্ষ্য করে মসজিদটি সংস্কার করা হয়। তবে কোন ব্যক্তি এসময় সংস্কার করেছিলেন তা জানা যায় না। তাঁকে মসজিদের অভ্যন্তরে কবর দেখা হয়। এর পর থেকে মসজিদটি মাজার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।

Dhaka University Institutional Repository

নবাব নাসিরউল মুলক নুসরৎ জঙ্গের সময়কালে মসজিদটির দ্বিতীয়বার সংস্কার করা হয় (১৮০৫ সালে)। সংস্কার করেন মগবাজারের অধিবাসী জনাব মুহম্মদী শাহ্ ।[৪৩]

মূলতঃ মিরপুরের এই মসজিদটির মাযার হিসেবেই খ্যাতি বেশী। জিলহজ্ব মাসে এখানে উরুস এবং একটি মেলা হয়, বহুসংখ্যক লোকের আগমন ঘটে তখন।[৪৪]

মাযার হিসেবে পরিচিতির কারণে মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণ ভালো হয়েছে। তবে এর বর্তমান রূপে সুলতানী যুগের স্থাপত্যের মূল কাঠামো অক্ষুন্ন থাকলেও মসজিদটিকে আপাত দৃষ্টিতে মুঘল যুগের একটি স্থাপত্য বলে মনে হবে।কারণ, সুলতানী যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য বলতে যা বোঝায় তার কিছুই এখন মসজিদে লক্ষ্য করা যায় না। যেমন, সুলতানী যুগের মসজিদে ড্রাম বিহীন গম্বুজ প্রত্যক্ষ করা যায়; কিন্তু এই মসজিদে গম্বুজের নীচে মার্লন নক্সা খচিত অষ্টভূজ ড্রাম রয়েছে। এছাড়া ফিনিয়াল, কিয়স্ক, four centred খিলান, এসবই মুঘল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য যা মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, বিভিন্ন সময়ের সংস্কারে এতে মুঘল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সংযোজন ঘটেছে। অধুনা মাজার-মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে মসজিদের সামনের চত্বরে ও মসজিদের অভ্যন্তরে মোজাইক বসানো হয়েছে এবং প্লাস্টারের উপর বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে।

মাজার-মসজিদের জনৈক খাদেম জনাব আব্দুল আজিজের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই মাজার-মসজিদের কাছেই আরেকটি পুরাতন মসজিদ ছিল। ক্ষুদ্রাকৃতির সেই মসজিদের ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থা তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন; মসজিদে জাফরী ইটের দেয়াল, কর্নার টাওয়ার ছিল। যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে পুরাতন সেই মসজিদটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে মাজার-মসজিদের সন্নিকটে উত্তর দিকে একতলা বিশিষ্ট প্রশস্ত আধুনিক একটি মসজিদ নির্মিত হয়েছে।

৪. ইসলাম খানের মসজিদ, ১৬১০-১৩ ঃ

ইসলাম খানের মসজিদের অবস্থান ইসলামপুরের সৈয়দ আওলাদ হাসান লেনে। সুবাদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে ঢাকায় সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন এবং ঢাকার নামকরণ করেন জাহাঙ্গিরনগর। জনশ্রুতির ভিত্তিতে বলা হয়ে থাকে ইসলাম খান এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৪৫] ইসলাম খান কোথায় বসবাস করতেন তা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যায় না, সম্ভবতঃ মসজিদের নিকটবর্তী স্থানেই তার আবাসস্থল ছিল এবং এ থেকেই এই এলাকার নাম হয় ইসলামপুর। [৪৬]

মসজিদে যে শিলালিপি ছিল তা এখন আর নেই। আওলাদ হাসান উল্লেখ করেছেন যে, কয়েক বছর পূর্বে তা তুলে ফেলা হয়েছে।[৪৭] মসজিদটিকে শহর পত্তন কালের প্রাচীনতম ইমারত বলা হয়ে থাকে।[৪৮] স্থাপত্য রীতির দিক থেকে মসজিদটি শায়েস্তা খানী স্থাপত্য রীতি থেকে ভিন্নতর এবং প্রাচীনতর, তবে মসজিদটি খুব মজবুত ভাবে নির্মিত হয়।[৪৯]

ইসলামখানের মসজিদটি মূলতঃ আয়তাকার তবে বহুবার সংস্কার, পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে মসজিদটি সর্বশেষ রূপ লাভ করেছে একটি দ্বিতল মসজিদের। এর আদিরূপ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় মসজিদটি পরিমাপে ছিল দৈর্ঘ্যে ৩৪ ফুট এবং প্রস্থে ১৪ ফুট।[৫০] মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এবং

Dhaka University Institutional Repository

মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত বড় (ভূমিনক্সা, পৃ, ৯)। মসজিদের পূর্বদিকের দেয়ালের সম্মুখভাগে (facade) কোন অলংকরণ নেই। প্রবেশদ্বারের খিলানগুলো অলংকরণ বর্জিত সাদাসিদে ধরণের। প্রকৃতপক্ষে মসজিদের এই সাদাসিদে রূপটিই প্রমান করেছে যে মসজিদটি মূলতঃ প্রাক শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতির মসজিদ।[৫১]

সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে ইসলাম খানের মসজিদে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। এর মধ্যে যদি আমরা আদি রূপটি খুঁজতে চাই তাহলে বলতে হবে মসজিদের প্রধান প্রার্থনা কক্ষটি এর আদি অংশ। মসজিদ কক্ষের অভ্যন্তর ভাগটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। কক্ষের উপরে তিনটি গম্বুজের ছাদ। অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এই গম্বুজ তিনটি অনেকটা আদিরূপে বর্তমান রয়েছে। গম্বুজের ভেতরের দিকে রঙিন প্লাস্টার করা হলেও গম্বুজের বহিরাবরণ অলংকরণ বর্জিত সাদাসিদে ভাবে রয়েছে (চিত্র–৮)। গম্বুজ শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সা এখন অতটা সুস্পষ্ট বোঝা যায় না, এর ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশে প্যারাপেটের ওপর একটি টারেটের উপরিভাগের অংশ লক্ষ্য করা যায়। সম্ভবতঃ পশ্চিম দেয়ালের বাইরের দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টো টারেট সংযুক্ত ছিল। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ অধুনা টালি ও বিভিন্ন রঙের ব্যবহারে একটি জমকালো রূপ নিয়েছে, কেবল গম্বুজ গুলোর বহিরাবরনই মসজিদের সৃষ্টি লগ্নের আদি রূপটির সাক্ষ্য বহন করছে।

মসজিদের সম্প্রসারণ হয়েছে মূলতঃ পূর্ব দিকে। মসজিদের পূর্বদিকে অনেকটা বারান্দার মত করে বাড়ানো হয়েছে। বারান্দার সামনে সারিবদ্ধ পিলারের ওপর খিলান রয়েছে এবং ওপরে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ (চিত্র–৯)। বারান্দার সম্মুখে বড় হলঘর রয়েছে। হলঘরের মধ্যবর্তী স্থানে একসারি পিলার রয়েছে এবং ওপরে সমান্তরাল ছাদ। হলঘরের উত্তর দিকে ছোট ছোট জানালা রয়েছে এবং দক্ষিন দিকে ওজুর জন্য চৌবাচ্চা রয়েছে। চৌবাচ্চার মধ্যবর্তী স্থলে একটি ফোয়ারা এবং চিনিটিকরীর অলংকরণ সমৃদ্ধ একটি পিলার রয়েছে। এই চিনিটিকরীর অলংকরণ মসজিদের সম্প্রসারিত অংশের পূর্বদিকের দেয়ালের বহিরাবরণেও লক্ষ্য করা যায়। সমগ্র মসজিদের মেঝেতে মোজাইক করা হয়েছে এবং দেয়ালের প্লাস্টারে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বদিকের সম্প্রসারিত অংশের ওপর দ্বিতল নির্মিত হয়েছে। দোতলায় নামাজ পড়ার জন্য বড় হলঘর রয়েছে। মসজিদে একটি মিনার রয়েছে।

সামগ্রিক পর্যবেক্ষনে বলা যায় অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে আদি মসজিদটি সম্পূর্নরূপে আড়াল পরে গেছে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই কেবল আদি মসজিদটি বোঝা যায়। তবে সেই পুরানো মসজিদকে আবার নানারূপে পরিবর্তন করে নতুন অংশের সাথে সংগতি পূর্ণ করার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। যেমন, লক্ষ্য করা যায় মসজিদের প্রবেশ দ্বারের তিনটি খিলান লিনটেল দিয়ে সমান্তরাল করা হয়েছে এবং মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সংস্কার ও সম্প্রসারণের নিমিত্তে মসজিদের গম্বুজগুলোর কোন ক্ষতি সাধন করা হয়নি। ঢাকার অনেক পুরানো মসজিদে লক্ষ্য করা গেছে যে, সম্প্রসারণকালে মূল গম্বুজগুলো ভেঙে তার ওপর দ্বিতল নির্মাণ করা হয়েছে। যেমনটি চকমসজিদ (১৬৭৬) ও চুড়িহাট্টা মসজিদ (১৬৪৯) –এর ক্ষেত্রে ঘটেছে। ইসলাম খানের মসজিদে আদি অংশকে পৃথক করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে ফলে, আদি অংশটুকু সম্পূর্ন না হলেও অনেকটাই অক্ষত রয়েছে।

ইসলামপুর এলাকাটি মূলতঃ ঘনবসতি পূর্ণ, মসজিদের চারপাশে অনেক দোকানপাট ও উচু ভবন থাকায় মসজিদটির আদি অংশ বাইরে থেকে দেখা যায় না। অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে ঢাকার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন এই মসজিদটি টিকে থেকেও যেন দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে।

Dhaka University Institutional Repository

৫. জিন্দাবাহার জামে মসজিদ, ১৬১২ ঃ

জিন্দাবাহারে অবস্থিত এই মসজিদটির আদিরূপ কেমন ছিল তা এখন আর বোঝার উপায় নেই। বর্তমানে এটা একটি দ্বিতল মসজিদ (চিত্র–১১)।আদি অবস্থায় মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি ছোট মসজিদ ছিল।[৫২] মসজিদটি প্রতিষ্ঠা করেন মীর মনসুর, ১৬১২ সালে।[৫৩]

মসজিদের বর্তমান মুয়াজ্জিন জনাব আবুল হাসেমের সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, আদিতে মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির ছিল, মসজিদের সম্মুখে ছিলো একটি কূয়ো (ভূমিনক্সা, পৃঃ –১০)। সময়ের বিবর্তনে মসজিদটি ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে আসে। মসজিদের পুনঃ নির্মাণ হয় ১৯৭১ সালে।[৫৪] এই পুনঃ নির্মাণ কালেই সম্ভবতঃ আদিরূপের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা বিলুপ্ত হয়ে যায়।

মসজিদের একতলায় প্রধান নামাজ কক্ষে প্রবেশের জন্য একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ পাশের দেয়ালে শিলালিপি রয়েছে (চিত্র–১২)।এই শিলালিপিটি মসজিদের প্রাচীনত্ব প্রমানের একমাত্র সাক্ষ্য বহন করছে অর্থাৎ শিলালিপির অবস্থান দেখে এটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এ মসজিদটি একসময় পুরাতন একটি মসজিদ ছিল। মসজিদের দোতলায় একটি নামাজ কক্ষ রয়েছে। মসজিদ এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ন; ফলে সম্পূর্ন মসজিদটি বাইরে থেকে লক্ষ্য করা যায় না। উল্লেখ্য যে, জিন্দাবাহারের এই মসজিদটি ঢাকায় মুঘল রাজধানী পত্তনের গোড়ার দিকের মসজিদ। সুতরাং ঐতিহাসিক গুরুত্ব ও স্থাপত্যিক মূল্য উভয় দিক থেকেই মসজিদটির বিশেষ ভূমিকা ছিল; অথচ এ বিষয়ের প্রতি আদৌ লক্ষ্য রাখা হয়নি।

৬. নবরায় লেন মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে) ঃ

মসজিদটি ইসলামপুরের নিকটবর্তী নবরায় লেনের সংকীর্ন গলির ভেতর অবস্থিত। দৃশ্যতঃ মসজিদটিকে নতুন একটি মসজিদ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি মুঘল যুগের একটি মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ ১০) ।

আহমদ হাসান দানির গ্রন্থে এই মসজিদের আদিরূপের বর্ণনা পাওয়া যায়। "মসজিদটি কিছুটা উচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মসজিদের এক কোনে একটি কূয়ো রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের সম্মুখভাগে (facade) প্যানেল করা এবং প্রতিটি প্যানেলের ভেতর ওজি (ogee) খিলান করা রয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি প্রধান এবং এতে বহুভাজযুক্ত খিলান করা রয়েছে পাশ্ববর্তী দু'টি প্রবেশ পথের খিলান তিন ভাজযুক্ত। মসজিদের মার্লন নক্সা খচিত প্যারাপেটটি সম্ভবতঃ নতুন করে সংস্কার করা। মসজিদের ভেতরে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে, এছাড়া অভ্যন্তরভাগে প্যানেল করে অলংকরন করা হয়েছে। পূর্বদিকে নতুন করে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়েছে। মসজিদের নির্মাতার নাম জানা যায় না। মসজিদের স্থাপত্য রীতি লক্ষ্য করে এর নির্মাণকাল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে তা অনুমান করা গেলেও মসজিদটির সঠিক নির্মাণ তারিখ নিরূপন করা যায় না।" [৫৫] মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট ছিল।[৫৬]

মসজিদের আদিরূপের সাথে বর্তমান রূপের কোন সাদৃশ্য নেই। এখন এটি একটি দোতলা মসজিদ (চিত্র–১৩)। মসজিদের প্রবেশ পথে বহুভাজ যুক্ত একটি খিলান রয়েছে এবং এই খিলানটি নানা বর্ণের মোজাইক

Dhaka University Institutional Repository

দিয়ে অলংকৃত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে একটি নামাজ কক্ষ রয়েছে। নামাজ কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে একটি প্রশস্ত দরজা রয়েছে। কক্ষের পশ্চিম দিকের দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। উপরে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ। এই কক্ষের পূর্ব দিকে বারান্দার বর্ধিত অংশ বিদ্যমান। বারান্দার দক্ষিণ প্রান্তে ওজুর জন্য ব্যবস্থা রয়েছে।

স্থানীয় এলাকাবাসী জনাব হাফিজ উদ্দীন বলেন, পূর্বে এই দক্ষিণ দিকে কূয়ো ছিল। অপর এলাকাবাসী জনাব মফিজুল ইসলাম বলেন, আদিতে মসজিদটি বর্গাকৃতির ও একগম্বুজ বিশিষ্ট ছিল। বর্তমান নামাজ কক্ষের পরিসর নিয়ে আদি মসজিদটির অবস্থান ছিল। তিনি বলেন, ষাটের দশকে মসজিদটি পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং দশ এগারো বছর পূর্বে (অর্থাৎ ৮২-৮৩ সালে) গম্বুজটি ভেঙ্গে দোতলা নির্মাণ করা হয়। দোতলায় একটি নামাজ কক্ষ রয়েছে।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় ঢাকার আরো অনেক পুরানো মসজিদের মতো নবরায় লেনের এই ছোট মসজিদটি তার পূর্বের সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে আধুনিকরূপ পরিগ্রহ করেছে।

৭. ঈদগাহ্, ১৬৪০ ঃ

ঈদগাহ্ বলতে বোঝায় চারদিকে দেয়াল দিয়ে ঘেরা একটি মসজিদ যার উপরিভাগ সম্পূর্ণ উন্মুক্ত (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২১)। ঈদগাহ্র পশ্চিম দিকে কোন সড়ক থাকলে ঈদগাহ্র পশ্চিম দিকের দেয়াল অপেক্ষাকৃত উচু করে নির্মাণ করা হয় মূলতঃ নামাজ আদায়কারী ও পথচারীদের মধ্যে একটি সীমানা নির্দেশ করার জন্য।[৫৭]

যেহেতু ঈদের জামাত বড় হয় সেজন্যই প্রধানতঃ ঈদগাহ্ বেশ প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়। ঈদের জামাত ছাড়াও অন্যান্য সময়ও এখানে জামাতে নামাজ পড়া হয়। মুঘল আমলে নির্মিত ঢাকার এই ঐতিহ্যবাহী ঈদগাহ্টির অবস্থান সাত মসজিদ সড়কের পূর্বদিকে ধানমন্ডি ১৩ এবং ১৪ নং রাস্তার মধ্যবর্তী স্থানে। এর নির্মাতা শাহ্সূজার দিওয়ান মীর আবুল কাশিম এবং নির্মাণ তারিখ ১৬৪০ খীষ্টাব্দ।[৫৮] ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের সর্বপ্রাচীন সঠিক তারিখ নির্ধারণ যোগ্য স্থাপত্য এই ঈদগাহ্।[৫৯] উল্লেখ্য যে, ইসলাম খানের মসজিদকে ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের মধ্যে সর্বপ্রাচীন টিকে থাকা স্থাপত্য হিসেবে ধারণা করা হয়, কিন্তু মসজিদের শিলালিপি বিলুপ্ত হওয়ায় মসজিদটির নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় না। ঈদগাহ্ অবস্থান এলাকা মুঘল ঢাকা শহরের অন্তর্ভূক্ত ছিল, শহরের মুসলমান ব্যবসায়ীরা প্রতিবছর এখানে একটি মেলার আয়োজন করতেন।[৬০] মেলায় বহুলোকের আগমন ঘটতো এবং পানাহার চলতো।[৬১]

এখানে বাংলার নাজিম ও সুবাদারগন তাদের পরিবার পরিজন এবং শহরবাসীদের নিয়ে দু'ঈদের নামাজ আদায় করতেন। [৬২]

ঐতিহ্যবাহী এই ঈদগাহ্টি একসময় পরিত্যক্ত হয় এবং ক্রমান্বয়ে ভগ্ন প্রাপ্ত অবস্থায় চলে আসে। দীর্ঘদিন ধরে এর পশ্চিম দিকের দেয়ালটি কেবল টিকে ছিল (চিত্র-১৪)। এটি আদিতে কিরূপ ছিল তা অনুসন্ধান করলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রকৃতপক্ষে ঈদগাহটি নির্মিত হয়েছিল পাশ্ববর্তী ভূমি থেকে প্রায় ৪ ফুট উচু একটি প্রশস্ত এলাকা নিয়ে।[৬৩] এই উচু চত্বরটি ইট দিয়ে নির্মিত ছিল।[৬৪] এর বিস্তার ছিল দৈর্ঘ্যে ২৪৫ ফুট এবং প্রস্থে ১৩৭ ফুট ।[৬৫] পশ্চিম দিকের দেয়ালের উচ্চতা ছিল ১৫ ফুট এবং উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়ালের উচ্চতা প্রায়

Dhaka University Institutional Repository

৬ ফুট।[৬৬] পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থলে একটি প্রায় অষ্টভূজি (semi octagonal) আকৃতির মিহরাব ছিল। মিহরাবের খিলানটি আকৃতিতে four centred এবং খিলানের বাইরে দিকে বহু ভাজ যুক্ত (multi cusped) অলংকরণ করা হয়।[৬৭] মিহরাবের কাছেই কিছুটা উত্তর দিকে দুই ধাপের একটি মিম্বার ছিল।[৬৮] প্রধান মিহরাবের দু'পাশে তিনটি করে অতিরিক্ত মিহরাব নির্মাণ করা হয়, এছাড়া সমগ্র পশ্চিম দেয়ালে সারিবদ্ধভাবে আয়তাকার ফ্রেমের ভেতর বহুভাজযুক্ত খিলানের প্যানেল করা হয়।[৬৯]

ঈদগাহ্‌র পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ অপেক্ষাকৃত উচু করে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়। ঈদগাহ্‌র প্রতিদিকের দেয়ালের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়। প্রধান মিহরাবের ওপর ফার্সী ভাষায় শিলালিপি উৎকীর্ন করা হয়। শিলালিপির বাংলা তর্জমা নিম্নরূপঃ–

"তিনি মীর আবুল কাশিম, তাঁর সম্পদের আকৃতি ও প্রকৃতি আল্লাহ্‌ তা'আলা রঙীন করেছেন, তার কৃতকর্মের দরুন লব্ধ মর্যাদা সর্বশ্রেনীর লোকের হৃদয়ে অনুকরনীয় আদর্শ এবং সকলের মুখে মুখে আবৃত্তি করার মত দৈনিক প্রার্থনা সরূপ। তিনি এমনি একটি ঈদগাহ্‌ নির্মাণ করেছেন, উচ্চতায় সেটা চাঁদের টুকরার ঈর্ষার বস্তু। তার মিম্বর শুভ মিনার এবং শরীয়তের তারকার আবাসস্থল। বিশেষতঃ ন্যায় বিচারক আল্লাহ্‌ তা'আলা তাকে এ প্রাসাদ নির্মাণ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তার নির্মাণের তারিখ উপলক্ষে এ পংক্তি বের হয়ে আসে। 'হিজরী' সাল ১ হাজার ও পঞ্চাশ"।

যখনই তুমি 'জমলের' হিসাব মতো গণনা করবে তার জমল পদ্ধতির গননা স্পষ্টভাবে হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে। ১০৫০ হিজরী।[৭০]

উল্লেখ্য যে, ঈদগাহ্‌টি একসময় মুঘল ঢাকা শহরের অন্তর্ভূক্ত থাকলেও মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী ঢাকা থেকে মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে এর অবস্থান এলাকার গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায় এবং সেই সাথে ঈদগাহ্‌'র ব্যবহার কমে আসে। লক্ষ্য করা যায় যে, এই শতাব্দীর শুরুর দিকে ঈদগাহ্‌ এলাকাটি শহর থেকে উত্তর পশ্চিমে প্রায় দেড় মাইল দূরে রায়ের বাজারের অন্তর্ভূক্ত হয়।[৭১] আওলাদ হাসানের গ্রন্থ থেকে (১৯০৪ সালে প্রকাশিত) জানা যায় যে, এসময় ঈদগাহ্‌র অবস্থা প্রায় ধ্বংস প্রাপ্ত হয়ে আসে। পূর্বে এখানে ঈদের জামাত বড় হলেও এসময় কেবল এর নিকটবর্তী এলাকার লোকেরাই প্রধানতঃ নামাজ পড়তে আসতেন। ঈদগাহ্‌র ব্যপক সংস্কার প্রয়োজন হলেও এই এলাকাবাসী মুসলমানেরা দরিদ্র বিধায়ে তাদের পক্ষে ঈদগাহ্‌র সংস্কার করা সম্ভব ছিল না।[৭২] ১৯৬০ এর দশকে আবাসিক এলাকা হিসেবে ধানমন্ডির পত্তন হলে ভগ্নপ্রাপ্ত ঈদগাহ্‌ সংস্কার করা না হলেও এর স্থানটি পরিস্কার করে বাৎসরিক জামাতের জন্য ব্যবহার উপযোগী করা হয়।[৭৩]

ঈদগাহ্‌র সাম্প্রতিক সংস্কার করা হয় ১৯৮৮–৮৯ সালে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে (চিত্র–১৫)। ঈদগাহ্‌র পুনঃনির্মাণ করা হয় মূলতঃ আদি পরিকল্পনা অনুসরণ করে। পূর্বের মতই এর কাঠামো নির্মাণে জাফরী ইট ব্যবহার করা হয়। সংস্কারকৃত ঈদগাহ্‌র চারদিকের দেয়ালের প্রতি কোনায় অষ্টভুজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে। এর পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান কিছুটা উচু করে প্রাধান্য সৃষ্টি করা হয়েছে; এই মধ্যবর্তী অংশে প্রধান মিহরাব এবং প্রধান মিহরাবের দু'পাশে তিনটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব (subsidiary mihrab) রয়েছে। এছাড়া দু'পাশে আরো এগারোটি করে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের পেছন দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে, এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত করা হয়েছে।

ঈদগাহ্‌র উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়াল গুলো উচ্চতায় পশ্চিম দেয়াল থেকে নীচু এবং দেয়ালগুলোতে সারিবদ্ধ ভাবে খিলান করা হয়েছে, খিলানগুলো লোহার জালি দিয়ে বন্ধ করা। ঈদগাহ্‌র প্রতিদিকের দেয়ালের

Dhaka University Institutional Repository

সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ দ্বারটি কিছুটা উচু করে নির্মাণ করা হয়েছে। প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি সংস্থাপন করা হয়েছে। (চিত্র–১৬)

সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বলা যায়, ঈদগাহ্'র সংস্কার কালে আদি পরিকল্পনা অনুসরণ করায় এর সংস্কার সুষ্ঠু হয়েছে। তবে এই সংস্কারকৃত রূপে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে, আদি পরিকল্পনায় ঈদগাহ্'র শিলালিপির অবস্থান ছিল পশ্চিম দেয়ালে প্রধান মিহরাবের ওপর কিন্তু বর্তমানে এর অবস্থান পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বারের ওপর। পূর্বে ঈদগাহ্'র অভ্যন্তরে ইটের চত্বর ছিল কিন্তু বর্তমানে চত্বরটি পাকা না করে ঘাস রাখা হয়েছে। তবে এর ফলে যে সংস্কার অসম্পূর্ণ হয়েছে তা বলা যায় না, বরং চারদিকে লালচে বাদামী রঙের দেয়ালের বেষ্টনীর ভেতর সবুজ ঘাসের চত্বর দৃশ্যতঃ চমৎকার দেখায়।

স্থানীয় অধিবাসী জনাব আব্দুল বারীর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, ঈদগাহ্'র পশ্চিম দিকের দেয়াল আংশিক টিকে থাকলেও উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকের দেয়াল সংস্কার করা হয় ঐদিকগুলোর আদি দেয়ালের চিহ্ন ধরে। এইসব দিকের দেয়ালের কিছু চিহ্ন মাটিতে ছিল।

ঈদগাহ্'র দক্ষিণ পূর্ব দিকে একটি মসজিদ ও সুউচ্চ মিনার হিদানিং তৈরী করা হয়েছে। ঈদগাহ্'র পূর্ব দিকের দেয়ালের সাথে সংলগ্ন অবস্থায় মসজিদটি থাকায় পূর্ব দিক থেকে ঈদগাহ্ সম্পূর্ণ ভাবে দেখা যায় না।

৮. হাজী বেগ মসজিদ, ১৬৪২ ঃ

হাজীবেগ মসজিদের অবস্থান পলাশীর ঢাকেশ্বরী রোডে। এটি চিরাচরিত মুঘল স্থাপত্য রীতির একটি মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ ১১)। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট (চিত্র–১৮)। চারকোনায় চারটি অষ্টভুজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে। কর্নার টাওয়ার গুলোর নিম্নদেশ অনেকটা ফুলদানির মত (vase) আকৃতি বিশিষ্ট এবং শীর্ষদেশে প্লাস্টার করা কিয়স্ক রয়েছে।

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করে সেই স্থানের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার সংযুক্ত করা রয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল করা হয়েছে, কোন কোন প্যানেলের ভেতর কুলঙ্গি (niches) করা রয়েছে (চিত্র–১৯)। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানগুলো আকৃতিতে four centred এবং অর্ধ গম্বুজের নীচে (half dome) অবস্থিত। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে এবং পূর্ব দিকের অনুরূপ মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি প্রশস্ত। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের পেছনের দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে এবং বর্ধিত অংশের দু'পাশে পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী স্থানের অনুরূপ দু'টি সরু মিনার দিয়ে বর্ডার করা রয়েছে।

মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা। মসজিদের ছাদের তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী গম্বুজটি প্রশস্ত। গম্বুজগুলোর অষ্টভুজি ড্রামে মার্লন অলংকরণ করা রয়েছে। গম্বুজ গুলোর শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল বিদ্যমান।

মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপির ঠিক নিচে বাংলায়

Dhaka University Institutional Repository

একটি ফলকে লেখা রয়েছে– "মসজিদের নির্মাতার নাম হাজীবেগ। নির্মাণ তারিখ ১১৩০ হিজরী, ১৬৮৩ ইংরেজী, ১০৮২ বাংলা সন।" মসজিদের নির্মাতা মজহার হাসান হাজীবেগ মুঘল সেনা বাহিনীর একজন অধ্যক্ষ ছিলেন।[৭৪]

মসজিদের নির্মাণ উপকরণ প্রধানতঃ ইট ও প্লাষ্টার হলেও মসজিদের ভিত্তি মূলে কালো কষ্টি পাথর (black basalt) ব্যবহৃত হয়েছে। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশ পথ থাকায় মসজিদের অভ্যন্তভাগে পর্যাপ্ত আলো বাতাস প্রবেশ করতে পারে না। কিন্তু হাজিবেগ মসজিদে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়, অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে তিনটি করে প্রবেশ পথ থাকায় মসজিদের অভ্যন্তরভাগে পর্যাপ্ত আলো বাতাস আসে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রধান এবং আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজি (Semi Octagonal) । মিহরাব খিলানে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের পূর্ব দিকে প্রধান প্রবেশ দ্বারের দু'পাশের দেয়ালে দু'টি কুলুঙ্গি (niches) করা রয়েছে। মসজিদের ছাদের গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের নিম্নাংশে মার্লন নক্সা করা রয়েছে।

সাম্প্রতিক কালে মসজিদের উত্তর দিকে কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মসজিদ কক্ষের পশ্চিম ও পূর্ব দিকের দেয়াল কিছুটা বর্ধিত করে উত্তর দিকে অরেকটি দেয়াল দেয়া হয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার অধিকাংশ মসজিদেই লক্ষ্য করা গেছে যে, মসজিদ কক্ষের সম্প্রসারণ কালে কোন এক দিকে দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হয়েছে, কিন্তু এই মসজিদের উত্তর দিকের দেয়াল ভাঙ্গা হয়নি। তবে উত্তর দিকের তিনটি প্রবেশ পথের দু'পাশের দু'টির উপরিভাগ সমান্তরাল করা হয়। বর্ধিত অংশের মধ্যবর্তী স্থানে দু'টি পিলার রয়েছে এবং ওপরে কংক্রিটের সমান্তরাল ছাদ। সম্প্রসারিত পূর্ব দেয়ালে লিনটেল দিয়ে সমান্তরালভাবে তিনটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করা হয়েছে। এই তিনটি প্রবেশ দ্বার সংযুক্তির ফলে মসজিদের পূর্ব দিকে দৃশ্যতঃ ছয়টি প্রবেশ পথের সৃষ্টি হয়েছে।

মসজিদের পূর্ব দিকে বারান্দার মত সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বারান্দার মাঝখানে দু'সারি পিলার রয়েছে এবং উপরে সমান্তরাল ছাদ। মসজিদের সামনের আঙ্গিনার উত্তর দিকে একটি ছোট গ্রন্থাগার এবং দক্ষিণ দিকে একটি চৌবাচ্চা রয়েছে। মসজিদের চার পাশ ঘিরে বেষ্টনী দেয়াল দেয়া হয়েছে, এরফলে মসজিদের দক্ষিণ দিকের কিছু অংশ আড়াল পড়ে গেছে।

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে, নির্মাণ কাল থেকে এখন পর্যন্ত দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হলেও আদি মসজিদের মূল চরিত্রের তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি। মূঘল স্থাপত্যের প্রায় সকল বৈশিষ্ট্যই এতে বিদ্যমান। মুঘল স্থাপত্যে ইমারতের মধ্যবর্তী অংশকে প্রধান্য দেয়ার যে প্রবণতা রয়েছে তার পরিচয় এই মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদের অনুরূপ এই মসজিদটিও আকৃতিতে আয়তাকার ও তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। ফলে, এই রীতির অন্যান্য মসজিদের সাথে এই মসজিদের একটি সাধারণ সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়।

৯. চুড়িহাট্টা মসজিদ, ১৬৪৯ ঃ

মসজিদটি চক বাজারের পশ্চিমে চুড়িহাট্টা এলাকায় অবস্থিত। মসজিদটি শাহ্ সূজার সুবাদারীর সময় মুহাম্মদ বেগ নামে একজন মুঘল কর্মচারী ১৬৪৯ সালে নির্মাণ করেন।[৭৫]

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদটি সম্পর্কে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে, মুঘল সরকারের জনৈক হিন্দু কর্মচারীকে একটি মসজিদ তৈরী করার নির্দেশ দেয়া হয়। কিন্তু তিনি মসজিদ নির্মাণ করার পরিবর্তে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। বিষয়টি ঢাকার দিওয়ানের দৃষ্টিগোচরে আসলে তিনি মন্দিরের মূর্তিগুলো সরিয়ে তাকে মসজিদে রূপান্তরিত করার নির্দেশ দেন।[৭৬] মসজিদে আরবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপি রয়েছে। আরবী শিলালিপির তর্জমা নিম্নরূপ ঃ [৭৭]

"আল্লাহ্ তা' আলা বলেন, 'একমাত্র তাঁরাই আল্লাহ্র মসজিদ সমূহের রক্ষনাবেক্ষণ করবেন, যাঁরা আল্লাহ্ ও পরকালের ওপর বিশ্বাস করেন, নামায আদায় করেন, যাকাত দেন এবং আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করেন না। একমাত্র তাঁরাই সৎপথ প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবেন। মহানবী (সাঃ) বলেছেন, 'যিনি একটি মসজিদ নির্মাণ করেন, আল্লাহ্ তা'আলা তারজন্য বেহেস্তে সত্তরটি ঘর নির্মাণ করেন।' সমসাময়িক কাল ও আমলের সুলতান সৌভাগ্যের অধিকারী আবুল মুজাফফর শিহাবউদ্দীন সম্রাট গাজী শাহ্ জাহানের আমলে যাঁর এক ঘন্টার সুবিচার জীব ও মানুষের সমুদয় নেক কাজের সমান, (বান্দা) মুহাম্মদ বেগ যিনি অনাদি, অনন্ত ও অপ্রত্যাশি আল্লাহ্র দয়া প্রত্যাশি। অল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে এবং তাঁর মাতা পিতাকে ক্ষমা করুন এবং তাঁদের উভয়ের ও তার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করুন, এ মসজিদ নির্মাণ করে।

তখন বাংলার শাসন ভার সম্রাটের পুত্র শাহ্ মুহাম্মদ সুজা বাহাদুরের প্রতিনিধির নিকট ন্যাস্ত থাকে (সুলতান মুহাম্মদ সুজা) ন্যায় বিচারক, ধর্মীয় বিধি ও শাসনক্ষমতার পতাকা সুউন্নতকারী। ধর্ম বিরোধী নতুন নতুন প্রথার মূল উৎপাটক এবং আসনসমূহ ও মসনদের শোভা বর্ধক।"

মসজিদে উৎকীর্ণ ফার্সী লিপির তর্জমা নিম্নরূপ ঃ

"শাহ্জাদা সুজার আমলে ধর্ম হীনতা (কুফরী) ইসলামের নিকট স্বীকৃতভাবে পরাজিত হয়। বিশেষতঃ এ আমলে ভাগ্যক্রমে এ পবিত্র মসজিদের নক্সা স্থাপিত হয়। আমি প্রজ্ঞা থেকে তার নির্মাণের তারিখ অনুসন্ধান করলে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাথে সাথে বলে দেয়া হলো তুমি 'কুফর' থেকে কুফরের কাফ দূর করে ফেলো। তাহলে 'কুফর' শব্দ থেকে পরাজয় বের হয়ে আসছে। ১০৬০ হিজরী।"

কিছু কাল পূর্বে মসজিদের সংস্কার কালে মসজিদের চত্বর খোড়া হয় এবং বাসুদেবের একটি মূর্তি পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ এটাই ঢাকার একমাত্র মন্দির যাকে মসজিদে রূপান্তরিত করা হয়।[৭৮] তবে বর্তমান ইমারতে মন্দিরের কোন চিহ্ন নেই, এটা সার্বিক ভাবেই একটি মসজিদ।[৭৯] মসজিদটির আদিরূপের এখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। বিভিন্ন সূত্র থেকে মসজিদের আদিরূপ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় আদি মসজিদটি ছিল আকৃতিতে আয়তাকার (ভূমিনক্সা, পৃঃ-১২)। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩০ ফুট এবং প্রস্থে ১৩ফুট।[৮০] মসজিদের চার কোনায় চারটি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার ও বর্গাকার প্যানেল করা হয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলান গুলো আকৃতিতে কিছুটা সূচালো (pointed) এবং প্রতিটি প্রবেশ পথ এক একটি অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। মসজিদের সমান্তরাল কার্নিশে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে।[৮১] মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে এবং মিহরাব গুলোর ওপরে এক সারি আয়তাকার প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশ দ্বার রয়েছে, এই প্রবেশ দ্বার গুলো দিয়ে অভ্যন্তর ভাগে আলো প্রবেশ করে।[৮২] মসজিদের ছাদটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঢাকার আয়তাকার মুঘল মসজিদগুলোর ছাদ সচরাচর তিনটি গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়, কিন্তু চুড়িহাট্টা মসজিদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের

Dhaka University Institutional Repository

ছাদটি চৌচালা ভন্ট আকৃতির। ভন্টের প্রান্তগুলো এবং মধ্যবর্তী স্থান বাকানো। এই ভন্ট আকৃতির ছাদটি উত্তর ভারতের পিরামিড আকৃতির ছাদের থেকে ভিন্নতর; অন্যদিকে এতে বাঙ্গালী রীতির চৌচালা চালের ঝুলন্ত প্রান্ত (eave) নেই।[৮৩]

চুড়িহাট্টা মসজিদের আদিরূপের যে বর্ণনা পাওয়া যায় বর্তমানে সেইরূপের কোন অস্তিত্ব নেই। সমগ্র মসজিদের ব্যপক সংস্কার ও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে এটা একটি দ্বিতল মসজিদ (চিত্র–২০)। পূর্বের চৌচালা ভন্ট আকৃতির ছাদ বিলুপ্ত করে দোতলা নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের আয়তাকার কক্ষের অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে, এই মিহরাবটি কেবল আদি মসজিদের অংশ বলা যায়। মসজিদের আয়তাকার কক্ষের সম্প্রসারণ হয়েছে উত্তরদিকে। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা তৈরী হয় ১৯৬২ সালের দিকে।[৮৪] বারান্দার সম্প্রসারিত অংশটি উত্তর দিকে কিছুটা গোল করে ঘোরানো। বারান্দার দক্ষিণে দোতলায় উঠার সিড়ি রয়েছে। দোতলার ছাদের দক্ষিণ দিকে একটি মিনার রয়েছে (চিত্র –২১)।

এলাকাবাসী এবং কবি ও সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত বেনজীর আহমদ মসজিদটিকে আদি রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন বলে জানা যায়। তিনি বলেন মসজিদের ছাদটি চৌচালা রীতির ছিল। মসজিদের সংস্কার কালে ছাদ ভাঙ্গার কাজে যথেষ্ট সময় লাগে কারণ ছাদটি খুব মজবুত ছিল। মসজিদের সংস্কার কালে বাসুদেবের যে মূর্তি পাওয়া যায় সেটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। মসজিদটি পূর্বে মন্দির ছিল এরকম একটি ধারণা প্রচলিত থাকায় এখানে লোক সমাগম কম হতো। সংস্কার ও পরিবর্তনের পর মসজিদে লোক সমাগম হচ্ছে।[৮৫]

মসজিদের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বলা যায় অতীতের সকল বৈশিষ্ট্য হারিয়ে মসজিদটি একটি নতুন রূপ নিয়েছে এবং এই নতুন রূপকল্প হয়েছে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে। শিলালিপি ছাড়া মসজিদের প্রাচীনত্ব প্রমাণের এখন আর কোন সাক্ষ্য নেই। চুড়িহাট্টা মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম। বিশেষতঃ মসজিদের চৌচালা ছাদটি বাংলার স্থাপত্যের স্বকীয় ভাবমূর্তির অন্যতম দৃষ্টান্ত। প্রকৃতপক্ষে বাংলায় ইটের স্থাপত্যে চৌচালা কুটির ন্যায় ছাদের প্রথম প্রচলন হয় সুলতানী যুগের স্থাপত্যে। ষাটগম্বুজ মসজিদ (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) এবং ছোটসোনা মসজিদের (১৪৯৩–১৫১৯) ছাদের মধ্যবর্তী অংশে চৌচালা কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার আরমানিটোলা মসজিদটি (১৭১৬) চৌচালা ছাদ বিশিষ্ট মসজিদের অপর দৃষ্টান্ত।

মির্যা নাথান তার 'বাহারিস্থান–ই–গায়বী'তে উল্লেখ করেছেন যে, মুঘলরা বাংলায় বাংলো রীতির ইমারত তৈরী করেছিলেন।[৮৬] বাংলায় এরূপ চৌচালা বা দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত 'বাংলো রীতি' নামে পরিচিত। উত্তর ভারতের যে সকল ইমারতে বাংলো রীতির ছাদ লক্ষ্য করা যায় (আকবর ও ইতেমাদ–উদদৌলার সমাধি), সেখানে এর প্রভাব এসেছে সম্ভবতঃ বাঙ্গালী কারিগরদের মাধ্যমে। তারা বাংলা থেকে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তর ভারতে যাত্রা করেছিলেন।[৮৭]

Dhaka University Institutional Repository

১০. হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদ, ১৬৬৪ ঃ

হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদের অবস্থান নারিন্দায়। এর নিকটেই রয়েছে ঢাকার সুলতানী যুগের প্রাচীনতম মসজিদ বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৬)।

হায়াৎ ব্যাপারী নামে জনৈক ব্যবসায়ী ১৬৬৪ সালে মসজিদটি নির্মাণ করেন।[৮৮] তিনি নারিন্দায় দোলাই খালের ওপর একটি পুল নির্মাণ করেছিলেন।[৮৯] প্রকৃতপক্ষে মসজিদের অবস্থান ছিল পুলের দক্ষিণ দিকে।[৯০] বর্তমানে পুলটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির ছিল।[৯১]

অনুমান করা যায় যে, সে যুগের মসজিদ স্থাপত্যের আনুষঙ্গিক বৈশিষ্ট্য নিয়েই হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এখন মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছুই আর বোঝা যায় না; মসজিদটির ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। মসজিদের আদি অংশের ছাদে কেবল একটি গম্বুজ রয়েছে। বস্তুতঃ মসজিদের আদি পরিকল্পনার সাথে বিনত বিবির মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। দু'টি মসজিদই পরিকল্পনায় বর্গাকৃতির ও একগম্বুজ বিশিষ্ট (ভূমিনক্সা, পৃঃ –১৩)।

হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদকে সম্প্রসারিত করা হয়েছে অনেকটা বিনত বিবির মসজিদের সম্প্রসারিত পরিকল্পনা অনুসরণ করে। মসজিদের দক্ষিণ দিকের দেয়াল ভেঙ্গে মসজিদ কক্ষকে দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারিত করা হয় এবং সম্প্রসারিত অংশের ছাদে একটি গম্বুজ বসানো হয়। ফলে বর্গাকৃতির মসজিদটি আয়তাকার ও দুই গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদে রূপান্তরিত হয়। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মসজিদ কক্ষে প্রবেশের জন্য চারটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বারগুলো লিনটেল দিয়ে সমান্তরাল ভাবে তৈরী। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত বারান্দা রয়েছে এবং এর ওপর দোতলা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র –২২)। দোতলায় নামাজ পড়ার জন্য একটি প্রশস্ত কক্ষ রয়েছে। উল্লেখ্য যে, মসজিদটির রক্ষনাবেক্ষণ ও আলোর ব্যবস্থার জন্য সুবাদার শায়েস্তা খান মসজিদের পার্শ্ববর্তী একশত বিঘা জমি দান করেছিলেন।[৯২] ১৯০৮ সালে এই একশত বিঘা জমির পরিমাণ হ্রাস পেয়ে দাড়ায় ১০/৮ বিঘায়।[৯৩] বর্তমানে মসজিদের জন্য বরাদ্দ জমির কিছুই আর অবশিষ্ট নেই।

মসজিদটির সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বলা যায়, অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের আদিরূপ ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। এখন দৃশ্যতঃ বোঝার উপায় নেই এটি একটি পুরানো মসজিদ।

১১. মগবাজার মসজিদ, ১৬৭০ ঃ

ঢাকার যে সকল পুরাতন মসজিদ তাদের আদিরূপ হারিয়ে সম্পূর্ন আধুনিক চরিত্র লাভ করেছে, সেই সকল মসজিদেরই একটি এই মগবাজার মসজিদ। মগবাজারের নয়াটোলায় অবস্থিত এই মসজিদটি একটি চারচতলা বিশিষ্ট মসজিদ।

মসজিদের প্রবেশ দ্বারের ওপর বাংলায় মসজিদের নির্মাণ তারিখ লেখা রয়েছে ১০৯০ হিজরী অর্থাৎ ১৬৭০ সাল। মসজিদে সন তারিখ সম্বলিত কোন শিলালিপি নেই। মসজিদটি এতটা পরিবর্তিত হয়েছে যে, আদিতে মসজিদটি কিরূপ ছিল তা বর্তমানে অনুমান করা আদৌ সম্ভব নয়।

Dhaka University Institutional Repository

স্যার চার্লস ড'য়লী তার 'Antiquities of Dacca' গ্রন্থে 'মগবাজার মসজিদ' নামে একটি মসজিদের স্কেচ্ একেছেন।[৯৪] যদি সেই মগবাজার মসজিদটি এবং বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এই মগবাজারে মসজিদটি এক ও অভিন্ন মসজিদ হয়ে থাকে, তাহলে আদিতে মসজিদটি কিরূপ ছিল তা ঐ স্কেচ থেকে কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

ড'য়লীর গ্রন্থের মগবাজার মসজিদটি উচু প্লাট ফর্মের ওপর নির্মিত একটি মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ-১৪)। মসজিদটি বর্গাকৃতির ও এক গম্বুজ বিশিষ্ট (চিত্র -১০২)। চারকোনায় চারটি কর্নার টাওয়ার রয়েছে, কর্নার টাওয়ার গুলোর গায়ে স্বল্প দূরত্বে গোলাকার ব্যান্ডের (band) মত রয়েছে এবং শীর্ষদেশে কিয়স্ক বিদ্যমান। মসজিদটির পরিসর খুব বেশী নয়। চিত্রে কেবল মসজিদের পশ্চিম ও উত্তর দিক লক্ষ্য করা যায়। ফলে পূর্ব দিকে কয়টি প্রবেশ দ্বার ছিল তা বোঝা যায় না; তবে অনুমান করা যায় পূর্বদিকে সম্ভবতঃ তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার ছিল। উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার ছিল। প্রবেশদ্বারের খিলান গুলো আকৃতিতে four centred এবং প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। প্রবেশ দ্বারের খিলান গুলো অর্ধগম্বুজের (half dome) নীচে প্রতিষ্ঠিত। মসজিদের দেয়ালগুলো আয়তাকার প্যানেল সমৃদ্ধ। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে এবং এর দু'পাশে অষ্টভূজি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালের উপরিভাগে তিনটি সারিতে সমান্তরাল ভাবে মার্লন অলংকরণ বিন্যাস্ত হয়েছে। এছাড়া মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের অষ্টভূজি ড্রাম মার্লন নক্সা খচিত এবং তার ওপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজ শীর্ষের পাদদেশে পদ্মপাপড়ির নক্সা এবং তার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের উচু প্লাটফর্মের অভ্যন্তরে যে ভল্ট আকৃতির কক্ষ ছিল তা স্কেচ্ দেখে উপলব্ধি করা যায়। প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে দু'টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বার গুলো খিলানের পরিবর্তে লিনটেল দিয়ে সমান্তরাল ভাবে নির্মিত। প্লাটফর্মের দেয়ালে আয়তাকার ও চতুষ্কৌনিক প্যানেল করা রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে স্কেচ্ থেকে কেবল মসজিদের বাইরের অংশেরই বর্ণনা দেয়া সম্ভব, মসজিদের অভ্যন্তরভাগ কিরূপ ছিল তা উপলব্ধি করা যায় না।

বর্তমান মগবাজার মসজিদের সাথে ড'য়লীর অঙ্কিত মগবাজার মসজিদের কোন সাদৃশ্য নেই। এখন এটি একটি চারতলা বিশিষ্ট মসজিদ (চিত্র-২৩)। তবে এমন হতে পারে যে, ড'য়লীর অঙ্কিত মসজিদটি কালের বিবর্তনে একসময় সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং সেইস্থানে পরবর্তী কালে যে মসজিদ নির্মাণ করা হয় সেটাই বর্তমানের মগবাজার মসজিদ।

তার আঁকা স্কেচে লক্ষ্য করা যায় যে মসজিদের গায়ে বৃক্ষলতা গজিয়েছে, অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই মসজিদটি অবহেলা ও অযত্নের শিকার হয়। আর এই অবস্থার নিশ্চিত পরিণতি হচ্ছে পুরানো মসজিদটির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি। যা মগবাজার মসজিদের ক্ষেত্রে ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়।

বর্তমানে মগবাজার মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য চারটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রধান প্রবেশ পথটি কিছুটা প্রাধান্য পূর্ন। প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর কোরআনের আয়াৎ সম্বলিত একটি শিলালিপি রয়েছে। প্রবেশ দ্বার গুলোর বাইরের দিকে দেয়ালের প্লাষ্টারের ওপর লতাপাতার নক্সা করা হয়েছে। একতলার প্রধান নামাজ কক্ষটি সুপ্রশস্ত। অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাব রয়েছে। মিহরাব ফ্রেমে প্লাস্টারের ওপর ফুল পাতার নক্সা করা হয়েছে। মসজিদ কক্ষের ওপর কংক্রিট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে স্বল্প পরিসরের একটি বারান্দা করা হয়েছে। মসজিদের দক্ষিন দিকে সিড়ি

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে ওপরে উঠার। মসজিদের চারতলার প্রতি তলাতেই একটি করে বড় নামাজ কক্ষ রয়েছে। মসজিদে অলংকরণ সমৃদ্ধ ১৩০ ফুট উচু একটি মিনার রয়েছে।[৯৫] (চিত্র–২৪)

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় দৃশ্যতঃ মগবাজার মসজিদটি সম্পূর্ণ আধুনিক একটি মসজিদ, কেবল কোরানের আয়াৎ সম্বলিত শিলালিপি এর প্রাচীনত্বের কিছুটা সাক্ষ্য বহন করে। স্থানীয় জনমনে এমন একটি ধারণা বিদ্যমান রয়েছে যে, এই মসজিদটি একটি পুরাতন মসজিদ। তবে দৃশ্যতঃ কোন ভাবেই উপলব্ধি করা যায় না যে এটি পুরাতন একটি মসজিদ।

১২. চক বাজার মসজিদ, ১৬৭৬ ঃ

শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত এই মসজিদটির অবস্থান চক বাজারের পশ্চিমে। প্রকৃতপক্ষে এই উপমহাদেশের প্রতিটি মুঘল শহরেই লক্ষ্য করা গেছে যে, শহরের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে একটি জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ এই জামে মসজিদটি ঐ শহরের প্রধান মসজিদ, যেখানে সম্রাট তার পাত্রমিত্র নিয়ে নামাজ আদায় করতেন। ঢাকার চক বাজার মসজিদটিও এমনি একটি প্রধান মসজিদ। মুঘলযুগে চক বাজারের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। মুঘল যুগের প্রাথমিক পর্যায়ে প্রধান দূর্গ বলতে বোঝাতো বর্তমানের কেন্দ্রিয় কারাগারের অভ্যন্তরে যে দূর্গ ছিল সেইটি। চক বাজারের অবস্থান এই দুর্গের দক্ষিণ–পশ্চিমে হওয়ায় একটি প্রধান মসজিদ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্থানটি ছিল যথার্থ। মসজিদটি ঢাকার অপরাপর মুঘল মসজিদ অপেক্ষা প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়। মূলতঃ এই মসজিদটি ছিল মুঘল সুবাদার ও উমারাহদের প্রধান মসজিদ। তাঁরা মসজিদের পূর্ব দিকের চত্বর থেকে মুহর্‌রম ও অন্যান্য বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন।[৯৬] নায়েব নাজিমরা এখানে দু'ঈদের নামাজ আদায় করতেন।[৯৭]

চক বাজার মসজিদটি প্রায় ১০ ফুট উচু প্লাটফর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্লাটফর্মের দৈর্ঘ্য ৯৪ ফুট এবং প্রস্থ ৮০ ফুট।[৯৮] মসজিদে প্রবেশের জন্য প্লাটফর্মের পূর্ব দিকের দু'প্রান্তে সিড়ি রয়েছে। আদি মসজিদটির অবস্থান প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে (ভূমিনক্সা, পৃঃ–১৫)।

মসজিদের আদিরূপ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায়, উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত আয়তাকার মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৫৩ ফুট এবং প্রস্থে ২৬ ফুট। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার এবং টাওয়ার শীর্ষে কুপোলা বসানো ছিল। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল করা রয়েছে এবং দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থান যথারীতি সামনের দিকে কিছুটা বর্ধিত করে (projected fronton) প্রধান্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে।[৯৯] তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত।

মসজিদের প্রবেশ দ্বার সাতটি। প্রবেশ দ্বারের খিলান গুলো আকৃতিতে four centred, পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে প্রধান প্রবেশ পথ। প্রধান প্রবেশ পথটি একটি অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। এই অর্ধ গম্বুজের উপরিভাগে প্লাষ্টারের ওপর জালির কাজ করা রয়েছে (চিত্র–২৫) । অনুরূপ জালির কাজ লালবাগ দূর্গ মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশে ফুলপাতার অলংকরণ রয়েছে এবং ওপরে উৎকীর্ণ শিলালিপি স্থাপন করা হয়েছে। এই শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি নবাব শায়েস্তা খান ১৬৭৬ সালে নির্মাণ করেন। [১০০]

Dhaka University Institutional Repository

রহমান আলী তায়েসের গ্রন্থ থেকে শিলালিপির অনুবাদ জানা যায়ঃ "আল্লাহ্‌র পথে অনুসারী আমীর উল-উমারা শায়েস্তা খান আল্লাহ্‌র জন্য আন্তরিকতার সাথে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অনুসন্ধানকারী প্রজ্ঞা থেকে যখনই নির্মাণের তারিখ অনুসন্ধান করলো, আমি বললাম আল্লাহ্ তা'আলার অনুগ্রহে ফরয আদায় হলো। ১০৮৬ হিজরী।"[১০১]

মসজিদের দেয়ালগুলো বেশ চওড়া। মসজিদটি সৃষ্টিলগ্নে যেরূপ ছিল, বর্তমানে তার ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। আদি মসজিদের চারকোনায় কর্ণার টাওয়ারের এখন কোন চিহ্ন নেই। মসজিদের অভ্যন্তরভাগের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে রয়েছে প্রধান মিহ্‌রাব। মিহ্‌রাবে এখন চকচকে সাদা রঙের টালি (tiles) বসানো হয়েছে। মিহ্‌রাবের বাইরের আয়তাকার ফ্রেমের ওপর ফুলপাতার নক্সা করা হয়েছে। বর্তমানে প্রধান মিহ্‌রাবের উত্তর দিকে তিনটি এবং দক্ষিণ দিকে একটি মিহ্‌রাব (subsidiary mihrabs) রয়েছে। উত্তর দিকে একটি মিম্বার রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে ছোট আকৃতির কয়েকটি জানালা রয়েছে। মসজিদের ছাদে একসময় তিনটি গম্বুজ থাকলেও দোতলা নির্মাণ করার সময় গম্বুজ তিনটি ভেঙ্গে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ নির্মিত হয়। মসজিদের দক্ষিণ দিকে একই প্লাটফর্মের ওপর হয়রত হাফেজ আহম্মদ (রাঃ) এর মাযার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মসজিদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দেয়ালের কিয়দংশ মাযারের অভ্যন্তরে চলে গেছে ফলে পশ্চিম দেয়ালে প্রধান মিহ্‌রাবের দক্ষিণ দিকের অতিরিক্ত তিনটি মিহ্‌রাবের স্থলে এখন কেবল একটি মিহ্‌রাব দেখা যায়। চক মসজিদের পূর্ব দিকের প্লাটফর্মের সম্পূর্ণটা জুড়েই সম্প্রসারণ হয়েছে। পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত অংশকে দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম অংশ মূল মসজিদের সামনে অনেকটা বারান্দার মত করে তৈরী করা হয়। বারান্দায় দু'সারি পিলার বিন্যস্ত হয়েছে। সম্মুখের সারির পিলারের ওপর খিলান বসানো হয়েছে ফলে দৃশ্যতঃ তা অনেকটা screen of arches এর মত দেখায়। বারান্দার ছাদ সমান্তরাল। পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত দ্বিতীয় অংশের মেঝেটি কিছুটা উচু। এখানেও সারিবদ্ধ পিলার রয়েছে এবং ওপরে সমান্তরাল ছাদ। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ওজু করার জন্য একটি হাউজ রয়েছে। মসজিদে পূর্বে 'বাউলী' নামে উত্তর ভারতীয় রীতির একটি কূয়ো ছিল। জনসাধারণের নিরাপত্তার জন্য সেই কুয়ো বন্ধ করে দেয়া হয়।[১০২] উল্লেখ্য যে, এই রীতির আরেকটি কূয়ো করতলাব খানের মসজিদের সন্নিকটে ছিল। বর্তমানে সেই কূয়োটিরও কোন অস্তিত্ব নেই। মসজিদের অভ্যন্তরে এবং বারান্দায় মেঝেতে মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে।

মসজিদের দোতলায় উঠার জন্য উত্তর দিকে সিঁড়ি রয়েছে। দোতলার সম্প্রাসারণ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আদি মসজিদের ঠিক ওপরেই অনেকটা মূল মসজিদের অনুকরণে তিনগম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার একটি কক্ষ নির্মাণ করা হয়। এই কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহ্‌রাব রয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ। মসজিদ কক্ষের ছাদের তিনটি গম্বুজ অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গম্বুজ গুলোর বহিরাবরণে 'চিনিটিকরীর' কাজ করা রয়েছে। এই মসজিদ কক্ষের সম্মুখে অর্থাৎ পূর্ব দিকে বড় হলঘর নির্মাণ করা হয়েছে। হলঘরে সারিবদ্ধ পিলার রয়েছে এবং ওপরে সমান্তরাল ছাদ (চিত্র-২৬)। মসজিদে চিনিটিকরীর অলংকরণ করা একটি ক্ষুদ্র আকৃতির মিনার রয়েছে। অধুনা একটি সুউচ্চ মিনার সংযোজিত হয়েছে (চিত্র-২৭)। মসজিদের সামগ্রিক মূল্যায়নে বলা যায় যে, আদি মসজিদের এতটা পরিবর্তনের মধ্যেও মসজিদটির সৃষ্টিলগ্নের প্রাধান্য পূর্ণ অবস্থাটি এখনো কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। তবে সংস্কার ও পরিবর্তনের নামে মসজিদের আদিরূপের যে বিকৃতি ঘটেছে তা বাস্তবিকই

Dhaka University Institutional Repository

দুঃখজনক। আদি মসজিদের গম্বুজ তিনটি ভেঙ্গে ওপরে অনুরূপ আরেকটি মসজিদ কক্ষ নির্মাণের কোন যৌক্তিকতা ছিল না। ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোর মধ্যে চক বাজার মসজিদের গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক। কারণ, এটি ছিল মুঘল রাজধানীর প্রধান মসজিদ। অথচ এ বিষয়ের প্রতি ঔদাসিন্য প্রদর্শন করা হয়। চক বাজার এলাকাটি জনবহুল বিধায় স্থানসংকুলানের বিষয়কে মূখ্য করে মসজিদের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ করা হয়।

১৩. আমলিগোলা মসজিদ, ১৬৭৬ ঃ

জগন্নাথ সাহা রোডের আমলিগোলা মসজিদের আদিরূপ এখন আর নেই। মূল মসজিদটি খুব ছোট (ভূমিনক্সা, পৃঃ–১৬)। বর্তমানে ছাদটি সমান্তরাল। ভেতরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে।
মসজিদে যে শিলালিপি ছিল তা এখন খোলা অবস্থায় রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। পূর্বে একটি গম্বুজ থাকলেও সংস্কারের সময় পুরোটা ভেঙ্গে নতুন করে গড়া হয়।[১০৩] মূল কক্ষের একটি দেয়াল কোনাকুনি ভাবে তৈরী। এখানে যে শিলালিপি আছে এটাই কেবল মসজিদের প্রাচীনত্ব প্রমানের দলিল। মসজিদে একটি ছোট মিনার রয়েছে (চিত্র–২৮, ২৯)।

১৪. খাজা অম্বর মসজিদ, ১৬৭৭-৭৮ ঃ

খাজা অম্বরের মসজিদটি সোনার গাঁ হোটেল পার হয়ে ময়মনসিংহ সড়কের পূর্বদিকে কাওরান বাজারে অবস্থিত। প্রকৃতপক্ষে ময়মনসিংহ সড়কটি নির্মাণ করেছিলেন মিরজুমলা।[১০৪] মসজিদের নির্মাতা খাজা অম্বর ছিলেন নবাব শায়েস্তা খানের প্রধান অমাত্য। খাজা অম্বর ধর্মীয় উদ্দিপনায় উদ্দীপ্ত হয়ে এই মসজিদ নির্মাণ করেন।[১০৫] তবে তিনি যে কেবল এই মসজিদটি নির্মাণ করেছিলেন তা নয়, মসজিদে উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, একই সাথে তিনি একটি কূপ খনন করেন এবং একটি পুল নির্মাণ করেন।[১০৬] ইস্কাটন খালের ওপর অত্যন্ত সুদৃঢ় ভাবে ইট দিয়ে এক খিলান বিশিষ্ট পুলটি নির্মিত হয়। এই পুলটি ঢাকা–ময়মনসিংহ সড়কের প্রথম পুল। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই পুলটি যান চলাচলের উপযোগী ছিল।[১০৭] বর্তমানে পুলটির কোন অস্তিত্ব নেই।
খাজা অম্বরের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি দৃশ্যতঃ চমৎকার।[১০৮] উচু প্লাটফর্মের ওপর পশ্চিমদিকে নির্মিত এই মসজিদটি প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বিতল মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ–১৭)। মসজিদ নির্মাণের উপকরণ হিসেবে এখানে ইট ও প্লাস্টারের সাথে কিছু পরিমানে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। এই পাথর আনা হয় বিহারের রাজমহল থেকে।[১০৯] পাথরের ব্যবহার হয়েছে মূলতঃ মসজিদের প্রবেশ পথের খিলানে, মিহরাবে ও মিম্বারে।
মসজিদ চত্বরে প্রবেশের জন্য প্লাটফর্মের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী স্থানে সিড়ি সংযুক্ত রয়েছে এবং সিড়ির ওপর একটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বারের খিলানে কালো কষ্টি পাথর (black basalt) ব্যবহৃত হয়েছে।
পরবর্তী বিভিন্ন সময়ের অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের অনেক পরিবর্তন ঘটেছে, তথাপি তিনগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের মূল কাঠামো, অলংকৃত সম্মুখ ভাগ (facade), সুদৃশ্য অভ্যন্তরভাগ এসব

Dhaka University Institutional Repository

কিছুরই যতটুকু অস্তিত্ব বর্তমানে রয়েছে তা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মসজিদটি মূলতঃ শায়েস্তাখানি স্থাপত্য রীতির একটি মসজিদ (চিত্র–৩০)। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে, এই খিলানগুলো আকৃতিতে four centred। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা (Projected fronton), এর মধ্যে প্রধান প্রবেশ পথটির অবস্থান। প্রধান প্রবেশ পথের ওপরই শিলালিপির অবস্থান রয়েছে।

ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এরকম– "সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তাঁর দ্বারা মহানবীর (সাঃ) ধর্মের মর্যাদাবৃদ্ধি পেয়েছে।তাঁর সৌভাগ্যের পরশে যখন শায়েস্তা খানের দ্বারা সারা বাংলা রাজ্য সুশোভিত হয়ে ওঠে তখন অভিজাত বংশীয় অম্বরের দ্বারা ঢাকার কূপ, পুল, বাগান ও মসজিদ প্রতিষ্ঠা করা হয়। নির্মাণের পর তার নির্মাণের তারিখের চিন্তায় প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনা করলে প্রজ্ঞার উদ্ভব হয়। একজন দৈব পুরুষ বলে উঠলেন হে প্রভু! পৃথিবীতে যেন মসজিদ, পুল ও খাজা অম্বর বাকী থাকে।" ১১০

মসজিদের দেয়ালগুলো বেশ চওড়া। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী প্রধান মিহরাবটি পাথর দিয়ে নির্মিত, মিহরাব ফ্রেমের ওপর ফুলপাতার নক্সা করা রয়েছে। এছাড়া প্রধান মিহরাবের ওপর কোরানের আয়াত সম্বলিত শিলালিপির অবস্থান লক্ষ্য করা যায়।১১১ উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশের দেয়ালে কুলুঙ্গি (niches) করা রয়েছে। প্রধান মিহরাবের উত্তর পাশে দু'টি ধাপের মিম্বার রয়েছে।

মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ রয়েছে, মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী দু'টো অপেক্ষা বড়। গম্বুজ শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা থাকলেও এখন তার সামান্যই বোঝা যায় (চিত্র–৩১)। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছন দিকে প্রধান মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে।

পরবর্তী কালে মসজিদের পূর্ব দিকে প্লাটফর্মের ওপর বারান্দার মত সম্প্রসারণ করা হয়। বারান্দার তিন পাশে দেয়াল দিয়ে ওপরে ছাদ তৈরী করা হয়। দেয়ালের গায়ে কিছু দূর পর পর খিলান তৈরী করা হয়েছে (চিত্র–৩২)। এই বারান্দার ছাদে তিনটি গম্বুজ নির্মিত হয়।১১২ মসজিদের উচু প্লাটফর্মের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেয়ালের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকের দেয়ালের দু'প্রান্তে দু'টি গোলাকৃতির কর্ণার টাওয়ার রয়েছে। কর্ণার টাওয়ার শীর্ষে কুপোলা বসানো রয়েছে। প্লাটফর্মের নীচে একটি বড় ঘর রয়েছে। ঢাকার অন্যান্য দ্বিতল মসজিদের নীচতলায় যেমন সারিবদ্ধঘর রয়েছে (মির্ধা, করতলাব, আজিমপুর মসজিদ), এই মসজিদে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এই বড় ঘরটি অনেকগুলো পিলার দিয়ে চৌকোনা অংশে বিভক্ত। এখানে রান্নাবান্নার কাজ হয় এবং কিছু লোক জন থাকে। প্লাটফর্মের দক্ষিণ দিকের দেয়ালে দু'টি জানালা এবং কক্ষে প্রবেশ করার জন্য একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই দু'টি জানালা এবং প্রবেশ দ্বার দিয়ে কক্ষের অভ্যন্তরে আলো আসে, স্বভাবতই তা পর্যাপ্ত নয়। ফলে, কক্ষের অভ্যন্তর ভাগটি অন্ধকারাচ্ছন্ন ও স্যাঁতসেতে। ঢাকার অপরাপর দ্বিতল মসজিদের নীচ তলার কক্ষগুলোর মেঝে সাধারণত ভাবে পার্শ্ববর্তী ভূমির সমান্তরালে নির্মিত হয়েছে কিন্তু এই মসজিদের নীচের কক্ষটির মেঝে ভূমি থেকে কিছুটা নীচু। অপরাপর দ্বিতল মসজিদের প্লাটফর্ম যতটা উচু এ মসজিদের প্লাটফর্মের উচ্চতা তা থেকে কম; এজন্য

Dhaka University Institutional Repository

আপাতঃ দৃষ্টিতে এটাকে একটি দ্বিতল মসজিদ আদৌ মনে হয় না।

'৮০ দশকে মসজিদের পূর্ব দিকে প্রায় আদি মসজিদের সাথে সংযুক্ত করে একটি চারতলা বিশিষ্ট উচু মসজিদ ভবন নির্মাণ করা হয়েছে। এই নবনির্মিত মসজিদ ভবনের অভ্যন্তরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে সিড়ি রয়েছে। এই মসজিদ ভবনের প্রতি তলাতেই প্রশস্ত নামাজ কক্ষ রয়েছে।

নতুন এই মসজিদটি নির্মানের ফলে পুরাতন মসজিদটি তার অতীত মর্যাদা ও গৌরব হারিয়েছে। অধিকাংশ মুসল্লীরাই এখন নতুন মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন। পুরাতন মসজিদটি অনেকটা অপরিছন্ন ও পরিত্যক্ত অবস্থায় রয়েছে। পূর্ব দিকে উচু মসজিদ ভবন নির্মাণের ফলে আদি মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ আবদ্ধ হয়ে গেছে। এখন মূল মসজিদে প্রবেশ করতে হয় নবনির্মিত মসজিদের অভ্যন্তরভাগ দিয়ে। সর্বোপরি এরূপ একটি উচু মসজিদ ভবন নির্মাণ করার ফলে আদি মসজিদটি পূর্ব দিক থেকে সম্পূর্ণ আড়াল পড়ে গেছে। সুতরাং এ কথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, স্থান সংকুলানের জন্য এ ধরণের একটি উচু মসজিদ ভবন নির্মাণ করে পুরাতন মসজিদের অতীত মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে।

১৫. শায়েস্তা খানের মসজিদ, ১৬৬৪-৭৮ ঃ

সলিমউল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ এবং মিটফোর্ড হাসাাতাল এলাকার অভ্যন্তরে এই মসজিদের অবস্থান। মসজিদের দক্ষিণ দিকে বুড়িগঙ্গা নদী প্রবাহমান। বুড়িগঙ্গা নদীর উত্তর তীরের এই এলাকাটি পূর্বে পাকুরতলী নামে পরিচিত ছিল এবং বর্তমানে তা বাবু বাজার নামে খ্যাত। এই স্থানের নাম বাবু বাজার হয় ভূকৈলাশের ঘোষাল বাবুদের নাম থেকে, তারা এখানে একটা বাজার প্রতিষ্ঠা করেন।[১১৩]

ঢাকায় নবাব শায়েস্তা খানের নির্মিত ইমারত সমূহের মধ্যে এই মসজিদটি প্রাচীনতম ইমারত বলে অনুমান করা হয়। মসজিদের সন্নিকটেই ছিল নবাবের কাঠের তৈরী বাসভবন। সেই নবাব বাড়ির কোন নিদর্শন আজ আর নেই। কেবলমাত্র বাবু বাজার ঘাট থেকে পূর্বদিকে খাল পর্যন্ত একটি ভিত আছে। নবাব শায়েস্তা খান এই ঘাটটি তৈরী করেন।[১১৪]

তাঁর বাড়ির সীমানা ছিল দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা, উত্তরে সড়ক, পূর্বে বাবু বাজার এবং পশ্চিমে মিটফোর্ড হাসপাতালের পশ্চিম সীমানার সড়ক।[১১৫] নবাব শায়েস্তা খানের সুবাদারীর আমলেই চক বাজারে নির্মিত হয় ছোট কাটরা (১৬৬৪–৭৭)। নবাব শায়েস্তা খান তার প্রথম দফার সুবাদারীর সময় (১৬৬৪–৭৮) মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১১৬]

আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি পরিসরে খুব বড় নয় এবং অলংকরণ বর্জিত সাদাসিদে ভাবে নির্মিত। মসজিদটি পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ৩৮ ফুট এবং প্রস্থে ১৬ ফুট।[১১৭] মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে (ভূমিনক্সা, পৃঃ ১৮)। প্রবেশ দ্বারের খিলান গুলো অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। ড্রামের গায়ে মার্লন নক্সা করা ।

বর্তমানে মসজিদটিতে শায়েস্তাখানি স্থাপত্য রীতির তেমন কোন বৈশিষ্ট্য টিকে নেই (চিত্র–৩৪)। মসজিদে একবার আগুন লেগে ব্যপক ক্ষতিহয়। ক্ষতিগ্রস্থ মসজিদকে পুনঃসংস্কার করেন গণপূর্ত অধিদপ্তর (public works department), এ দপ্তরের স্থাপত্য ইতিহাস সম্পর্কে ন্যূনতম ধারণা রয়েছে।[১১৮]

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের কেন্দ্রিয় প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি রয়েছে। আগুনে শিলালিপি ক্ষতিগ্রস্থ হলে শিলালিপির কিয়দংশ বিশেষ করে মসজিদ নির্মাণের সন তারিখ পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[১১৯] যতটুকু উপলব্ধি করা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, শিলালিপিটি ঢাকার অপরাপর মসজিদের মত ফার্সী ভাষায় পদ্যে রচিত। সম্ভবত ঃ এর রচয়িতা নবাব স্বয়ং।[১২০]

শিলালিপির যতটুকু পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে তার বাংলা অনুবাদ এরূপ, "সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ্‌র জন্য এবং ধর্মভীরু লোকদের জন্য পরকাল অপেক্ষা করছে। (অতঃপর সকলকে জানানো যাচ্ছে যে) যেহেতু আল্লাহ্ তা'আলার দয়া প্রত্যাশী, দীনহীনের মঙ্গল কামনাকারী আমীর উল উমারা শায়েস্তা খান ইমারত নির্মাণ করে ধর্মীয় বিধি অনুসারে এ পবিত্রস্থান ওয়াক্‌ফ করেছেন। তাই এ ইমারত থেকে প্রাপ্ত সমুদয় আয় মসজিদের সেবায়, নির্মাণ কাজে নিযুক্ত ব্যক্তিগণ ও ভার প্রাপ্ত লোকদের ..... ক্ষমতার অধিকারী শাসকগন ও প্রসিদ্ধ উমারাগণ এ সৎ কাজ চালু ও স্থির রাখবেন যেন এ ওয়াকফে ..... থাকে অধিকার থেকে বঞ্চিত হবে করে ..... অধিকারীগণ ..... বছর হলো।"[১২১]

মসজিদের উত্তর দিকে শায়েস্তা খানের কন্যা সাজ্জাদা খানমের (লাডলী বেগম) সমাধি রয়েছে।[১২২] মসজিদটি আগুনে ক্ষতিগ্রস্থ হলেও এটি একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম এবং ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা এখানে নিয়মিত নামাজ আদায় করেন।[১২৩]

মসজিদটির বর্তমান অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায় যে, আয়তাকার মসজিদটির চারকোনায় যে চারটি অষ্টভজি কর্ণার টাওয়ার ছিল, তার মধ্যে মসজিদের পূর্ব দিকের দু'প্রান্তের কর্ণার টাওয়ারের নিম্নদেশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কেবল মসজিদের পশ্চিম দিকের দু'প্রান্তের দু'টি কর্ণার টাওয়ার অটুট রয়েছে।মসজিদের পূর্ব দিকের প্যারাপেটের ওপর মধ্যবর্তী গম্বুজের সম্মুখে দু'টি পিনাকেল রয়েছে। অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত বড়। গম্বুজ গুলোর শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার উপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। গম্বুজগুলো আকৃতিতে কিছুটা নীচু (squat)। এরূপ গম্বুজ খাজা শাহ্‌বাজ ও ভাট মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ দ্বারের খিলান গুলো আকৃতিতে four centred এবং প্রতিটি অর্ধ গম্বুজের (half dome) নীচে অবস্থিত। এই মসজিদের একটি লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ দু'টি। এ দু'টি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ পূর্বদিকের অনুরূপ অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। সাধারণ ভাবে ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোতে পূর্ব দিকের প্রবেশ পথ গুলো অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত থাকলেও উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ গুলোতে অর্ধগম্বুজ থাকে না। এই মসজিদে তার ব্যতিক্রম হওয়াতে সমগ্র স্থাপত্যে একটি সুসামঞ্জস্যতা লক্ষ্য করা যায়। অধুনা উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ গুলোতে নীচের দিক থেকে কিছুটা দেয়াল তুলে দেয়া হয়েছে ফলে দৃশ্যতঃ এই প্রবেশ দ্বার গুলো এখন গবাক্ষে রূপান্তরিত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের বাইরের দিকে (facade) কোন প্যানেল অলংকরণ নেই। তবে আদিতে ছিল কিনা তা এখন নিশ্চিত রূপে বলা যায় না করণ, দীর্ঘদিন ধরে এতে সংস্কার হয়েছে বহুবার। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাবের বর্ধিত অংশ (mihrab projection) রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও সাদামাটা রূপ বিরাজমান। মসজিদের অভ্যন্তরভাগে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের দু'পাশে একটি করে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থানে প্রায় অষ্টভূজি একটি মিহরাব রয়েছে এবং প্রধান মিহরাবের দু'পাশে একটি করে ক্ষুদ্র আকৃতির মিহরাব রয়েছে। এই অতিরিক্ত মিহরাবগুলোতে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে তাক বসানো হয়েছে।

অধুনা মসজিদের পূর্ব দিকে বারান্দার মত করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বারান্দার ওপরে টিনের চাল। বারান্দায় চাল থাকার কারণে মসজিদের সম্মুখভাগ অনেকটাই দৃষ্টির আড়ালে চলে গেছে। মসজিদের সম্মুখে ও চারপাশে হাসাতালের বিভিন্ন ইমারত থাকার কারণে মসজিদটি বাইরে থেকে এক রকম দেখা যায় না। কেবল দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত বুড়িগঙ্গা নদী থেকে মসজিদটি দৃশ্যমান।

প্রকৃতপক্ষে মসজিদটির গুরুত্ব এখানেই যে, এই ইমারত থেকেই ঢাকায় শায়েস্তা খানি স্থাপত্যরীতির সূচনা। যদি মসজিদটি তার আদিরূপে বিরাজমান থাকতো তাহলে এ রীতির প্রাথমিক স্বরূপ আরো স্পষ্টভাবে অনুধাবন করা সম্ভব হতো।

১৬. লালবাগ দুর্গ মসজিদ, ১৬৭৮-৭৯ ঃ

আওরঙ্গবাদ কিল্লা নামে পরিচিত লালবাগ দূর্গ আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র শাহ্জাদা মুহাম্মদ আযম ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ শুরু করেন (চিত্র–৩৬)। তবে তিনি এর নির্মাণ শেষ করে যেতে পারেননি, মারাঠাদের সাথে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধের সময় তাঁর সাথে যোগদান করার উদ্দেশ্যে তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। দূর্গটি অসমাপ্ত অবস্থায় থাকলেও দূর্গের অভ্যন্তরের মসজিদটি তিনি নির্মাণ করে যান বলে অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ মসজিদে বর্তমানে কোন শিলালিপি না থাকায় এর নির্মাতা কে ছিলেন এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায় না। প্রকৃতপক্ষে মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল স্থাপত্য রীতিতে নির্মিত হয়েছে। এই রীতির চরম বিকাশ ঘটেছে নবাব শায়েস্তা খানের সময়ের স্থাপত্যে (ভূমিনক্সা, পৃঃ–১৯)। বর্তমানে আমরা মসজিদটিকে যে রূপে প্রত্যক্ষ করছি তা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংস্কারকৃত রূপ। মসজিদটিকে সংস্কার করা হয়েছে এর মূল পরিকল্পনা অনুসরণ করেই। ঐতিহ্যবাহী এই মসজিদটি যে এক সময় ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় পৌছেছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় আওলাদ হাসানের গ্রন্থ থেকে (১৯০৪ সালে প্রকাশিত)। তিনি মসজিদটিকে একেবারে বিধ্বস্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ কারেছেন, সে সময় মসজিদটি বাদুড় আর ছাগলের আবাসস্থলে পরিণত হয়েছিল। এই সুদৃশ্য স্থাপত্য কর্মটি পরিমাপে ছিল দৈর্ঘ্যে ৫৫ ফুট ও প্রস্থে ১৯ ফুট।[১২৪]

মুনশী রহমান আলী তায়েস তার গ্রন্থে (১৯১০ সালে প্রকাশিত) মসজিদটিকে তিনগম্বুজ বিশিষ্ট একটি বড় মসজিদ হিসেবে উল্লেখ করেন। তবে তিনিও এর ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থার কথা বলেন।[১২৫] সুতরাং এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, এই উল্লেখযোগ্য মসজিদটি বর্তমান শতাব্দীর প্রথম দশকে একেবারে ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় ছিল। তবে ১৯৬০ সালের দিকে এর সংস্কার করা হয় কারণ আহমদ হাসান দানির বর্ননায় (১৯৬১ সালে প্রকাশিত) এই মসজিদটিকে অক্ষত অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়।[১২৬]

লালবাগ দুর্গের অভ্যন্তরে সবুজ ঘাসের আঙ্গিনার মধ্যে কিছুটা উচু পাথরের চত্বরের পশ্চিম দিকে মসজিদের অবস্থান (চিত্র–৩৭)। পরিকল্পনার দিক থেকে মসজিদটি আয়তাকার এবং পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ৬৫ ফুট ও প্রস্থে ৩২ ফুট।[১২৭] আওলাদ হাসান মসজিদের যে পরিমাপ দিয়েছেন, তার সাথে দানির বর্ণনার পরিমাপের কিছুটা তারতম্য রয়েছে। সম্ভবতঃ সংস্কার কালে মসজিদের পরিধি বৃদ্ধি করা হয়, তবে এই পরিধি বৃদ্ধি পাওয়ায় মসজিদের আঙ্গিক কোন পরিবর্তন হয়নি। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে প্লাস্টার করা কিয়স্ক বিদ্যমান। এই কিয়স্কগুলো উচ্চতায় প্যারাপেট ছাড়িয়ে গেছে। মসজিদের পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে, খিলান গুলো আকৃতিতে four centred. তিনটি প্রবেশ পথই এক একটি অর্ধ গম্বুজের নীচে অবস্থিত। অর্ধগম্বুজের ভেতরের দিকে প্লাস্টারের ওপর জালির কাজ করা হয়েছে (চিত্র–৩৮)। পূর্বদিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশটি সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা (projected fronton) রয়েছে এবং এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার সংযুক্ত করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দিকে তিনটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের ছাদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজটি পাশ্ববর্তী দু'টি গম্বুজ অপেক্ষা প্রশস্ত। গম্বুজ তিনটির গায়ে শির তোলা (fluted) রয়েছে তবে পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দু'টি আকৃতিতে কিছুটা bulbous ।তিনটি গম্বুজই অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং গম্বুজগুলোর শীর্ষে যথাক্রমে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

মসজিদের বহিরাবরণের অলংকরণের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পূর্বদিকের দেয়ালে প্লাস্টারের ওপর আয়তাকার প্যানেল করা হয়েছে এবং প্রতিটি আয়তাকার ফ্রেমের অভ্যন্তরে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ সমৃদ্ধ কুলুঙ্গি (niches) রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথের খিলান গুলোতে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। গম্বুজের অষ্টভূজি ড্রামে পাতার ন্যায় নক্সা করা হয়েছে (basal leaf ornamentetion)।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। এই বে'তিনটি দৈর্ঘ্যে সমান হলেও মসজিদের পাশ্ববর্তী গম্বুজ গুলোর আকৃতি হ্রাস করা হয়েছে phase of transition এ অর্ধগম্বুজ (half dome) ব্যবহারের মাধ্যমে। দানির মতে, লালবাগ দূর্গ মসজিদেই সর্বপ্রথম মসজিদের দৈর্ঘ্য কমিয়ে পাশ্ববর্তী গম্বুজ গুলোর আকৃতি হ্রাস করে মধ্যবর্তী গম্বুজকে প্রাধান্য দেয়ার রীতির সূচনা হয়।[১২৮] ইতিপূর্বে ঢাকার মুঘল মসজিদগুলোর দৈর্ঘ্য মসজিদের প্রস্থের তিনগুন হতো, কিন্তু লালবাগ দূর্গ মসজিদে তার ব্যতিক্রম ঘটানো হয়, তবে মধ্যবর্তী গম্বুজের পরিধি মসজিদের প্রস্থের সমান রাখা হয়। এরপর থেকে ঢাকার অপরাপর মসজিদে এই রীতিটিই অনুসরণ করা হয়।[১২৯]

তবে লক্ষ্য করা গেছে যে লালবাগ দূর্গ মসজিদের পূর্ববর্তী মসজিদ গুলোর দৈর্ঘ্য সব ক্ষেত্রে প্রস্থের তিনগুন ছিল না। যেমন ইসলাম খানের মসজিদ (১৬১০–১৩), পরিমাপে ৩৪′×১৪′, শায়েস্তা খানের মসজিদ (১৬৬৪–৭৮), পরিমাপে ৩৮′×১৬′, চকবাজার মসজিদ (১৬৭৬), পরিমাপে ৫৩′×২৬′। সুতরাং লালবাগ দূর্গ মসজিদ নির্মাণের পূর্ব থেকেই ঢাকায় এই রীতির মসজিদ নির্মাণ প্রচলিত ছিল একথা বলা যায়। তবে phase of transition এ অর্ধগম্বুজ বসিয়ে মসজিদের ছাদে গম্বুজ বসানোর যে কৌশল লালবাগ দূর্গ মসজিদে প্রত্যক্ষ করা যায়, তা ঢাকার স্থাপত্যে একটি নতুন সংযোজন।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে, মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রশস্ত। প্রধান মিহরাবের উত্তর পাশে কালো কষ্টি পাথরের (black basalt) মিম্বার রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পূর্ব দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল করা রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথে বর্তমানে কাঠের দরজা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথে লোহার জালি দেয়া হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগে প্রধান মিহরাবের পাশ্ববর্তী মিহরাব দু'টিতে কাঠের পাল্লা লাগিয়ে দেয়াল আলমারীর মত ব্যবহার করা হচ্ছে। মসজিদের বাইরের পাথরের চত্বরের সম্মুখে আরো কিছুদূর স্থান নিয়ে ইটের চত্বর তৈরী করা হয়েছে, অর্থাৎ মসজিদ সংলগ্ন এলাকাকে সুগঠিত করে সুপ্রশস্ত করা হয়েছে। জনসাধারণের ব্যবহারের সুবিধার্থে মসজিদ সংলগ্ন এলাকা রেলিং দিয়ে কেল্লার বাকী

Dhaka University Institutional Repository

অংশ থেকে পৃথক করা হয়েছে। কেল্লার উত্তর পশ্চিম কোনে একটি ছোট দরজা দিয়ে লোকজন মসজিদে যাতায়াত করেন।

সামগ্রিক ভাবে বলতে গেলে বলা যায়, লালবাগ দূর্গ মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য কর্ম। মসজিদের প্রতিটি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিদ্যমান। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদই লালবাগ দূর্গ মসজিদের অনুরূপ।

লালবাগ দূর্গ মসজিদে স্থান সংকুলানের জন্য মসজিদের পূর্বদিকে বাঁশ ও ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী ভাবে ব্যবস্থা নেয়া হয়। সমগ্র লালবাগ দূর্গটি প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধীনে থাকায় মসজিদটির সংরক্ষণ ভালো হচ্ছে।

১৭. হাজী খাজা শাহ্বাজ মসজিদ, ১৬৭৯ ঃ

সোহ্রাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম কোনে মসজিদটির অবস্থান। মসজিদটির নির্মাতা হাজী খাজা শাহ্বাজ সম্পর্কে বলা হয় তিনি ছিলেন ঢাকার "মালিক উত-তুজ্জার" (merchant prince)।[১৩০]

প্রশস্ত আঙ্গিনা সহ এটি একটি সুবিন্যাস্ত মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ-১৯)। কিছুটা উচু ভিত্তির পশ্চিম দিকে রয়েছে মসজিদ এবং পূর্ব দিকে খাজা শাহ্বাজের সমাধি। তিনি তাঁর জিবদ্দশাতেই মসজিদ এবং সমাধি নির্মাণ করে যান।[১৩১] মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায়, মসজিদটি খাজা শাহ্বাজ ১০৮৯ হিজরী অর্থাৎ ১৬৭৯ সালে নির্মাণ করেন।[১৩২] এ সময় বাংলার সুবাদার ছিলেন শাহ্জাদা আযম (১৬৭৮-১৬৮০)।[১৩৩] পূর্বে এই এলাকাটি 'চিশতিয়ান' নামে পরিচিত ছিল।[১৩৪]

মসজিদে ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এরূপ, "খাজা হাজী শাহ্বাজ এ পবিত্র ঘর নির্মাণ করেন। উচ্চতায় এটি মহান 'আরশ' এর সমকক্ষ। পূর্ণ প্রজ্ঞার ভাষায় এ পবিত্র ঘর নির্মানের 'তারিখ' হাজী খাজা শাহ্বাজের দ্বারা সুশোভিত' হতে এসেছে। ১০৮৯ হিজরী।"[১৩৫]

শায়েস্তাখানি স্থাপত্য রীতির একটি অন্যতম নিদর্শন এই মসজিদ (চিত্র-৩৯)। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদটির বাইরের দিকের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৬৮ ফুট এবং প্রস্থে ২৬ ফুট।মসজিদের চারকোনার কর্ণার টাওয়ার গুলোর আকৃতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় কর্ণার টাওয়ার গুলো মসজিদের প্যারাপেট পর্যন্ত অষ্টভূজি এবং এর ওপর গোলাকৃতি ধারণ করেছে। কর্ণার টাওয়ারগুলোর শীর্ষে শির তোলা কুপোলা রয়েছে।[১৩৬] প্রতি দিকের কর্ণার টাওয়ারের সন্নিকটে একটি করে টারেট রয়েছে।[১৩৭] মসজিদ নির্মাণের প্রধান উপকরণ ইট হলেও পাথরের যথেষ্ট ব্যবহার হয়েছে এখানে। মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বার ও চৌকাঠে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের একেবারে নিম্নাংশে যাকে আমরা তলদেশও বলতে পারি সেখানে সমান্তরালভাবে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর মধ্যে ফুলপাতার নক্সা করা হয়েছে। এ কাজ সূক্ষ্ম না হলেও দৃষ্টিনন্দন (চিত্র-৪০)।

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা হয়েছে (projected fronton)। এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি সংকীর্ণ পিলার দিয়ে বর্ডার করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ; তিনটি খিলানই বহুভাজ যুক্ত এবং মধ্যবর্তী প্রধান প্রবেশ পথের খিলানটির আকৃতি কিছুটা সুচালো (pointed)। প্রতিটি প্রবেশ পথের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার সংযুক্ত রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের পূর্ব দিকে প্রধান প্রবেশ দ্বারের দু'পাশের দেয়ালে আড়াআড়ি ভাবে পাঁচটি সারিতে বিন্যাস্ত আয়তাকার প্যানেল রয়েছে। প্রতিটি আয়তাকার প্যানেলের ভেতর তিন ভাজযুক্ত কুলুঙ্গি রয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রাকমুঘল যুগের ইমারতে অলংকরণ হিসেবে টেরাকোটা বা অলংকৃত ইট (ornamented brick) ব্যবহৃত হলেও মুঘল যুগের স্থাপত্যে তার অনুপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। এর বিকল্প হিসেবে প্লাস্টারের ওপর প্যানেল করার রীতি প্রচলন হয়। এই প্যানেল অলংকরণ ইমারতে বৈচিত্র নিয়ে আসে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে এবং খিলানগুলোতে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি সমান আকৃতির এবং কিছুটা নীচু ধরণের (squat) গম্বুজ রয়েছে (চিত্র–৪১)। গম্বুজ গুলোর শীর্ষে কলস ফিনিয়াল রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার তিনগম্বুজ বিশিষ্ট প্রায় সকল মুঘল মসজিদেই লক্ষ্য করা গেছে যে, মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলোর চাইতে আকৃতিতে বড় হয়। যেমন, ইসলাম খানের মসজিদ, শায়েস্তা খানের মসজিদ, লালবাগ দূর্গ মসজিদ, খাজা অম্বর মসজিদ, মির্ধা মসজিদ প্রভৃতি মসজিদে আমরা এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি না। কেবল খাজা শাহ্বাজ মসজিদেই ব্যতিক্রমটি চোখে পড়ে।এই মসজিদটি ঢাকার তিনটি সমান আকৃতির গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের একমাত্র দৃষ্টান্ত। তবে ঢাকার বাইরে এই রীতির অনেক মসজিদ রয়েছে। যেমন, শেরপুরের খন্দকার টোলা মসজিদ (১৬৩২), ফিরুজপুরের শাহ্ নিয়ামত উল্লাহ্ ওয়ালীর মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে), সরাইলে আরিফিল মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে)।[১৩৮]

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। ল্যাটারাল আর্চ দু'টিতে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে (চিত্র–৪২)। ল্যাটারাল আর্চের এই অলংকরণ মসজিদ কক্ষটিকে বিশেষত্ব দান করেছে। মসজিদ কক্ষের ছাদের তিনটি গম্বুজের অভ্যন্তরভাগের নিম্নাংশ মার্লন নক্সা খচিত রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রধান এবং অলংকরণ সমৃদ্ধ। প্রধান মিহরাব আর্চটি পাথর দিয়ে নির্মিত চমৎকার নক্সা খচিত দু'টি পিলারের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মিহরাব আর্চটি বহুভাজযুক্ত এবং আর্চের স্পেন্ড্রেলে ফুলপাতা ও বর্ষার ফলকের (spear head) অলংকরণ করা হয়েছে। এছাড়া পশ্চিম দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। প্রধান মিহরাবের উত্তরদিকে দু'টি ধাপের পাথরের নির্মিত মিম্বার রয়েছে।

স্থাপত্যের দিক থেকে এই মসজিদের প্রতিটি অংশের গঠনশৈলী, এমনকি অলংকরণেও এতটা সামঞ্জস্যতা রয়েছে যে, সামগ্রিক ভাবে সম্পূর্ণ মসজিদটিকে অত্যন্ত মনোরম দেখায়। প্রকৃতপক্ষে খাজা শাহ্বাজ মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল রীতিতে নির্মিত একটি মসজিদ অর্থাৎ ইতিপূর্বে নির্মিত ঢাকার মুঘল মসজিদে যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় এই মসজিদেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্যের অবতারণা করা হয়েছে।তবে সেই সকল বৈশিষ্ট্যের প্রয়োগ হয়েছে এই মসজিদে আরো সুদৃশ্য ও সুচারু ভাবে। অলংকরণের ক্ষেত্রে এই মসজিদে যতটা মনোনিবেশ করা হয়েছে এ রীতির অন্য কোন মসজিদে তেমনটি লক্ষ্য করা যায়না। উদাহরণ স্বরূপ ল্যাটারাল আর্চের কথা বলা যায়। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট ঢাকায় অপরাপর সকল মসজিদেরই অভ্যন্তর ভাগ দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত হয়েছে, কিন্তু ল্যাটারাল আর্চে কোন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়না। অথচ এই মসজিদে ল্যাটারাল আর্চে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করার ফলে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি পেয়েছে বহুগুন। সর্বোপরি খাজা শাহ্বাজ মসজিদের অলংকরণের মধ্যে কোন আতিশয্য নেই, রয়েছে মার্জিত এক রুচির পরিচয়।

খাজা শাহ্বাজের এক গম্বুজ বিশিষ্ট সমাধিটিও একটি উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যকর্ম (চিত্র–৪৩)। আঙ্গিনার উত্তর পূর্ব

Dhaka University Institutional Repository

দিকে অবস্থিত এই সমাধির দক্ষিণ দিকে সংযুক্ত রয়েছে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট একটি ছোট কক্ষ। অনুরূপ চাল বিশিষ্ট কক্ষ করতলাব খানের মসজিদের উত্তর দিকে লক্ষ্য করা যায়।

মূলতঃ একই আঙ্গিনার অভ্যন্তরে অবস্থিত মসজিদ ও সমাধিটি চারদিকে দেয়ালে দিয়ে পরিবেষ্টিত ছিল এবং এই আঙ্গিনার প্রবেশ পথ ছিল দক্ষিণ পূর্ব কোনে। পূর্বে ঐ দিকটিরই গুরুত্ব ছিল বেশী।[১৩৯] বর্তমানে দক্ষিণ পূর্ব দিকে বিভিন্ন ইমারত নির্মিত হওয়ায় প্রবেশ পথটি আর ব্যবহার করা যায় না।

মসজিদ ও সমাধি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকায় এর সংরক্ষণ ভালো হচ্ছে। এই মসজিদের পূর্বদিকে নামাজ পড়ার জন্যে বাঁশ ও ত্রিপল দিয়ে অস্থায়ী ভাবে সম্প্রসারণ করা হয়। মসজিদের কিছুটা দক্ষিণ–পশ্চিমে শেরে বাংলা ফজলুল হক, হুসাইন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিম উদ্দীনের সমাধি রয়েছে। সমাধির সুউচ্চ স্থাপত্যকর্ম মসজিদটিকে অনেকাংশে আড়াল করে ফেলেছে।

১৮. মুসা খানের মসজিদ, ১৬৭৯ ঃ

মুসা খানের মসজিদের অবস্থান কার্জন হলের দক্ষিণ–পশ্চিম কোনে। মসজিদের অবস্থান এলাকাটি পূর্বে 'বাগ–ই–মুসা খান' নামে পরিচিত ছিল।[১৪০] মুসাখান ছিলেন বাংলার বিখ্যাত বারো ভুঁইয়াদের অন্যতম ঈসা খানের পুত্র; তিনি মুঘল সুবাদার ইসলাম খানের কাছে আত্মসমর্পন করে শান্তিপূর্ণ ভাবে জীবন যাপনের অনুমতি লাভ করেন।[১৪১]

মসজিদটির পরিচিতি মুসা খানের নামে হলেও প্রকৃতপক্ষে মসজিদের নির্মাতা ছিলেন মুসা খানের পূত্র মুনওয়ার খান। ১৬৭৯ সালে তিনি এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১৪২] মসজিদটি একটি দ্বিতল মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২০)। উচু প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে মসজিদের অবস্থান। মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করার জন্য প্লাটফর্মের দক্ষিণ দিকে সিড়ি সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার এবং মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে (চিত্র–৪৫)। কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে কুপোলা বসানো হয়েছে। প্রতিটি কর্ণার টাওয়ারের সন্নিকটে একটি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে প্যানেল অলংকরণ করা হয়। এই প্যানেল অলংকরণের অনেকটাই পরিবর্তিত হয়ে গেছে ষাটদশকে মসজিদের সংস্কার কালে।[১৪৩]

মসজিদের পূর্বদিকে অর্ধগম্বুজের নীচে তিনটি প্রবশে পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের খিলানগুলো আকৃতিতে four centred (চিত্র–৪৬)। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা (projected fronton) হয়েছে। মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর যে শিলালিপি ছিল, এখন তা আর নেই। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের এই প্রবেশ পথ গুলোর দু'পাশের দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকের মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাবের বর্ধিত অংশ (mihrab projection) রয়েছে।

মসজিদের ছাদে মার্লন নক্সা খচিত অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত; মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গম্বুজ গুলোর শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। এই মসজিদে স্বল্প পরিমানে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে। পাথরের ব্যবহার প্রধানতঃ লক্ষ্য করা যায় মসজিদের চৌকাঠে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি অলংকরন বর্জিত সাদামাটা ধরণের (চিত্র–৪৭)। মসজিদ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে

Dhaka University Institutional Repository

বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। প্রায় অষ্টভূজি (semi octagonal) আকৃতির প্রধান মিহরাবটি প্রশস্ত। মসজিদের তেমন কোন সম্প্রসারণ হয়নি। মসজিদের পূর্ব দিকে প্লাটফর্ম উন্মুক্ত রয়েছে, কেবল উত্তর দিকে একটি ছোট ঘর করা হয়েছে মুয়াজ্জিনের থাকার জন্য। মসজিদের প্লাটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির বেশ কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। কক্ষগুলো প্লাটফর্মের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে বিন্যাস্ত হয়েছে। এই কক্ষগুলো অপরিসর এবং ছাদ বেশ নীচু। এসব ঘরে লোকজন বসবাস করছে।

খাজা শাহ্বাজ মসজিদের সাথে মুসা খানের মসজিদের একটি সাধারণ সাদৃশ্য রয়েছে। মসজিদের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য যেমন পাথরের ব্যবহার, প্যানেল করা পূর্বাংশ (facade), প্রবেশ দ্বারের অলংকরণ, মার্লন নক্সা খচিত প্যারাপেট, কর্ণার টাওয়ার এবং এর সংলগ্ন সরু মিনার এ সবই খাজা শাহ্বাজ মসজিদের অনুরূপ। ফলে এ বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, এদু'টি মসজিদের নির্মাণ কালের মধ্যে খুব একটা ব্যবধান নেই।[১৪৪] দু'টি মসজিদের মধ্যে যেটুকু পার্থক্য রয়েছে তা হচ্ছে, মুসা খানের মসজিদটি উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খাজা শাহ্বাজ মসজিদটি তেমন নয়। অন্যদিকে খাজা শাহ্বাজ মসজিদের অভ্যন্তরভাগে চমৎকার বহুভাজ করা ল্যাটারাল আর্চ রয়েছে, কিন্তু মুসা খানের মসজিদে ল্যাটারাল আর্চে তেমন কারুকাজ নেই।[১৪৫]

তবে খাজা শাহ্বাজ মসজিদের সাথে মুসা খানের মসজিদের কিছুটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও বলা যায় শাহ্বাজ মসজিদে মুঘল স্থাপত্যের যে উৎকর্ষরূপ লক্ষ্য করা গেছে এই মসজিদে তার পরিচয় নেই। বস্তুতঃ মুসা খানের মসজিদটি অনেকটা খাজা শাহ্বাজ মসজিদেরই একটি অনুকরণ। ফলে, মসজিদটির মধ্যে এক ধরনের বৈচিত্রহীনতা ও পশ্চাদপদতা প্রছন্ন ভাবে লক্ষ্য করা যায়।[১৪৬]

১৯৭৩ সন থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মসজিদটির পরিচালনার দায়িত্বে আছেন।[১৪৭] মসজিদটি বর্তমানে অযত্নের শিকার। মসজিদের আঙ্গিনায় বড় বড় ঘাস গজিয়েছে। প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর অবস্থা ভালো নয়। কোন কোন কক্ষের দেয়ালের পলেস্তরা খসে ইট বেরিয়ে পড়েছে। এসব কক্ষের আশু সংস্কার প্রয়োজন। মসজিদের আশে পাশে বিভিন্ন ইমারত থাকায় রাস্তা থেকে মসজিদটি তেমন চোখে পড়ে না। ঢাকার মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে মুসা খানের মসজিদের স্থাপত্যিক গুরুত্ব কম হলেও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কোন অংশে কম নয়। বিশেষ করে বাংলার স্বাধীন ভূস্বামী ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের নাম এই মসজিদের সাথে জড়িত, এজন্য মসজিদটির যথোপযুক্ত সংরক্ষণ প্রয়োজন। মসজিদের আঙ্গিনার উত্তর পূর্ব কোনে মুসা খানের কবর রয়েছে। একই আঙ্গিনার উত্তর পশ্চিম দিকে ডঃ মুহাম্মদ শহীদউল্লাহ্র কবর রয়েছে।

১৯. সাত গম্বুজ মসজিদ, ১৬৮০ ঃ

আল্লাকুরি মসজিদ থেকে উত্তরে প্রায় ৫০ গজ দূরত্বে বিখ্যাত সাত গম্বুজ মসজিদ অবস্থিত। এই স্থানটি জাফরাবাদ নামে পরিচিত। মুঘল আমলে জাফরাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য কেন্দ্র ছিল।[১৪৮]

পূর্বে বুড়ি গঙ্গা নদীর একটি শাখা মসজিদটির একেবারে পাশ ঘেসে প্রবাহিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে তা মসজিদ থেকে প্রায় মাইল খানেক দূরে সরে গেছে। বর্তমানে বুড়ি গঙ্গা নদীর এই শাখাটি একটি সংকীর্ণ খালের রূপ নিয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ঢাকার মুঘল স্থাপত্য নিদর্শন সমূহের মধ্যে সাতগম্বুজ মসজিদটি একটি অনন্য স্থাপত্য কর্ম (চিত্র-৪৯)। মসজিদটি নদীতীর থেকে প্রায় ৯ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট একটি পাকা ভিত্তির ওপর নির্মিত হয়।[১৪৯]

Dhaka University Institutional Repository

পাকা ও প্রশস্ত চত্বরের পশ্চিম দিকে প্রতিষ্ঠিত মসজিদটি অদৌ সাতগম্বুজ বিশিষ্ট নয়, মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল রীতির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদের চারকোনার কর্ণার টাওয়ারের ওপর গম্বুজ থাকার কারণেই এ মসজিদটি দৃশ্যতঃ সাত গম্বুজ বিশিষ্ট বলে মনে হয় (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২১)।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে মসজিদের সংস্কার করা হয়েছে মোটামুটি ভাবে মূল পরিকল্পনা অনুসরণ করেই। স্যার চার্লস ড'য়লীর গ্রন্থ থেকে (১৯২৮–৩০ সালে প্রকাশিত) মসজিদের আদি রূপ সম্পর্কে খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। তার বর্ণনায় একদিকে যেমন মসজিদের চমৎকার স্থাপত্য শৈলীর প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে, অন্যদিকে মসজিদের সে সময়কার ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থার চিত্রটিও ফুটে উঠেছে (চিত্র–৫০)। তিনি লিখেছেন, মসজিদটি সরাসরি নদীর তীর ধরে উঠে গেছে ফলে দৃশ্যতঃ তা চমৎকার দেখায়। সেসময় মসজিদের গম্বুজ ও খিলান গুলো প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত অবস্থায় চলে আসে। তথাপি, মসজিদের প্রধান স্থাপত্যিক বৈশিষ্টাবলী নির্মাতার দক্ষতা ও রুচিবোধের পরিচয় বহন করে। মসজিদের নির্মাণ উপকরণ প্রধানত ইট।

তিনি লিখেছেন, ভেনিসের কিছু ভবন যেমন আদ্রিয়াতিক সাগরের তীর ভূমি অলংকৃত করেছে, সাত গম্বুজ মসজিদটিও অনুরূপ ভাবে নদীর অব্যবহিত তীর ভূমি থেকেই রাজকীয় মহিমায় উত্থিত হয়ে একটি অনির্বচনীয় আলেখ্যের সৃষ্টি করেছে।[১৫০]

মসজিদের নির্মাণ পদ্ধতি ও তার অতীব জীর্ণদশা অবলোকন করে তিনি ধারণা করেছেন যে, "বাংলাদেশের মুসলিম স্থাপত্যের প্রাচীনতম নিদর্শনগুলোর মধ্যে এটি অন্যতম। মসজিদের অষ্টকৌনিক, বৃত্তাকার ও আয়তাকার বিভিন্ন অংশ বৈপরিত্যের বিশিষ্টতায় নির্মাতার প্রভূত সুরুচির পরিচায়ক। মসজিদের পলেস্তরার আদি হালকা বর্ণের অনেকটা তখনো বোঝা যেতো। কালের প্রবাহ ও চারপাশের ঝোপঝাড়, বর্ষার বারিধারা ও সূর্যালোক কেবল যে মসজিদের বর্ণ বৈচিত্র বাড়িয়েছে তা নয়, উপরন্ত বর্ণের ঔজ্বল্যে কমনীয়তা এনে দিয়েছে। এর ফলে সবকিছু মিলিয়ে ধর্মীয় আবহের একটি অতি শান্ত পবিত্র পরিবেশ রচিত হয়েছে। কবির দৃষ্টিতে দেখলে মনে হবে বুড়াগঙ্গাও যেন তার পাশ দিয়ে সচেতন গর্বে প্রবাহিত হতে গিয়ে তার গতি মন্থর করে দিয়েছে এবং তার তীরদেশও ভারতীয় শিল্পকলাকে সম্মানিত করেছে যে স্থাপত্য, সেই স্থাপত্যের প্রতিবিম্ব নিজবক্ষে ধারণ করে আছে।"[১৫১]

অপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ের লেখক রহমান আলী তায়েসের গ্রন্থ (১৯১০ খ্রীঃ) থেকেও মসজিদের ক্ষতিগ্রস্থ অবস্থা ও পরিবর্তিকালে এর সংস্কারের কথা জানা যায়। তায়েস লিখেছেন, কয়েক বছর আগে ঢাকার নবাব স্যার আহসান উল্লাহ্ বাহাদূর এ মসজিদ নতুন করে মেরামত করেছেন। ফলে মসজিদটি আবাদ হয়ে উঠে এবং পাঁচ বেলা অযান ও নামাজ আরম্ভ হয়।[১৫২] তাঁর লেখনী থেকে এবিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, মসজিদের অবস্থা এতটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, মসজিদটি একরকম পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে।

বর্তমানে মসজিদটি প্রত্যক্ষ করলে দেখা যাবে যে, আয়তাকার মসজিদটি পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ৫৮ ফুট এবং প্রস্থে ২৭ ফুট।[১৫৩] মসজিদের দেয়ালগুলো প্রায় ৪ ফুট চওড়া।[১৫৪] মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজাকৃতির ফাকা কর্ণারটাওয়ার রয়েছে। এই কর্ণারটাওয়ারগুলোর ব্যাস ১২ ফুট এবং কর্ণার টাওয়ারগুলোর প্রতিটি স্তরেই খিলান আকৃতির প্যানেল ও দরজা করা হয়েছে।[১৫৫] কর্ণারটাওয়ারের সর্বনিম্নস্থরে লক্ষ্য করা যায় যে, ৮টি পাশের চারটি উম্মুক্ত এবং বাকী চারটিতে প্যানেল করা। অনুরূপভাবে উপরের স্তরেও চারটি দিকে খিলান আকৃতির দরজা করা হয়েছে এবং বাকী চারটি দিকে খিলান আকৃতির প্যানেলের মাঝে ছোট জানালার মত করা হয়েছে। উপরের স্তরের সবগুলো খিলান ও প্যানেলে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ (multicuspcd) করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

কর্ণার টাওয়ার গুলোর দু'টি স্তরের মধ্যবর্তী স্থানে সম্মুখে বর্ধিত করা cave রয়েছে এবং এর ওপর মার্লন অলংকরণ করার ফলে দু'টি স্তরের বিভাজন আরো স্পষ্ট হয়েছে। কর্ণারটাওয়ারগুলোর প্যারাপেটের নীচে অনুরূপ cave রয়েছে এবং তার ওপর গম্বুজ বসানো। উল্লেখ্য যে, সাত গম্বুজ মসজিদে যেরূপ ফাকা কর্ণার টাওয়ার রয়েছে, ঢাকার অপর কোন মসজিদে সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না (চিত্র–৫১)। এই বিশেষ রীতিতে নির্মিত কর্নারটাওয়ারগুলো যেমন একদিকে স্থাপত্যকে দৃঢ়বদ্ধ করেছে অন্যদিকে তা মসজিদটিকে ঢাকার অপরাপর মুঘল স্থাপত্য থেকে স্বতন্ত্র রূপ দান করেছে।

মসজিদের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী অংশটি সম্মুখ দিকে খানিকটা বর্ধিত করা হয়েছে (projected fronton)। এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত করা হয়েছে। প্যারাপেটের ওপর টারেট গুলোর শীর্ষদেশ পিনাকেলে রূপ নিয়েছে। পূর্বদিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে, এই খিলানগুলো আকৃতিতে four centred এবং খিলানের বাইরের দিকে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। প্রবেশ পথের তিনটি খিলানই এক একটি অর্ধ গম্বুজের নীচে প্রতিষ্ঠিত। মধ্যবর্তী প্রবেশ দ্বারের উপরে যে শিলালিপি ছিল এখন তা আর নেই। জনশ্রুতি রয়েছে যে মসজিদটি নবাব শায়েস্তা খান নির্মাণ করেন। বস্তুতঃ মসজিদটিতে যে চমৎকার স্থাপত্যশৈলী উদ্ভাসিত হয়েছে তা লক্ষ্য করে বলা যায় মসজিদটি ১৬৮০ সালের দিকেই নির্মিত হয়েছিল।[১৫৬] অর্থাৎ এটি শায়েস্তা খানি স্থাপত্যরীতির একটি মসজিদ। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে সারিবদ্ধ ভাবে আয়তাকার প্যানেল করা হয়েছে এবং তার ভেতর কুলুঙ্গি করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যবর্তী স্থান পূর্বদিকের অনুরূপ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে দু'টি খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের বর্ধিত অংশের দু'পাশে একটি করে টারেট সংযুক্ত রয়েছে এবং টারেটের উপরিভাগে পিনাকেল রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে মধ্যবর্তী স্থানে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে, মিহরাবের বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত হয়েছে। প্যারাপেটের উপর টারেটের স্থানে দু'টি পিনাকেল রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে দু'ধরণের প্যানেল বিন্যস্ত হয়েছে। উপরিভাগে আয়তাকার প্যানেল এবং নীম্নভাগে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি উন্নত নির্মাণ শৈলীর ধারনা দেয়। গম্বুজগুলো বসানো হয়েছে পেনডেনটিভ পদ্ধতিতে। মসজিদ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। লালবাগ দূর্গ মসজিদে যেমন মধ্যবর্তী গম্বুজকে প্রধান করে পার্শ্ববর্তী গম্বুজগুলোর আকৃতি হ্রাস করার ক্ষেত্রে phase of transition এ অর্ধগম্বুজ ব্যবহৃত হয়, এই মসজিদেও অনুরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়।

পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। তিনটি মিহরাবের খিলানে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। অভ্যন্তরভাগের পূর্ব দিকে প্রবেশ দ্বার গুলোর মধ্যবর্তী দেয়ালে কুলুঙ্গি করা রয়েছে।

মসজিদের মেঝে এবং অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার গুলোর অভ্যন্তর ভাগের মেঝেতে অধুনা মোজাইক করা হয়েছে।

মসজিদের সম্মুখে আপেক্ষাকৃত পরবর্তী সময়ে একটি প্রবেশ দ্বার (gate) নির্মাণ করা হয়। এই প্রবেশ দ্বারটি নির্মাণ করা হয় অনেকটা মসজিদের মধ্যবর্তী অংশের সাথে সাদৃশ্য রেখে। প্রবেশ দ্বারের নির্মাণ শৈলীর প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আয়তাকার ফ্রেমের ভেতর অর্ধগম্বুজের নীচে একটি প্রবেশ পথ নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

অর্ধগম্বুজের বাইরের দিকে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে।এবং উপরিভাগে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। প্রবেশ দ্বারের দু'প্রান্তে অনেকগুলো ধাপ যুক্ত সিড়ির মত আকৃতি দেয়া হয়েছে।

মসজিদের চারপাশ দেয়াল দিয়ে ঘেরা এবং পূর্বদিকে রয়েছে ঘাসের চত্বর। এদিকেই কয়েকজন ব্যক্তির কবর রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে শায়েস্থাখানি স্থাপত্য রীতির চরম উৎকর্ষের পরিচায়ক এই মসজিদটি। এখানে প্রতিটি স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় এতটা সুসামঞ্জস্যপূর্ণভাবে হয়েছে যেমনটি ঢাকায় অপর কোন মুঘল মসজিদে লক্ষ্য করা যায় না।

সামগ্রিক বিচারে বলা যায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকায় মসজিদটির সুষ্ঠ সংরক্ষণ হচ্ছে। অধুনা মসজিদের ঠিক পেছনেই উত্তর পশ্চিম দিকে একটি বহুতল বিশিষ্ট মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয়েছে।

২০. আল্লাকুরী মসজিদ, ১৬৮০ ঃ

পূর্বে কাটাসুর গ্রাম নামে পরিচিত বর্তমানের মুহাম্মদপুর এলাকায় বর্গাকৃতির একগম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটির অবস্থান। ঢাকায় মুঘল স্থাপত্যের অধিকাংশ মসজিদই আয়তাকার তিনগম্বুজ বিশিষ্ট। এদের মধ্যে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সংখ্যা কম হলেও এর গুরুত্ব কোন অংশেই কম নয়। এই রীতির মসজিদটিকে কিয়স্ক মসজিদ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।[১৫৭] কিয়স্ক মসজিদ বলতে বোঝায় বর্গাকৃতির কাঠামোর ওপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত, মোটামুটি ভাবে এই রীতির মসজিদ সমগ্র মুসলিম বিশ্বে সকল যুগেই জনপ্রিয় ছিল। রাজকীয় বা ব্যক্তিগত উভয় উদ্যোগ্যেই এ রীতির মসজিদ নির্মিত হয়েছে।[১৫৮] বাংলাদেশে সুলতানী যুগে এ রীতির মসজিদ জনপ্রিয় ছিল। সুলতানী যুগে ঢাকার প্রাচীনতম মসজিদ বিনত বিবির মসজিদের কথা প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়। এ ছাড়া ঢাকার সুলতানী যুগের অপর দু'টি মসজিদ নসওয়ালা গলির মসজিদ (১৪৫৮) ও মিরপুর মাজার মসজিদ (১৪৮০) অনেকটা একই রীতির মসজিদ। মুঘল যুগে ঢাকা ও বাংলাদেশের অন্যত্র এ রীতির মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। ঢাকার বাইরে মুঘল যুগে এ রীতির মসজিদের প্রাথমিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বগুড়ার শেরপুরের বিবির মসজিদের (১৬২৮) নাম উল্লেখ করা যায়।[১৫৯] ঢাকায় এ রীতির উল্লেখযোগ্য মসজিদ হিসেবে আল্লাকুরী মসজিদকে চিহ্নিত করা যায়। মসজিদটি পরিকল্পনার দিক থেকে সুলতানী যুগের এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ থেকে প্রভাবিত হলেও মসজিদের সামনের বহির্ভাগ (elevation) বা অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে মসজিদটিতে যে মুঘল স্থাপত্যেরই প্রভাব পড়েছে বেশী তা নিঃসন্দেহে বলা যায় (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২২)। মসজিদটির পরিমাপ প্রতিদিকে ১২$\frac{১}{২}$ফুট।[১৬০]

আল্লাকুরী মসজিদের চারকোনায় রয়েছে চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার। এই কর্নার টাওয়ার গুলো কয়েকটি স্তরে বিন্যস্ত। কর্নার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে প্লাস্টার করা কিয়স্ক রয়েছে (চিত্র–৫৩)। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা । এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট দিয়ে বর্ডার করা হয়েছে এবং বর্ধিত অংশের মধ্যে একটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। প্রবেশ দ্বারের খিলানটি আকৃতিতে four centred ।খিলানে বহু ভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। পূর্ব দিকের দেয়ালে প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশটিও সামনের দিকে বর্ধিত করা এবং এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে পূর্ব দিকের অনুরূপ দু'টি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের বাইরের দিকে মধ্যবর্তীস্থানে মিহরাবের বর্ধিত অংশ (mihrab projection) রয়েছে এবং

Dhaka University Institutional Repository

মিহরাবের এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আল্লাকুরী মসজিদের সৌন্দর্য বহুগুন বৃদ্ধি পেয়েছে মসজিদের প্রতিদিকের বর্ধিত অংশের দু'পাশে টারেট সংযুক্তির ফলে। মসজিদের পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি ছিল। জনশ্রুতি রয়েছে যে, বিগত শতাব্দীতে ভাওয়ালের রাজা এই শিলালিপিটি খুলে নেন।[১৬১] মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে ও গম্বুজের অষ্টভূজি ড্রামে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। ড্রামের ওপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। গম্বুজ শীর্ষের পাদদেশে পদ্মপাপড়ির নক্সা এবং তার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের দেয়াল বেশ চওড়া এবং দেয়ালের এই ঘনত্বের কারণে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ গ্রীষ্ম কালেও বেশ ঠান্ডা থাকে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি বেশ আকর্ষনীয়। পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থলে প্রায় অষ্টভূজি আকৃতির (semi octagonal) মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের বাইরের দিকে আয়তাকার ফ্রেম করা হয়েছে। প্রধান মিহরাবের দু'পাশে একটি করে ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব (subsidiary mihrabs) রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশের দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল এবং তার মধ্যে কুলুঙ্গি (niches) করা হয়েছে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, প্রধান মিহরাবের বাইরের দিকে যেমন ফ্রেম করা হয়েছে অনুরূপ ফ্রেম অভ্যন্তর ভাগের তিন দিকের প্রবেশ দ্বারেও করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে গম্বুজ বসানো হয়েছে স্কুইঞ্চ পদ্ধতিতে। গম্বুজের আবরণের নীম্নাংশে ও শীর্ষে ফুল পাতার নক্সা করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের অলংকরণের এই সুসামঞ্জস্যতা মসজিদটিকে অনন্যরূপ দান করেছে।

মসজিদটির সামগ্রিক বিচারে বলা যায় যে, পরিকল্পনার দিক থেকে সুলতানী যুগের বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের সাথে এর সাদৃশ্য থাকলেও মসজিদের অপরাপর বৈশিষ্ট্য মসজিদটিকে মুঘল যুগের একটি স্থাপত্য কর্ম হিসেবে অধিক উদ্ভাসিত করেছে। মসজিদের শিলালিপি বিলুপ্ত হলেও এর স্থাপত্যরীতি বিচার করে বলা যায় যে, মসজিদটি শায়েস্তাখানি স্থাপত্যরীতির একটি মসজিদ। আল্লাকুরী মসজিদের পার্শ্ববর্তী আরো কিছু ইমারত রয়েছে যেগুলো শায়েস্তাখানের সুবাদারীর আমলে নির্মিত হয়েছে (সাত গম্বুজ মসজিদ, একটি অষ্টভূজি সমাধি) বলে ধারনা করা যায়। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, মসজিদটি শায়েস্তাখান নির্মাণ করেন।[১৬২]

আল্লাকুরী মসজিদে সাম্প্রতিক কালে সম্প্রসারণ করা হয়েছে মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিন দিকে। তবে আমাদের সৌভাগ্য এই যে, মূল মসজিদের কোন রকম ক্ষতি না করেই এই সম্প্রসারণ করা হয়। সম্প্রসারিত অংশের ওপর টিনের চাল দেয়া হয়েছে। মসজিদের এইরূপ সম্প্রসারণের ফলে বাইরে থেকে সম্পূর্ন মসজিদ দৃষ্টিগোচর হয় না, কেবল মসজিদের উপরিভাগ দেখা যায়। অধুনা সমগ্র মসজিদে প্লাষ্টারের উপর বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র মসজিদের বহিরাবরনে সাদা রঙ দেয়া হয়েছে। প্রতি দিকের সংযুক্ত টারেট গুলোতে লাল রঙ দেয়া হয়েছে এবং প্যারাপেটের মার্লন অলংকরনে নীল ও সবুজ রঙ ব্যবহার করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগেও বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করে একটা জমকালো ভাব আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে।

মসজিদের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে সম্প্রসারণ করার ফলে মসজিদটি খানিকটা আড়াল পড়ে গেলেও মূল মসজিদের কাঠামো অক্ষুন্ন রয়েছে। অথচ, ঢাকার অনেক পুরানো মসজিদেই লক্ষ্য করা গেছে যে, সম্প্রসারণ কালে মূল মসজিদের দেয়াল ভেঙে মসজিদ কক্ষটিকে বড় করা হয়েছে। যেমন বিনত বিবির মসজিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙে সম্প্রসারণ করা হয়। আল্লাকুরী মসজিদের ক্ষেত্রেও তেমন ঘটতে পারতো। কিভাবে মসজিদটি রক্ষা পেলো তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, স্থানীয় জনগন পুরাকীর্তি রক্ষার প্রতি যতটা যত্নশীল ছিলেন, তার চেয়ে অধিক যত্নশীল ছিলেন তাদের ধর্মীয়

Dhaka University Institutional Repository

আবেগ অনুভূতির প্রতি। অর্থাৎ মসজিদের কোন ক্ষতি করলে অন্যায় হবে এধরণের একটি ধারনা থেকেই মসজিদটির কোন ক্ষতি সাধন করা হয়নি।

মসজিদটির আদিরূপ সম্পর্কে অনুসন্ধান করলে জনৈক বয়োজ্যেষ্ঠ এলাকাবাসী মাহতাব সাহেব বলেন, কাটাসুর গ্রামে অবস্থিত এই মসজিদ এলাকাটি এখন জনবহুল হলেও প্রায় ৩০/৩৫ বছর পূর্বে তা জনবিরল ও জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি সম্ভবতঃ একটি সমাধি সৌধ এমন ধারনা অনেকের মধ্যে ছিল। ফলে, আল্লাকুরী মসজিদে বেশী কেউ নামাজ পড়তে আসতেন না। নিকটবর্তী সাত গম্বুজ মসজিদের গুরুত্বই ছিল বেশী।

মসজিদের চার পাশে অনেক দোকান পাট থাকায় এলাকাটি ঘন বসতি পূর্ণ মনে হয়। তবে দোকান পাট গুলো সরিয়ে মসজিদ এলাকাকে উন্মুক্ত করা যায়। এছাড়া মসজিদের পাশ ঘেসে কোন বড় ইমারত নির্মিত হয়নি যেটা ভাঙতে গেলে সমস্যায় পড়তে হবে বা আদৌ বিলুপ্ত করা সম্ভব হবে না। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধিনে এনে যথোপযুক্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। কারণ, আজ হয়তো মসজিদের কোন ক্ষতি করা হয়নি কিন্তু আগামীতে স্থান সংকুলানের নিমিত্তে মসজিদের আদি রূপের যে কোন ক্ষতি সাধন করা হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই।

২১. ভাট মসজিদ, ১৬৮৬ ঃ

ভাট মসজিদের অবস্থান ১২১ নং লালবাগ সড়কে। মুঘল আমলে নির্মিত এই মসজিদের অধুনা ব্যপক সম্প্রসারণ হলেও, আদি মসজিদটি মোটামুটি বোঝা যায়। মসজিদিটি চিরাচরিত মুঘল স্থাপত্য ধারায় নির্মিত। এটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৩)। মসজিদের চার কোনায় যে চারটি অষ্টভূজি কর্নার টাওয়ার ছিল তার মধ্যে এখন পূর্ব দিকের দু'প্রান্তের দু'টি বিলুপ্ত হয়ে গেছে, কেবল পশ্চিম দিকের দু'প্রান্তের দুটি টিকে রয়েছে। কর্নার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে কুপোলা বসানো রয়েছে।

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে প্যানেল করা ছিলো কিনা তা এখন বোঝা যায় না। পূর্ব দিকে four centerd আকৃতি বিশিষ্ট তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মধ্যবর্তী এবং প্রধান প্রদেশদ্বারের দু'পাশে দু'টি সরু টারেট দিয়ে বর্ডার করা হয়েছে।

মসজিদে দু'টি শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপির একটি রয়েছে প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর এবং অপরটি রয়েছে মসজিদের অভ্যন্তরে মিহরাবের ওপর।

প্রধান প্রবেশ পথের ওপর উৎকীর্ন শিলালিপি থেকে জানা যায় মসজিদটি ১০৯৮ হিজরী অথাৎ ১৬৮৮ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত হয়, এর নির্মানকারী জনৈক রুকনুদ্দীন। তিনি শায়েস্তা খানের একজন কর্মচারী ছিলেন।[১৬৩]

মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী গম্বুজটি পাশ্ববর্তী দু'টোর চেয়ে প্রশস্ত তবে আকৃতিতে কিছুটা নীচু (squat)। অন্যদিকে পাশ্ববর্তী দু'টি গম্বুজ উচু ধরণের। মধ্যবর্তী গম্বুজের নীম্নাংশে গোলাকার ব্যান্ডের (band) মত রয়েছে। তিনটি গম্বুজের ড্রামে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি নীচু ও চ্যাপ্টা হওয়াতে সামগ্রিক ভাবে গম্বুজ তিনটির মধ্যে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান। গম্বুজগুলোর শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে প্রধান মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থলে প্রায় অষ্টভূজি (semi octagonal) আকৃতির মিহরাব এবং দু'পাশে দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি অলংকরন বর্জিত সাদাসিধে ধরণের।

মসজিদের সম্প্রসারণ হয়েছে প্রধানত পূর্বদিকে, এদিকে বড় হলঘর তৈরী করা হয়েছে। এখানে বহু লোকের স্থান সংকুলান হয়।

মসজিদের অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে এর মূল বৈশিষ্ট্যের কিছু বিষয় ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। যেমন, পূর্বদিকের দু'প্রান্তের কর্নার টাওয়ার বিলুপ্ত হয়েছে। এছাড়া ছাদের পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দু'টির আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটেছে বলে অনুমান করা যায়। মসজিদ এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ন এবং পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে আদি মসজিদটি তেমন বোঝা যায় না। কেবল মসজিদের পশ্চিম দিকটা এর আদিরূপ কিছুটা এখনও ধরে রেখেছে (চিত্র-৫৫)।

২২. বংশাল জামে মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে) ঃ

বংশালে অবস্থিত এই মসজিদটি একটি সুদৃশ্য মসজিদ। এটি একটি আট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। গম্বুজের সংখ্যাধিক্যের কারনে মসজিদটি বিশেষ আকর্ষনীয়। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। কেবল করতলাব খান মসজিদে (১৭০০-১৭০৪) পাঁচটি গম্বুজ প্রত্যক্ষ করা যায়।

মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৪)। মসজিদটি দু'টি অংশে গঠিত, মূল প্রার্থনা কক্ষ এবং পূর্ব দিকে সংযুক্ত বারান্দা (চিত্র-৫৬)।

মসজিদের চারকোনায় এবং বারান্দার দু'প্রান্তে (উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ-পূর্ব কোনায়) অষ্টভূজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে অর্থাৎ এ মসজিদে ৬টি কর্নার টাওয়ারের সন্নিবেশ ঘটেছে।মসজিদ কক্ষের পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা। পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রবেশ দ্বারের খিলানগুলো আকৃতিতে four centred । পূর্ব দিকের দেয়াল আয়তাকার ও খিলান আকৃতির প্যানেল সমৃদ্ধ। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিন দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশটি পূর্ব দিকের অনুরূপ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা। উল্লেখ্য যে, উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের খিলানগুলো আকৃতিতে অনেকটা flat top arch এর অনুরূপ। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও আয়তাকার প্যানেল করা হয়েছে।মসজিদের পূর্ব দিকে সংযুক্ত বারান্দার সম্মুখে পাঁচটি খিলান রয়েছে। খিলানগুলো আকৃতিতে four centred ও বাইরের দিকে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। বারান্দার সম্মুখে সারিবদ্ধ এই খিলানগুলো দৃশ্যতঃ অনেকটা sereen of arches এর মত দেখায়। বারান্দার প্রতিটি খিলানের দু'পাশে একটি করে সরু অষ্টভূজি টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। তিনটি গম্বুজই অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং মধ্যবর্তী গম্বুজটি প্রশস্ত। মসজিদের পূর্ব দিকে সংযুক্ত বারান্দার ছাদে সমান আকৃতির ৫টি গম্বুজ

Dhaka University Institutional Repository

রয়েছে। এই গম্বুজগুলো অষ্টভূজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত।সর্বমোট আটটি গম্বুজের শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগ দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে' তে বিভক্ত। ল্যাটারাল আর্চে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় (চিত্র–৫৭)। পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে, মধ্যবর্তী মিহরাবটিকে প্রশস্ত করে নির্মাণ করে প্রধান্য দেয়া হয়েছে। প্রধান মিহরাবে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে এবং মিহরাবের ফ্রেমের ওপর মার্লন নক্সা করা হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে মিহরাব ছাড়া কুলুঙ্গি (niches) করা রয়েছে। প্রধান মিহরাব ফ্রেমের ওপর যেরূপ মার্লন অলংকরণ দেখা যায়, অনুরূপ মার্লন অলংকরণ প্রধান প্রবেশ দ্বারের উপরে লক্ষ্য করা যায় অর্থাৎ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের অলংকরণে একটি সামঞ্জস্য রাখার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে। এই মসজিদে প্রধানতঃ বহুভাজযুক্ত অলংকরণের প্রধান্য লক্ষ্য করা যায় এবং বলা যায় যে, কোন রকম মোজাইক বা রঙ ব্যবহার না করে প্লাস্টারের ওপর কেবল বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করেও যে ইমারতে সৌন্দর্য বর্ধন করা যায় তার প্রকৃষ্ট প্রমান এই মসজিদ। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের পেছনের দিকে তিনটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। প্রধান মিহরাবের বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি চওড়া অষ্টভূজি টারেট সংযুক্ত এবং পার্শ্ববর্তী মিহরাবের বর্ধিত অংশ গুলোর দু'পাশে গোলাকার সংকীর্ণ টারেট সংযুক্ত রয়েছে।

মসজিদে কোন শিলালিপি নেই ফলে, এর নির্মাণ তারিখ সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়া যায় না। অনুমান করা যায় মসজিদটি প্রায় তিনশত বছরের পুরানো এবং এর নির্মাতা জনৈক বদরুদ্দীন ওরফে হাজী ভূট্টো।[১৬৪] তবে রীতিগত দিক থেকে বিচার করলে মসজিদটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকের নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। উল্লেখ্য যে, খাজা শাহ্বাজ মসজিদের (১৬৭৯) সাথে এই মসজিদের সাদৃশ্য রয়েছে। যদিও শাহ্বাজ মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট তথাপি, উভয় মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে ল্যাটারাল আর্চে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ এই মসজিদের সাথে খাজা শাহ্বাজ মসজিদের সাদৃশ্য মেলায়।

স্থানীয় এলাকাবাসী জনাব বদরুদ্দীন বলেন, এলাকার লোকজনদের কাছে মসজিদটি ২০০ বছরের পুরাতন একটি মসজিদ হিসেবে পরিচিত।

মূল মসজিদকে অক্ষুন্ন রেখে সাম্প্রতিক কালে মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্ব দিকের বর্ধিত অংশে অনেকগুলো পিলার রয়েছে এবং সম্প্রসারিত সম্পূর্ণ অংশের ওপরে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ। মসজিদের উত্তর দিকে একটি চৌবাচ্চা রয়েছে। মসজিদের মেঝেতে অধুনা মোজাইক করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে রাস্তা থেকে মূল মসজিদটি সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয় না।

২৩. নিমতলী মসজিদ, ১৬৮৫ ঃ

নিমতলীর কিছুটা সংকীর্ণ রাস্তার উত্তর দিকে মসজিদটির অবস্থান (৫ নং নবাব কাটরা)। মসজিদের ছাদে অলংকরণ সমৃদ্ধ দু'টি ছাতা রয়েছে এবং এ দু'টো ছাতার অবস্থিতি থেকেই মসজিদটি বর্তমানে নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার এবং এক গম্বুজ বিশিষ্ট (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৫)। মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার ছিল। এই চারটি কর্ণার টাওয়ারের মধ্যে বর্তমানে

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ব দিকের দু'প্রান্তের দু'টি টিকে রয়েছে। পশ্চিম দিকের কর্ণার টাওয়ারের কেবল উপরিভাগের অস্তিত্ব রয়েছে। ঢাকার অপরাপর মুঘল মসজিদের মত এই মসজিদের কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে পূর্বে প্লাস্টার করা কিয়স্ক ছিল কিনা তা এখন বোঝা যায় না। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে। এই খিলানগুলো আকৃতিতে four centred, পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা। প্রধান প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে দু'টি সংকীর্ণ টারেট ছিল, বর্তমানে টারেট দুটোর উপরিভাগের অস্তিত্ব রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ ছিল, দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথ এখন থাকলেও উত্তর দিকে মসজিদের সম্প্রসারণের ফলে সেই দিকের প্রবেশ পথটি বিলুপ্ত হয়েছে। মসজিদের শিলালিপির অবস্থান দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের উপর। সচরাচর মসজিদে শিলালিপি স্থাপন করা হয় মসজিদের পূর্ব দিকে প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর। বস্তুতঃ এই মসজিদের দক্ষিণ দিকে রাস্তা থাকায় শিলালিপি মসজিদের দক্ষিণ দিকেই স্থাপন করা হয়। উল্লেখ্য যে, আদিনা মসজিদে (১৩৭৪-৭৫) যেমন দেখা গেছে মসজিদের পশ্চিম দিকে সড়ক থাকায় শিলালিপি স্থাপন করা হয় মসজিদের পশ্চিম দিকে। অর্থাৎ রাস্তার গুরুত্বের কারনে শিলালিপি পূর্ব দিকে স্থাপন না করে পশ্চিম দিকে স্থাপন করা হয়।

মসজিদ কমিটির সেক্রেটারী জনাব হাবিবুর রহমানের সাথে সাক্ষাৎ কারের মাধ্যেমে জানা যায় যে মসজিদটি ১০৯৫ হিজরীতে আনুমানিক ১৬৮৩ সালে নির্মিত এবং মসজিদের নির্মাতা শেখ মাহমুদ। মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর একটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত, গম্বুজ শীর্ষে কলস আকৃতির ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের অংশে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দেয়ালগুলো বেশ চওড়া। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মিহরাব রয়েছে। প্রধান মিহরাবটি আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজি (semi octagonal), প্রধান মিহরাবের দু'পাশে দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব রয়েছে। মসজিদ কক্ষের ছাদে একটি গম্বুজ রয়েছে এবং যেহেতু মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার সেহেতু ছাদে গম্বুজের দু'পাশে দুটি অর্ধগম্বুজের মত নির্মান করা হয়েছে। এই মসজিদের অনুরূপ ছাদ নির্মান কৌশল কেন্দ্রিয় কারাগার বাগান বাড়ি মসজিদে (১৭১৪) লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগ অলংকরণ বর্জিত সাদাসিদে ধরণের। গম্বুজের আবরণের নিম্নাংশে প্লাস্টারের ওপর আয়তাকার ও ঘন্টার আকৃতির নক্সা লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখ্য যে, এই ঘন্টা নক্সাটি বাংলার স্থাপত্যে প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোর মধ্যে কেবল এই মসজিদেই ঘন্টা নক্সা লক্ষ্য করা যায়। বস্তুতঃ এই নক্সার মূল নিহিত বাংলার প্রাক মুসলিম যুগের স্থাপত্যে। বাংলার স্থাপত্যের টেরাকোটা অলংকরণে বহুলভাবে শেকল ও ঘন্টা নক্সা (bell motif) ব্যবহৃত হয়েছে।

পরবর্তী কালে মসজিদে চিনি টিকরীর অলংকরণ করা হয়। মসজিদের বহিরাবরণে বিশেষ করে পশ্চিম দেয়ালের পেছনের অংশে, প্যারাপেটে, গম্বুজের ড্রামে এবং গম্বুজের বহিরাবরণে চিনিটিকরীর নক্সা লক্ষ্য করা যায়। এছাড়া মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের মিহরাবে এই অলংকরণ দেখা যায়। নিমতলী মসজিদের বাইরের দিকে যে দু'টি সুদৃশ্য ছাতা রয়েছে সেই ছাতা দু'টির একটি নির্মিত হয় ১৯৬৩ সালে এবং অপরটি ১৯৭৮ সালে। ১৬৫ এ দু'টি ছাতার গায়েও চিনিটিকরীর অলংকরণ করা হয়েছে।

মসজিদটির ব্যপক সম্প্রসারণ ঘটেছে। মসজিদ কক্ষের উত্তর দিকের দেয়াল ভেঙ্গে ঐ দিকে মসজিদ কক্ষ বাড়ানো হয়। সম্প্রসারিত উত্তর দিকের ছাদ সমান্তরাল। মূলতঃ মসজিদ কক্ষটিকে উত্তর দিকের সম্প্রসারণ করতে গিয়েই আদি মসজিদের উত্তর দিকে প্রবেশ দ্বার বিলোপ করতে হয়। সম্প্রসারিত উত্তর দিকের দেয়ালে

Dhaka University Institutional Repository

বর্তমানে এইটি ছোট জানালা এবং পূর্ব দিকে একটি দরজা তৈরী করা হয়। ফলে, দৃশ্যতঃ মসজিদ কক্ষে প্রবেশের জন্য পূর্বদিকে চারটি প্রবেশ দ্বারের সূচনা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত অংশের ওপর দোতলা নির্মাণ করা হয়েছে (চিত্র-৫৯)। মসজিদের পশ্চিম দিকে একটি চৌবাচ্চা রয়েছে। সামগ্রিকভাবে বলা যায়, মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে হওয়ায় আদি মসজিদের মূল বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই এখন আর বোঝা যায় না। এ ছাড়া নিমতলী এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ন এবং মসজিদের আশেপাশে প্রচুর দোকান পাট থাকায় দৃশ্যতঃ বাইরে থেকে সম্পূর্ন মসজিদটি দেখা যায় না। মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই আদি মসজিদের স্বরূপ বোঝা যায়।

২৪. দিলকুশা মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) ঃ

মতিঝিলের ব্যস্ততম এলাকায় অবস্থিত দিলকুশা মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল স্থাপত্য রীতির একটি মসজিদ। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদের অনুরূপ এ মসজিদটিও আকৃতিতে আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ বিশিষ্ট (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৬)। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ এবং বিভিন্ন সুউচ্চ ভবন থাকায় মসজিদের পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথ বাইরে থেকে এখন তেমন সুস্পষ্ট নয়। রাস্তা থেকে মূলতঃ মসজিদের পশ্চিম দিকটি দৃশ্যমান (চিত্র-৬০)।

মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে এবং টাওয়ার গুলোর শীর্ষে প্লাষ্টার করা কুপোলা রয়েছে। মসজিদের দেয়ালগুলো প্রায় ৫ ফুট চওড়া।[১৬৬]

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আদি অবস্থায় প্যানেল করা ছিল কিনা তা এখন বোঝা যায় না। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকের মধ্যবর্তীস্থানে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ প্রতিষ্ঠিত। তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তীটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গম্বুজ শীর্ষে কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি বেশ প্রশস্ত। নামাজ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থানে প্রায় অষ্টভূজি (semi octagonal) আকৃতির একটি মিহরাব রয়েছে। মিহরাবের দু'পাশে তিনটি করে জানালা করা হয়েছে। মিহরাবের প্রতি পাশের তিনটি জানালার মধ্যবর্তী জানালাটি খিলান আকৃতির এবং বাকী দু'টি বর্গাকৃতির। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে এরূপ একাধিক জানালার সন্নিবেশ ঢাকার অপর কোন মুঘল মসজিদে লক্ষ্য করা যায়নি, কেবল আরমানিটোলা মসজিদের (১৭৩৫) পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের দু'পাশে একটি করে বর্গাকৃতির জানালা লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাব ও জানালাগুলোর উপরিভাগে একই সমান্তরালে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে খিলান আকৃতিতে প্যানেল করা হয়েছে, বর্তমানে এতে তাক বসানো হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে আর কোন অলংকরণ নেই।

মসজিদের বর্তমান মুয়াজ্জিন জনাব ফেকু মিয়ার সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে জানা যায় যে, এই মসজিদটি বাদশাহ্ আলমগীরের (আওরঙ্গজেব) আমলে নির্মিত এবং বিবি মরিয়মের নামে উৎসর্গীকৃত। প্রকৃতপক্ষে

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের নির্মাণ শৈলী প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করা যায় এটি শায়েস্তা খানি স্থাপত্যরীতির একটি মসজিদ। মসজিদটি মূলতঃ নবাব সলিমউল্লাহ্‌র ওয়াকফ স্টেটের অধীন। মসজিদ প্রাঙ্গনে নবাব পরিবারের অনেক ব্যক্তির করব রয়েছে। আদি মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে এবং সম্প্রসারিত পূর্বাংশের ওপর দোতলা করা হয়েছে। দোতলায় প্রশস্ত নামাজ কক্ষ রয়েছে। মসজিদের দোতলা নির্মাণ করা হয় ষাটের দশকে বর্তমান 'রাজউক' (পূর্বতন D.I.T) ভবন নির্মাণ কালে।[১৬৭]

মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ করা হয় ১৯৮৬ সালে, রাজউক এর তত্ত্বাবধানে।[১৬৮] এ সময় মসজিদের চারপাশের আঙ্গিনার সৌন্দর্য বর্ধনের লক্ষ্যে বাগান ও ফোয়ারা নির্মাণ করা হয়। সমগ্র মসজিদ জুড়ে বিশেষ পদ্ধতিতে প্লাস্টার (Bontile) করা হয়েছে। মসজিদের মিহরাবে মার্বেল (merble tiles) বসানো হয়েছে, ছাদে ঝাড়বাতি লাগানো হয়েছে এবং দরজা জানালায় কাঁচের পাল্লা দেয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, দরজা-জানালায় কাঁচের পাল্লা লাগানোর ফলে মসজিদ কক্ষে একটি গুমোট ভাব বিরাজ করে।

মসজিদের সম্প্রসারণ হয়েছে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিত ভাবে। পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে আদি মসজিদের সম্মুখদিক তেমন বোঝা যায় না। এই মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালে একাধিক জানালার অবস্থানের বিষয়টি বিস্ময়কর। এই জানালাগুলো পরবর্তি কোন সময় নির্মাণ করা হতে পারে। বিশেষ করে মিহরাবের দু'পাশে তিনটি জানালার মধ্যবর্তী জানালাটি খিলান আকৃতির হওয়াতে ঐটি পূর্বে প্রধান মিহরাবের পাশ্ববর্তী অতিরিক্ত মিহরাব (subsediary mihrabs) ছিল বলে অনুমান করা যেতে পারে।

২৫. খান মুহাম্মদ মির্ধা মসজিদ, ১৭০৪ ঃ

খান মুহাম্মদ মির্ধা মসজিদের অবস্থান লালবাগ দূর্গের কিছুটা পশ্চিমে আতিশ খানা মহল্লায়। মসজিদের প্রধান প্রবেশ পথের ওপর উৎকীর্ণ শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১১১৬ হিজরীতে অর্থাৎ ১৭০৪ সালে কাজী ইবাদ উল্লাহ্‌র নির্দেশে খান মুহাম্মদ মির্ধা নির্মাণ করেন।[১৬৯]

ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির বঙ্গানুবাদ এরূপ – "সাহসী ও ন্যায় বিচারক সম্রাটের আমলে এ মসজিদ নির্মাণ করা হয়। তিনি ধর্মীয় বিধি ও ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ন্যায় বিচার করে থাকেন। সেই সম্রাট খুবই সৌভাগ্যবান যিনি আওরঙ্গজেব নাম ধারণ করেন এবং ঐ চাঁদ খুবই চমৎকার সূর্য্য যার অধিনতা পাশে আবদ্ধ থাকে। শরীয়তের সহায়ক, সত্যনিষ্ঠ ও হৃদয়বান কাজী ইবাদুল্লাহ্‌ নির্দেশ দেন যেন খান মুহাম্মদ আন্তরিকতার সাথে ইবাদতের জন্য মসজিদ নির্মাণ করেন। এ মসজিদের প্রতিষ্ঠার তারিখ সম্বন্ধে চিন্তা করলে অদৃশ্য থেকে এক ঘোষক জানালেন যে তার ভিত্তির দরুন কুফরীর মাথা ভূলুণ্ঠিত হয়েছে। তার (তা'য়াত খানা) থেকে তারিখের উদ্ভব হয়। ১১১৬ হিজরী।[১৭০]

মসজিদটি যার নির্দেশে নির্মিত হয় অর্থাৎ ইবাদ উল্লাহ্‌ ছিলেন শহরের প্রধান কাজী। তার সম্পর্কে শিলালিপিতে বলা হয়েছে তিনি ছিলেন শরীয়তের সহায়ক (defender of law)। তবে মসজিদের নির্মাতা খান মুহাম্মদ মির্ধা সম্পর্কে তেমন কিছু জানা যায় না। তার মির্ধা খেতাব থেকে এতটুকু উপলব্ধি করা যায় যে, তিনি একজন সরকারী কর্মচারী ছিলেন।[১৭১]

মির্ধা মসজিদের চারপাশ ঘিরে দেয়ালের বেষ্টনী রয়েছে। এই বেষ্টনীর অভ্যন্তরে এক তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে রয়েছে মসজিদ এবং অবশিষ্ট স্থানে ঘাসের চত্বর (চিত্র-৬২)। বেষ্টনীর দক্ষিণ দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে

Dhaka University Institutional Repository

একটি প্রবশে পথ এবং দেয়ালের গায়ে এলকভ করা রয়েছে। এই প্রবেশ দ্বার ও বেষ্টনীর দেয়াল পরবর্তী সময়ের সংযোজন।

মির্ধা মসজিদটি প্রকৃতপক্ষে একটি দ্বিতল মসজিদ, অর্থাৎ একটি উচু প্লাটফর্মের ওপর মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্লাটফর্মের নীচে রয়েছে ভল্ট আকৃতির সারিবদ্ধ কক্ষ (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৭ ২৮)। প্লাটফর্মটি উচ্চতায় ১৬ ফুট এবং দৈর্ঘ্যে ১২৫ ফুট ও প্রস্থে ১০০ ফুট।[১৭২] আওলাদ হাসান বলেছেন, এই প্লাটফর্মটি ছিল শহরের সবচেয়ে উচু ও বৃহৎ চত্বর।[১৭৩] অর্থাৎ ১৯০৪ সালে মির্ধা মসজিদ অপেক্ষা উচু কোন ইমারত ঢাকায় ছিলো না। এ ধরনের উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ প্রাক মুঘল যুগে দিল্লীর স্থাপত্যে লক্ষ্য করা যায়, বিশেষ করে ফিরুজ তুঘলকের সময়কার স্থাপত্যে এ রীতির মসজিদ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন, খিড়কী মসজিদ (১৩৭৫) ও কালান মসজিদ (১৩৭৫)। তুঘলক স্থাপত্য থেকে বাংলার স্থাপত্যে এই ধারণা এসেছে বলে অনুমান করা হয়।[১৭৪]

মসজিদ চত্বরে প্রবেশের জন্য প্লাটফর্মের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী স্থানে ২৫টি ধাপের সিড়ি রয়েছে, সিড়িগুলো আংশিক পাথরের তৈরী। সিড়ির ওপর প্লাটফর্মে প্রবেশ মুখে একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। সিড়ির দু'পাশে প্লাটফর্মের পূর্ব দিকের দেয়ালে প্রায় অষ্টভূজি আকৃতির দু'টি টাওয়ার রয়েছে।

উচু প্লাটফর্মের ওপরের চত্বরটি বেশ প্রশস্ত হলেও মূল মসজিদটি আকৃতিতে ক্ষুদ্র (চিত্র–৬৩)। চত্বরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার। পরিমাপে মসজিদটি দৈর্ঘ্যে ৪৮ ফুট ও প্রস্থে ২৪ ফুট।[১৭৫] মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে। কর্ণার টাওয়ার গুলোর গায়ে সমানদূরত্বে কতগুলো ব্যান্ডের মত করা রয়েছে এবং শীর্ষদেশে প্লাস্টার করা কিয়স্ক বিদ্যমান (চিত্র–৬৪)। এই কিয়স্কগুলো অত্যন্ত সুদৃশ্য। কর্ণার টাওয়ারের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি যেমন একদিকে মসজিদকে দৃঢ়বদ্ধ করেছে অন্যদিকে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে বহুগুণ।

মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের সম্মুখ ভাগ আয়তাকার প্যানেল সমৃদ্ধ। অনুরূপ প্যানেল মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালেও লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পূর্ব দিকে অর্ধগম্বুজের (half dome) নীচে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। এই খিলানগুলো আকৃতিতে four centred এবং অলংকরণে বহুভাজযুক্ত মসজিদের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা রয়েছে। প্রধান প্রবেশ পথটি পাশ্ববর্তী গুলোর অপেক্ষা প্রশস্ত। প্রধান প্রবেশ পথের ওপরই শিলালিপির অবস্থান। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। লক্ষ্যনীয় যে, মসজিদের সবক'টি প্রবেশ পথের দু'পাশে দু'টি করে সরুটারেট সংযুক্ত রয়েছে এবং এই টারেটগুলো প্যারাপেটের ওপর পিনাকেলে রূপ নিয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছন দিকে তিনটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে, প্রতিটি বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি করে সরু টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন নক্সা করা এবং ছাদে মার্লন নক্সা খচিত অষ্টভুজি ড্রামের ওপর তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি প্রশস্ততর। গম্বুজ গুলোর চূড়ায় পদ্ম পাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মসজিদ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত। প্রতিটি বে'তেই বহুভাজযুক্ত অলংকরণ সমৃদ্ধ মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রধান। মসজিদ কক্ষের অভ্যন্তরে তেমন অলংকরণ নেই বললেই চলে। মসজিদটি যে প্লাটফর্মে প্রতিষ্ঠিত তার উত্তর পশ্চিম কোনে একটি মাদ্রাসা রয়েছে। এটি 'হুজরা' নামে পরিচিত। এই মাদ্রাসাটি মূলতঃ দুটি কক্ষের সমন্বয়ে

Dhaka University Institutional Repository

একটি ভল্ট আকৃতির কাঠামো। মাদ্রাসা কক্ষে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মাদ্রাসা কক্ষে বর্তমানে ইমাম সাহেবের থাকার ব্যবস্থা রয়েছে (চিত্র–৬৫)। প্রকৃতপক্ষে মির্ধা মসজিদের এই মাদ্রাসাটি মুসলিম মাদ্রাসার যথার্থ পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে, মিশরে আইয়ুবিদ ও মামলুক যুগে (একাদশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী) এই পরিকল্পনার ব্যাপক প্রচলন হয়।[১৭৬]

মির্ধা মসজিদের প্রধান আকর্ষন হচ্ছে এর প্লাটফর্মের নীচের ভল্ট আকৃতির সারিবদ্ধ কক্ষগুলো। এ ধরণের ভল্ট আকৃতির কক্ষ ঢাকার অপরাপর দ্বিতল মসজিদে (করতলাব খান মসজিদ, খাজা অম্বর, আজিমপুর, মুসাখান) লক্ষ্য করা যায়; তবে মির্ধা মসজিদে এই কক্ষগুলো যেরূপ সুসন্নিবেশিত অন্যান্য মসজিদে সেরূপ লক্ষ্য করা যায় না। মির্ধা মসজিদের প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর পরিকল্পনা লক্ষ্য করলে দেখা যায়, প্লাটফর্মের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিক দিয়ে ৯ ফুট প্রশস্ত একটি করিডোর চলে গেছে এবং করিডোরের ডানদিকে ৯×৯ ফুট পরিধির ১৭টি ভল্ট আকৃতির কক্ষ সারিবদ্ধ ভাবে বিন্যস্ত হয়েছে।[১৭৭] বস্তুতঃ কক্ষগুলোর সম্মুখের করিডোরের মাধ্যমেই দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কক্ষের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়েছে (চিত্র–৬৬)। এই করিডোরে প্রবেশের পথ রয়েছে পূর্ব দিকে। অন্যদিকে প্লাটফর্মের উত্তর দিকে চারটি কক্ষ রয়েছে। উত্তর দিকের এই চারটি কক্ষের সাথে দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের কক্ষের কোন যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি।অর্থাৎ উত্তর দিকের কক্ষগুলোর সম্মুখে কোন করিডোর নেই যার মাধ্যমে পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকের কক্ষগুলোতে যাওয়া যাবে। বস্তুতঃ উত্তর দিকের কক্ষগুলো কিছুটা বিচ্ছিন্ন বলা যায়। এদিকে প্রবেশ পথ রয়েছে উত্তর দিকে। মির্ধা মসজিদের প্লাটফর্মের নীচের এই কক্ষগুলো কি উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হতো তা নিয়ে পন্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এস, এম, তৈফুরের মতে, নীচতলার এই কক্ষগুলো মাদ্রাসা হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৭৮] তৈফুরের এই মতের ব্যাখ্যা কিছুটা ভিন্নরূপ হতে পারে কারণ লক্ষ্য করা গেছে যে, মসজিদের প্লাটফর্মের উপর মাদ্রাসা ভবন রয়েছে।[১৭৯] আব্দুল করিম মনে করেন এই কক্ষগুলো দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হতো।[১৮০] ঠিক যেমনটি করতলাব খানের মসজিদে এখনো লক্ষ্য করা যায়। তিনি বলেন, 'এটি মনে করা অযৌক্তিক হবে না যে মসজিদের নীচতলার এই দোকান গুলো মসজিদ ও মাদ্রাসার রক্ষনাবেক্ষণের জন্য একটি স্থায়ী আয়ের উৎস ছিল।'

এক্ষেত্রে বলা যায় যে, এই কক্ষগুলো দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হলে মসজিদটি একটি কোলাহল পূর্ণ স্থানে পরিনত হবে। ফলে এই ইমারতের ধর্মীয় ও শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যই এতে ব্যহত হতো। কাজেই এরূপ ধারনা করাই সঙ্গত হবে যে, নীচ তলার এই কক্ষগুলো যার দেয়ালে বই রাখার মত তাক রয়েছে, সে সব কক্ষগুলো মূলতঃ মাদ্রাসার শিক্ষক ও ছাত্রদের আবাসস্থল হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এই অর্থে ঢাকার এই রীতির সকল মুঘল মসজিদই আবাসিক মাদ্রাসা মসজিদ হিসেবে অভিহিত করা যায়।[১৮১]

মসজিদটি যে উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেই প্লাটফর্মের মধ্যবর্তী স্থানটি সম্পূর্ণ ভরাট। স্থানীয় জনমনে এই বদ্ধ ও ভরাট ভিত্তি নিয়ে ব্যপক কৌতুহল বিদ্যামান। মসজিদের সেক্রেটারী জনাব মফিজুল হক এবং মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মদ আইয়ুব উভয়ই বলেন যে, এই প্রশস্ত ভরাট ভিত্তির অভ্যন্তরে কোন গুপ্ত কুঠরী রয়েছে এমন ধারণা স্থানীয় জনমনে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ রীতির মসজিদ বাংলাদেশে বিরল তাই জনমনে নানা কৌতুহলের উদ্রেক হয়েছে। মসজিদটি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে থাকায় সামগ্রিক ভাবে এর সংরক্ষণ ভালো হচ্ছে। ঢাকায় এ রীতির যে কটি মসজিদ রয়েছে তার মধ্যে মির্ধা মসজিদটি অন্যতম। আকৃতিতে মসজিদটি বড় না হলেও এর মধ্যে একটি সুসংবদ্ধ রূপ প্রকাশ পেয়েছে যা সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মসজিদের উত্তর দিকে বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন নির্মিত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

২৬. করতলাব খান মসজিদ, ১৭০০-৪ ঃ

কেন্দ্রিয় কারাগারের পূর্বদিকে বেগম বাজারে অবস্থিত করতলাব খানের মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। মসজিদটি মুর্শিদ কুলী খান (১৭০০–১৭০৪) নির্মাণ করেন।[১৮২] মুর্শিদ কুলী খানেরই অপর নাম ছিল করতলাব খান। মসজিদটি বেগম বাজারের মসজিদ নামেও পরিচিত।

১৭৭৭ সালে সরফরাজ খানের কন্যা লাডলী বেগম এই মসজিদ ও মসজিদ সংলগ্ন বাজারের উত্তরাধিকারী হন।[১৮৩] অনেকের মতে লাডলী বেগমের নাম থেকেই বেগম বাজার নামের উৎপত্তি।

করতলাব খান মসজিদটি একটি দ্বিতল মসজিদ, অর্থাৎ উচু প্লাটফর্মের ওপর মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত এবং প্লাটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির কক্ষ রয়েছে (ভূমিনক্সা, পৃঃ ২৯)। ঢাকায় এ রীতির মসজিদের মধ্যে মির্ধা মসজিদ, মুসা খানের মসজিদ, খাজা অম্বরের মসজিদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তবে ঢাকার এই সব দ্বিতল মসজিদগুলো থেকে করতলাব খান মসজিদে কতগুলো সুস্পষ্ট পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথমত ঃ অপরাপর দ্বিতল মসজিদগুলো প্রধানতঃ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট কিন্তু এই মসজিদটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট (চিত্র–৬৮)। বস্তুতঃ ঢাকায় মুঘল যুগের পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের এটাই একমাত্র নিদর্শন।

দ্বিতীয়ত ঃ মসজিদের উত্তর দিকে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট একটি কক্ষ সংযুক্ত রয়েছে (চিত্র–৬৯)।

এই রীতির অপরাপর মসজিদগুলো থেকে স্বতন্ত্র এই দু'টি স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য করতলাব খান মসজিদকে বিশেষত্ব দান করেছে।

মসজিদ চত্বরে পৌছানোর জন্য উচু প্লাটফর্মের পূর্ব দিকে সিড়ি রয়েছে। প্লাটফর্মের ওপর উত্তর পশ্চিম দিকে মসজিদের অবস্থান। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার, এর চার কোনায় চারটি আষ্টভুজি কর্নার টাওয়ার রয়েছে। কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে শিরতোলা (fluted) কুপোলা বিদ্যমান। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার ফ্রেমের মত করে প্যানেল করা হয়েছে। এই প্যানেল অলংকরণ মসজিদের দেয়ালে বৈচিত্র নিয়ে এসেছে। মসজিদের পূর্ব দিকে রয়েছে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ, খিলানগুলো আকৃতিতে four centred ।পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করে মসজিদের মধ্যবর্তী অংশকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। বর্ধিত অংশের দু'পাশে সরু মিনার দিয়ে বর্ডার করা রয়েছে। প্রবেশ দ্বারের পাঁচটি খিলানের মধ্যবর্তী খিলানটি প্রশস্ততর। প্রতিটি প্রবেশ দ্বারই এক একটি অর্ধ গম্বুজের নীচে অবস্থিত এবং প্রবেশ দ্বার গুলোর দু'পাশে সরু টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে এবং উত্তর দিকে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট একটি কক্ষ সংযুক্ত রয়েছে।

মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে পাঁচটি গম্বুজ রয়েছে। পাঁচটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজটি প্রশস্ততর। গম্বুজ গুলোর অষ্টভূজি ড্রামে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। গম্বুজ গুলোর চূড়ায় পদ্মপাপড়ি নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের অংশে পাঁচটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। এই বর্ধিত অংশ গুলোর দু'পাশে সরু টারেট দিয়ে বর্ডার করা। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় মসজিদ কক্ষটি চারটি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে পাঁচটি বে'তে বিভক্ত হয়েছে (চিত্র–৭০)। পশ্চিম দিকের দেয়ালে রয়েছে পাঁচটি মিহরাব। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, মসজিদের এই পাঁচটি মিহরাবই উচ্চতায় বেশ নীচু তবে মধ্যবর্তী প্রধান মিহরাবটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ততর। প্রধান মিহরাবের

Dhaka University Institutional Repository

উত্তর পাশে দু'টি ধাপের মিম্বার রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে তেমন কোন অলংকরণ নেই। মসজিদের উত্তর দিকে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট যে কক্ষ সংযুক্ত হয়েছে সেই চালের বাকানো প্রান্তগুলো কক্ষটিকে বিশেষ ভাবে সৌন্দর্য দান করেছে। এই কক্ষটি মূলতঃ নির্মিত হয় ইমাম সাহেবের থাকার জন্য। কক্ষটির বাইরের দিকের দেয়ালে প্যানেল করা হয়েছে এবং উত্তর দিকে একটি প্রবেশ দ্বার রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে প্লাটফর্মের ওপর ১৯৬২ সালে একটি বারান্দা সংযোজন করা হয়েছে।[১৮৪] বারান্দার সম্মুখে পাঁচটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে এবং ওপরে সমান্তরাল ছাদ। মসজিদের নীচতলার কক্ষগুলো দোকান হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

মসজিদ এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় রাস্তা থেকে সমগ্র মসজিদটি দেখা যায় না, কেবল কয়েকটি গম্বুজ ও দোচালা কুটিরের ন্যায় কক্ষটি দৃষ্টিগোচর হয়।

উল্লেখ্য যে, মসজিদের সন্নিকটে উত্তর–পূর্ব দিকে মুর্শিদ কুলী খান একটি বড় বাওলী বা ধাপযুক্ত কূয়ো তৈরী করেন। উত্তর ভারতীয় রীতির এই কুয়ো বাংলাদেশে বিরল। এই কুয়ো থেকে পানি তুলতে হলে একটি কক্ষের ভেতরে ধাপে ধাপে নেমে যাওয়া সিড়ি দিয়ে নীচে নামতে হয়। তবে কক্ষের বাইরে থেকেও লম্বা দড়ি ফেলে পানি তোলা যায়।[১৮৫]

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় পাঁচটি গম্বুজ, উত্তর দিকে দোচালা কুটিরের ন্যায় কক্ষ এবং নিকটবর্তী বাওলী–এ সব কিছু মিলিয়ে একসময় করতলাব খানের মসজিদের প্রাধান্য ছিল অনেকখানি। মসজিদের নিকটবর্তী যে বাওলী বা কুয়ো ছিল তা বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কূয়োটি যে স্থানে ছিল সে স্থানটি মাটি দিয়ে সম্পূর্ণ ভরে দেয়া হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী জনৈক মজিদ মিয়ার দোকানের ভেতর থেকে কুয়োর আদি প্রবেশ পথের অংশ বিশেষ প্রত্যক্ষ করা যায়। একটি খিলানের গঠন শৈলী বোঝা যায় (চিত্র–৭১)। সুতরাং বলা যায় ঐতিহাসিক এই বাওলীর এটাই একমাত্র চিহ্ন।

২৭. ফররুখ শিয়ার মসজিদ, ১৭০৩-৬ ঃ

ফররূখ শিয়ার মসজিদের অবস্থান লালবাগ দূর্গের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের কিছুটা দক্ষিণে শায়েস্তা খান রোডে। ইতিহাস বিজড়িত লালবাগের এই মসজিদটি বহু চড়াই উৎরাই পার হয়ে এখনো টিকে রয়েছে। ফররূখ শিয়ার তার পিতা আজিম উস শানের প্রতিনিধি রূপে ঢাকায় অবস্থান কালে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন (১৭০৩–১৭০৬)।[১৮৬]

মসজিদটি বেশ প্রশস্ত হলেও এর আদিরূপের সম্পূর্ণ পরিবর্তন হয়ে গেছে। মসজিদের আদিরূপ সম্পর্কে যতটুকু জানা যায় তার ভিত্তিতে বলা যায় মসজিদটি ছিল আকৃতিতে আয়তাকার (ভূমিনক্সা, পৃঃ ৩০) । পরিমাপে দৈর্ঘ্যে ১৬৪ ফুট এবং প্রস্থে ৫৪ ফুট।[১৮৭] মসজিদটি সুপ্রশস্ত হওয়ায় এখানে তিনটি সারিতে প্রায় ১৫০০ জন লোকের স্থান সংকুলান হতো।[১৮৮] আয়তাকার এই মসজিদের ছাদ সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় মসজিদের ছাদটি কাঠের তক্তা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। প্রকৃতপক্ষে ফররুখ শিয়ার যে এই মসজিদটি নির্মাণ সমাপ্ত করে যেতে পারেননি, মসজিদের ছাদটিই তার সাক্ষ্য দেয়।[১৮৯]

১৭১৭ সালে নবাব মুর্শিদ কুলী খান মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য মসজিদের আশে পাশের এলাকার কিছু

Dhaka University Institutional Repository

ভূমি দান করেন।[১৯০]

মসজিদের কাঠের ছাদটি ভেঙ্গে পড়লে ১৮৭০ সালে ঢাকার নবাব আব্দুল গনি ছাদটি পাকা করে পুনঃ নির্মাণের জন্য অর্থ দান করেন।[১৯১] বর্তমানে পিলার ও আর্চের ওপর ভিত্তি করে সম্পূর্ণ মসজিদে কংক্রিটের সমান্তরাল ছাদ নির্মিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, প্রশস্ত আয়তাকার পরিসরকে আচ্ছাদিত করার ক্ষেত্রে বাংলায় প্রচলিত রীতি হিসেবে বহু গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, ষাট গম্বুজ মসজিদ, ছোট সোনা মসজিদ প্রভৃতি। সম্পূর্ণ সমান্তরাল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মাণের ইতিপূর্বের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে উত্তর ভারতের ফতেহ্পুর সিক্রির নাগিনা মসজিদের ছাদটি সমান্তরাল ভাবে নির্মিত হয়।[১৯২] ফররুখ শিয়ার মসজিদের ছাদটি যেহেতু অসমাপ্ত অবস্থায় রয়ে যায় সেহেতু বোঝার উপায় নেই ছাদটি প্রকৃতপক্ষে কিরূপে নির্মিত হবার পরিকল্পনা ছিল। আমরা কেবল দু'টি সম্ভাবনার কথা বলতে পারি, প্রথমতঃ বাংলায় প্রচলিত বিশেষ করে সুলতানী যুগের বহু গম্বুজ বিশিষ্ট ছাদ। দ্বিতীয়তঃ ফতেহ্পুর সিক্রির নাগিনা মসজিদের (ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত) দৃষ্টান্ত অনুযায়ী সমান্তরাল ছাদ। বস্তুতঃ মুঘলযুগে ঢাকার স্থাপত্যে আমরা উত্তর ভারতের স্থাপত্যের বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করি। সুলতানী যুগে বাংলার স্থাপত্যে যে স্বতন্ত্র ভাবমূর্তি ছিল মুঘল আমলে ঢাকার স্থাপত্যে তেমন ছিলনা। নির্মাতাদের মধ্যে উত্তর ভারতের স্থাপত্যের অনুকরণ করার প্রবণতা খুব প্রকট ভাবে ধরা পড়ে। কাজেই নাগিনা মসজিদের প্রভাব ফররুখ শিয়ার মসজিদের আসতে পারে এমন সম্ভাবনা অমূলক নয়। ফররুখ শিয়ার মসজিদটি বর্তমানে সম্পূর্ণ আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। মসজিদটি এখন একটি সুউচ্চ মিনার সহ একটি প্রশস্ত মসজিদ। মসজিদের ভিত্তি কিছুটা উচু থাকায় পূর্ব দিকে মসজিদের প্রবেশের জন্য কয়েক ধাপের সিড়ি রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে ১৯৭৫ সালে মসজিদটিকে নতুন করে নির্মাণ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়। এ সময় আদি মসজিদের ১৮ টি স্তম্ভ ও পুরানো ছাদ ভেঙ্গে ২৪ ইঞ্চি বেড়ের ৮টি স্তম্ভের ওপর সমান্তরাল ছাদ নির্মাণ করা হয়। এ সময় পূর্ব দিকে ১১৭ × ২১ ফুট আয়তনের একটি বারান্দা সংযোজিত হয়। ১৯৮৭ সালে সরকারী উদ্যোগে প্রচুর অর্থ ব্যয়ে মসজিদের বর্তমান রূপায়ন হয়।[১৯৩] ফররুখ শিয়ার মসজিদের পূর্ব দিকে প্রবেশের জন্য খিলান যুক্ত দু'টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে (চিত্র–৭২)। একটি প্রধান ও প্রশস্ত। প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপরে কলেমা লেখা রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের সম্মুখ ভাগে সিরামিক ইট ও টালি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সিড়িতে মার্বেল পাথর বসানো হয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে ঘাসের আঙ্গিনা রয়েছে। সেখানে কয়েকজন ব্যক্তির কবর রয়েছে। মসজিদের দক্ষিন দিকটি দেয়াল দিয়ে ঘেরা হয়েছে।

বস্তুতঃ মসজিদের অভ্যন্তর ভাগকে আমরা তিনটি অংশে বিভক্ত করতে পারি। প্রথমত ঃ পশ্চিম দিকের প্রধান প্রার্থনা কক্ষ। আয়তাকার এই কক্ষের পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। এই কক্ষের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের দেয়ালে নীল বর্ণের টালি বসানো হয়েছে এবং পূর্ব দিকে কাঁচের দরজা লাগানো হয়েছে (চিত্র–৭৩)।

মসজিদের দ্বিতীয় অংশ বলতে প্রধান প্রার্থনা কক্ষের সম্মুখে পূর্ব দিকের বারান্দাকে ধরা যায়। বারান্দার সম্মুখে সারিবদ্ধ খিলান বসানো হয়েছে। এটা দৃশ্যতঃ অনেকটা screen of arches এর মত দেখায়। এই খিলানের সারি নির্মাণে সিরামিক ইট ব্যবহৃত হয়েছে। বারান্দার সামনেই বড় হল ঘর। এটাই মসজিদের তৃতীয় এবং বৃহত্তম অংশ।হল ঘরে সারিবদ্ধ পিলার এবং পিলারের ওপর খিলান বসানো হয়েছে। বস্তুতঃ হল ঘরের ছাদটি পিলার ও খিলানের মাধ্যমে অনেকগুলো চৌকোনা অংশে বিভক্ত হয়েছে এবং এর মাধ্যমেই ওপরের সমান্তরাল ছাদের ভার রক্ষিত হয়েছে। সমগ্র মসজিদের মেঝে জুড়ে মোজাইক করা হয়েছে। হল ঘরের উত্তর পূর্ব দিকে

Dhaka University Institutional Repository

ওজুর জন্যে একটি হাউজ রয়েছে এবং উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই সারিবদ্ধ ভাবে কয়েকটি কক্ষ রয়েছে। মাদ্রাসা হিসেবে এই কক্ষগুলো ব্যবহৃত হয়। ১৯৮৭ সালে মসজিদের যে সংস্কার কাজ হয় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে পূর্ব দিকের উন্মুক্ত স্থানে মসজিদের সম্প্রসারণ, ১৭৬ ফুট উচ্চতা বিশিষ্ট মিনার নির্মাণ, মসজিদের অলংকরণ উদ্দেশ্যে মূল্যবান পাথর বসানো। উন্নতমানের দরজা জানলা সংযোজন, পূর্ব পাশের দোকান গুলো ভেঙ্গে সুদৃশ্য দেয়াল নির্মাণ প্রভৃতি।[১৯৪]

মসজিদের সুউচ্চ মিনারে উঠার জন্য উত্তর দিকে একটি সিড়ি রয়েছে। মিনারের মধ্যবর্তী স্থানে একটি ব্যালকনী রয়েছে।

মসজিদের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বলা যায় সুদীর্ঘ কাল ধরে মসজিদে নানাবিধ সংস্কারের ফলে অতীতের সকল চিহ্নই বিলীন হয়ে গেছে। সর্বোপরি প্রচুর অর্থব্যয়ে মসজিদের সাম্প্রতিক সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদটি সম্পূর্ণ আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। মসজিদটি লালবাগ শাহী মসজিদ নামে পরিচিত। মসজিদে কোন শিলালিপি নেই যা এর প্রাচীনত্ব প্রমানে সহায়তা করবে।

২৮. মরিয়ম সালেহা মসজিদ, ১৭০৬ ঃ

মরিয়ম সালেহা মসজিদের অবস্থান নীলক্ষেতের বাবুপুরায়। মসজিদের চারপাশে অনেক দোকান পাট ও জনবসতি থাকায় মসজিদটির সম্পূর্ণটাই প্রায় আড়াল পড়ে গেছে। রাস্তা থেকে কেবল মসজিদের গম্বুজ তিনটি দৃষ্টিগোচর হয় (চিত্র–৭৪)। মসজিদের আঙ্গিনায় একটি ছোট কবরস্থান রয়েছে। এখানে যারা সমাহিত রয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাহ্‌বাগু দিওয়ান। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্‌র কন্যা ছিলেন মরিয়ম সালেহা।[১৯৫] শিলালিপি অনুযায়ী মরিয়ম সালেহা ১১১৮ হিজরী অর্থাৎ ১৭০৬ সালে এই মসজিদটি নির্মাণ করেন।[১৯৬] মসজিদটি চিরাচরিত মুঘল রীতিতে ইট ও প্লাস্টার দিয়ে নির্মিত। আয়তাকার মসজিদটি মূলতঃ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট (ভূমিনক্সা, পৃঃ ৩১)। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভুজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে, কর্ণার টাওয়ার গুলোর ওপরে শীর তোলা (fluted) কুপোলা বসানো হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী অংশ কিছুটা বর্ধিত করা হয়েছে।এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার দিয়ে বর্ডার করা। মসজিদের পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। তিনটি প্রবেশ পথই অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। প্রবেশ পথের খিলানে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার ও খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলান যুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের দু'পাশের দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। মসজিদের ছাদে তিনটি গম্বুজ রয়েছে। মধ্যবর্তী গম্বুজটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। গম্বুজের অষ্টভুজি ড্রামে মার্লন নক্সা করা হয়েছে। গম্বুজগুলোর শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল বিদ্যমান।

ভেতরের দিকে মসজিদের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩৯ ফুট এবং প্রস্থে ১৩ ফুট।[১৯৭] মসজিদ কক্ষটি দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি বে'তে বিভক্ত, পাশ্ববর্তী বে' গুলোর আকৃতি হ্রাস করা হয়েছে লালবাগ দূর্গের অনুরূপ phase of transition-এ অর্ধগম্বুজ বসিয়ে। গম্বুজ গুলোর ভেতরের দিকের নিম্নাংশে পাতার মত নক্সা করা

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে।

মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী প্রধান মিহরাবটি আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজি। মিহরাব ফ্রেমের ওপরে প্লাস্টারের ওপর লতা পাতার নক্সা করা হয়েছে। প্রধান মিহরাবের উত্তর পাশে তিনটি ধাপের মিম্বার রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি সামগ্রিক ভাবে অলংকরণ বর্জিত সাদামাটা।

মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ হয়েছে পূর্বদিকে। পূর্বদিকে একটি প্রশস্ত হলঘর তৈরী করা হয়েছে। হলঘরের মধ্যবর্তী স্থানে একসারি পিলার রয়েছে এবং ওপরে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ ছাদের কেন্দ্রস্থলে প্লাস্টারের ওপর ফুলপাতার নক্সা করা হয়েছে। হলঘরে প্রবেশের জন্য পূর্ব দিকে দু'টি প্রবেশ দ্বার রয়েছে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত প্রবেশ দ্বারের উপরিভাগ অনেকটা flat top আর্চের মত করে তৈরী হয়েছে এবং বাইরের দিকে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। হলঘরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কয়েকটি জানালা রয়েছে। হলঘরের সম্মুখে পূর্ব দিকে বারান্দার মত করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। বারান্দায় দু'টি চওড়া পিলার রয়েছে এবং ওপরে সমান্তরাল ছাদ। বারান্দার পূর্ব দিকে একটি প্রশস্ত প্রবেশ পথ রয়েছে, বলা যায় এটাই এখন মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রধান প্রবেশ পথ।

মসজিদের সামগ্রিক পর্যবেক্ষনে বলা যায়, সম্প্রসারিত অংশে যথেষ্ট আলো বাতাস আসলেও মূল মসজিদটি অন্ধকারাচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করলে লক্ষ্য করা যায় যে, প্রথমতঃ মূল মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে কেবল একটি প্রবেশ পথ রয়েছে এবং মসজিদের সবগুলো প্রবেশ পথই খুব নীচু। ফলে কক্ষে পর্যাপ্ত আলো প্রবেশ করতে পারে না।দ্বিতীয়ত ঃ পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে যতটুকু আলো বাতাস প্রবেশ করতো তাও রুদ্ধ হয়ে গেছে।

২৯. কারাগার বাগানবাড়ি মসজিদ, ১৭১৪ ঃ

কেন্দ্রিয় কারাগারের উত্তর সীমানায় মসজিদটির অবস্থিতি। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার এবং এক গম্বুজ বিশিষ্ট (ভূমিনক্সা, পৃঃ ৩২)। মসজিদের চারকোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্নার টাওয়ার এবং কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষে প্লাস্টার করা কিয়স্ক রয়েছে (চিত্র–৭৬)। মসজিদের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী অংশ সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা রয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বার রয়েছে, প্রবেশ দ্বারের এই খিলানগুলো আকৃতিতে four centred এবং অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত।

প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপি রয়েছে (চিত্র–৭৭)। ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ এই শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, মসজিদটি ১১২৬ হিজরীতে অর্থাৎ ১৭১৪ সালে নির্মিত হয়েছে।[১৯৮] মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার ও বর্গাকার প্যানেল করা রয়েছে। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বার গুলো উচ্চতায় বেশ নীচু। মসজিদের পশ্চিম দিকের দেয়ালের পেছনের দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মিহরাবের এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি টারেট সংযুক্ত আছে। মসজিদের ছাদে অষ্টভূজি ড্রামের ওপর একটি গম্বুজ নির্মাণ করা হয়েছে। গম্বুজের শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার উপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে অথবা ড্রামে মার্লন অলংকরণ নেই। বিষয়টি বিস্ময়কর। কারণ, ঢাকার প্রায় সকল মুঘল মসজিদেরই প্যারাপেট ও গম্বুজের ড্রামে মার্লন অলংকরণ

Dhaka University Institutional Repository

লক্ষ্য করা যায়। এমন হতে পারে যে, আদিতে মসজিদটিতে এই অলংকরণ ছিল কিন্তু বিভিন্ন সময়ের সংস্কারে তা বিলীন হয়ে গেছে। মসজিদের মেঝে বেশ উচু এবং দেয়াল গুলো চওড়া। অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থানে একটি প্রায় অষ্টভূজি আকৃতির মিহরাব রয়েছে। প্রধান মিহরাবের দু'পাশে দু'টি ক্ষুদ্রাকৃতির মিহরাব রয়েছে। প্রধান মিহরাবটি প্রশস্ত এবং তার ভেতর একটি ছোট জানালা রয়েছে। মিহরাবের অভ্যন্তরেই কিছুটা উত্তর দিকে দু'টি ধাপের একটি মিম্বার রয়েছে। মিহরাবের অভ্যন্তরস্থ এই ক্ষুদ্রাকৃতির জানালাটি সম্ভবতঃ মসজিদের কোন সময়ের সংস্কার কালে তৈরী করা হয় মসজিদ কক্ষে আলো প্রবেশের জন্য। মিহরাবের ফ্রেমের ওপর মার্লন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদ কক্ষের উপরিভাগে একটি গম্বুজের উচু ছাদ এবং গম্বুজের দু'পাশে দু'টি অর্ধগম্বুজ রয়েছে। এই মসজিদের অনুরূপ ছাদ নিমতলী মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। প্রকৃতপক্ষে আয়তাকার পরিসরকে একটি মাত্র গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত করতে গিয়েই এই কৌশলের উদ্ভব। মসজিদটিতে অলংকরণ বর্জিত একটি সাদামাটা রূপ বিদ্যমান।

মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ ঘটেছে পূর্ব দিকে। সম্প্রসারিত অংশের ওপর কিছু দূর পর্যন্ত কংক্রীটের ছাদ নির্মিত হয়েছে। মসজিদের অবস্থান কারাগার এলাকার অভ্যন্তরে হওয়াতে এর পাশ ঘেসে কোন ইমারত গড়ে উঠেনি। ফলে, মসজিদের অবস্থান এলাকাটি বেশ খোলামেলা রয়েছে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় মসজিদের অবস্থান ভাল থাকলেও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের সম্মুখভাগ (facade) বাইরে থেকে দেখা যায় না।

৩০। গোর-ই-শাহী মসজিদ , ১৭২৬ ঃ

গোর-ই-শাহী মসজিদটি আজিমপুরস্থ সলিমউল্লাহ্ মুসলিম এতিম খানার চত্বরের অভ্যন্তরে অবস্থিত। মসজিদের পূর্ব পাশে আঙ্গিনায় কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির কবর রয়েছে। 'গোর' বা কবর থাকার কারণেই সম্ভবতঃ মসজিদের নাম হয়েছে "গোর-ই-শাহী।" [১৯৯]

এই মসজিদটি একটি দ্বিতল মসজিদ অর্থাৎ উচু প্লাটফর্মের ওপর মূল মসজিদ অবস্থিত এবং প্লটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির কক্ষ সন্নিবেশিত রয়েছে (ভূমিনক্সা, পৃঃ-৩৩)। এই মসজিদটি উচু প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। মসজিদটি বর্গাকৃতির এবং একগম্বুজ বিশিষ্ট। মসজিদ কক্ষের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ১৪′ ৩″ এবং প্রস্থে ১৪′ ৩″ ।[২০০] মসজিদের চার কোনায় চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে। কর্ণার টাওয়ার গুলোর চুড়ায় শীর তোলা (fluted) কিয়স্ক বিদ্যমান রয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালে প্যানেল করা হয়েছে। পূর্ব দিকে তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। খিলানগুলো আকৃতিতে four centred । পূর্ব দিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী অংশটি সামনের দিকে বর্ধিত করা। মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি প্রধান। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশে এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ পথের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার সংযুক্ত রয়েছে। পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথের ওপর মসজিদের শিলালিপি রয়েছে। মসজিদের সবকটি প্রবেশ পথের খিলানে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে তিনটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ (mihrab projection) রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে এবং গম্বুজের অষ্টভূজি ড্রামে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। গম্বুজের শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস আকৃতির ফিনিয়াল রয়েছে। মসজিদের প্যারাপেটের ওপর গম্বুজের চার পাশ ঘিরে আটটি পিনাকেল রয়েছে। গম্বুজ, পিনাকেল, কিয়স্ক এসব কিছু মিলিয়ে sky line চমৎকার দেখায় (চিত্র–৭৮) ।

মসজিদের অভ্যন্তরভাগ লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে দেয়াল গুলো বেশ চওড়া। মসজিদের পরিসর বেশী না হলেও অভ্যন্তর ভাগটি অন্ধকারাচ্ছন্ন নয়, অর্থাৎ তিন দিকের প্রবেশ পথ দিয়ে পর্যাপ্ত আলো ভেতরে আসে। অভ্যন্তরভাগে প্রতিটি প্রবেশ পথের দু'পাশে দু'টি করে সরু মিনার সংযুক্ত রয়েছে। পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রধান এবং আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজি প্রধান মিহরাবটি অলংকরণ সমৃদ্ধ। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারের দু'পাশে খিলান আকৃতির প্যানেল করা হয়েছে। মসজিদ কক্ষের সর্বত্রই প্লাস্টারের ওপর ফুলপাতার (floral) নক্সা করা হয়েছে (চিত্র–৭৯)। মিহরাব আর্চের টিম্পেনামে জ্যামিতিক নক্সা করা হয়েছে। এই জ্যামিতিক নক্সাটি চিত্তাকর্ষক। ঢাকার অন্যকোন মুঘল মসজিদে এই জ্যামিতিক নক্সার অলংকরণ দেখা যায়নি (চিত্র–৮০)। মিহরাবের টিম্পেনামের নক্সার অনুরূপ নক্সা করা হয়েছে অভ্যন্তর ভাগের দেয়ালের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর। মসজিদ কক্ষের উপরে একটি গম্বুজের উচু ছাদ। গম্বুজের আবরণের নীম্নাংশে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে।

মসজিদের প্লাটফর্মের নীচে বেশ কয়েকটি কক্ষ সন্নিবেশিত আছে। এসব কক্ষের পরিসর বেশী নয়। কক্ষগুলোর ছাদ ভল্ট আকৃতির। একটি কক্ষ থেকে আরেকটি কক্ষে যাওয়ার মধ্যবর্তী পথটি বেশ নীচু। মসজিদের উচু প্লাটফর্মে উঠার জন্য দক্ষিণ দিক থেকে একটি সিড়ি সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের পশ্চিম দিকের পেছনে আঙ্গিনায় একটি চৌবাচ্চা আছে।

অধুনা এই মসজিদের সম্প্রসারণ হয়েছে। প্লাটফর্মের তিনপাশে দেয়াল দিয়ে ঘিরে ওপরে সমান্তরাল ছাদ দেয়া হয়েছে। এই সম্প্রসারিত অংশে নামাজ পড়া হয়। তিন পাশের দেয়ালের নিম্নাংশে প্লাস্টারের ওপর জালির কাজ করা হয়েছে এবং ওপরের দিকে trifoil খিলান করে জানালার মত করা হয়েছে। মসজিদের দক্ষিণ দিকে একটি মিনার সংযুক্ত রয়েছে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় আকৃতিতে ছোট হলেও অলংকরণ সমৃদ্ধ এমসজিদটি চিত্তাকর্ষক।

ঢাকায় দ্বিতল যে কয়টি মুঘল মসজিদ লক্ষ্য করা যায়, তার থেকে এটি ব্যতিক্রম কারণ, অন্যান্য দ্বিতল মসজিদ গুলো মূলতঃ একাধিক গম্বুজ বিশিষ্ট কিন্তু এই মসজিদটি একগম্বুজ বিশিষ্ট। অন্যদিকে ঢাকায় বর্গাকৃতির যে মসজিদ রয়েছে (আল্লাকুরী) তার সাথে মূল মসজিদের আকৃতিগত সাদৃশ্য থাকলেও এটি মূলতঃ দ্বিতল মসজিদ। বস্তুতঃ গোর–ই–শাহী মসজিদে ঢাকায় প্রচলিত মুঘল মসজিদের দু'ধরনের রীতির (type) সমন্বয় ঘটেছে।

মসজিদের প্লাটফর্মের উন্মুক্ত অংশের তিনপাশ ঘিরে দেয়াল দিয়ে যে সম্প্রসারণ করা হয়েছে তা মূল মসজিদের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। প্লাটফর্মের দেয়াল তোলার কারণে মূল মসজিদ অনেকটা আড়াল পরে গেছে। মসজিদের প্লাটফর্মের নিচের ভল্ট আকৃতির কক্ষ গুলো সংস্কার করার ফলে কোন কোন কক্ষের ভল্ট আকৃতির ছাদ সমান্তরাল হয়ে গেছে, ফলে নিঃসন্দেহে এতে ইমারতের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদের মিনারটিও মূল ইমারতের সাথে অসংগতিপূর্ণ।

Dhaka University Institutional Repository

৩১. আরমানিটোলা মসজিদ, ১৭৩৫ ঃ

মসজিদটি আরমানিটোলার শরৎচন্দ্র চক্রবর্তী রোডে অবস্থিত। মসজিদের পশ্চিম দিক দিয়ে রাস্তা চলে গেছে। আয়তাকার বিশিষ্ট ক্ষুদ্র পরিসরে এই মসজিদটিকে একটি ছোট ঘরের সাথে তুলনা করা যায় (ভূমিনক্সা, পৃঃ-৩৪)। মসজিদের দেয়াল গুলো বেশ চওড়া। মসজিদের পূর্ব দিকে খিলান যুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে, তিনটি প্রবেশ পথই এক একটি অর্ধগম্বুজের নীচে অবস্থিত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পূর্বে একটি করে প্রবেশ পথ থাকলেও এখন তা বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং মসজিদের ভেতরের দিকে ঐ প্রবেশ পথের স্থানে তাকের মত করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তরভাগ অলংকরণ বর্জিত সাদামাটা। পশ্চিম দেয়ালে একটি মিহরাব রয়েছে। পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের দু'পাশে বর্গাকৃতির দু'টি ছোট জানলা রয়েছে। সম্ভবত ঃ এই জানালা মসজিদ নির্মাণের পরবর্তী কোন সময়ে তৈরী করা হয় অভ্যন্তর ভাগে আলো প্রবেশ করানোর জন্য। কারণ পশ্চিম দেয়ালে সাধারণ ভাবে কেবল মিহরাব থাকে, এদিকে কোন জানালা করা হয় না। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালের বাইরের অংশ মূল মসজিদের উচ্চতা থেকে কিছুটা উচু করে নির্মাণ করা হয়। পশ্চিম দেয়ালের প্যারাপেটে মার্লন নক্সা করা রয়েছে এবং প্যারাপেটের ওপর চারটি পিনাকেল রয়েছে (চিত্র-৮২)। পশ্চিম দেয়ালের পেছন দিকে মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের ছাদটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। বাংলার কুটিরের চৌচালা চালের মত এই মসজিদের সম্পূর্ন ছাদটি চৌচালা বা চারটি পাশযুক্ত (চিত্র-৮৩)। চৌচালা ছাদের শীর্ষদেশে অল্প দূরত্বে তিনটি ফুলের ন্যায় নক্সা করা হয়েছে। চুড়িহাট্টা মসজিদের (১৬৪৯) ছাদটিও আরমানিটোলা মসজিদের অনুরূপ চৌচালা ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে চুড়িহাট্টা মসজিদের আদিরূপের সেই ছাদটির বর্তমানে কোন অস্তিত্ব নেই। মসজিদের সম্প্রসারণ কালে ছাদটি সমান্তরাল করে দোতলা নির্মাণ করা হয়েছে। সুতরাং আরমানিটোলা মসজিদই মুঘল ঢাকার একমাত্র টিকে থাকা চৌচালা ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ, সেই হিসেবে এর স্থাপত্যিক গুরুত্ব অনেক খানি।

প্রকৃতপক্ষে সুলতানী যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মসজিদে চৌচালা চালের অনুরূপ গঠন শৈলী লক্ষ্য করা যায়। যেমন, বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ, (পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) ফিরোজপুরের ছোট সোনা মসজিদ (১৪৯৩-১৫১৯) । তবে এসব মসজিদের কেন্দ্রিয় nave এ চৌচালা চালের মত কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে আরমানিটোলা মসজিদে সমগ্র মসজিদের ছাদটি চৌচালা। মূলতঃ মসজিদের পরিসর ছোট থাকায় এ ধরণের একটি ভল্ট আকৃতির চৌচালা ছাদ নির্মাণ করা সম্ভব হয়।

ডঃ দানি এই চৌচালা ছাদটিকে উত্তর ভারতের বাংলো রীতির ছাদ বলে উল্লেখ করেছেন।[২০১] মসজিদের প্রবেশ পথের মধ্যবর্তী খিলানের ওপর যে শিলালিপি ছিল বর্তমানে তা নেই। এই শিলালিপিটি সম্ভবতঃ ১৯৬২ সালের পরিবর্তী কোন সময়ে মসজিদ থেকে খুলে ফেলা হয়। কারণ ডঃ দানির গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে (১৯৬২ সালে প্রকাশিত) মসজিদের প্রবেশের প্রধান খিলানের ওপর শিলালিপি রয়েছে এবং সেই শিলালিপি পাঠ করে জানা যায় যে, মসজিদটি ১৭৩৫ সালে খান জানির স্ত্রী নির্মাণ করেন।[২০২] তবে ঢাকার প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দপ্তরে রক্ষিত এই মসজিদের শিলালিপি থেকে জানা যায় যে, জনৈক আহ্মদ কর্তৃক ১৭১৬ সালে মসজিদটি নির্মিত হয়। ফররুখ শিয়ার তখন ঢাকায় সুবাদার ছিলেন (১৭১৩-১৭১৯)।

ফার্সী ভাষায় উৎকীর্ণ শিলালিপির ইংরেজী অনুবাদ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ, কে, এম ইয়াকুব আলী। শিলালিপির অনুবাদ নিম্নরূপঃ

Dhaka University Institutional Repository

"In the name of Allah, the most compassionate and marciful. In the reign of the great emperor Farrukh Siar, this mosque was (built) by Ahmed. The date of its completion being the year 1129 A. H. (1716 A. D.) and it leads to the visit (or right path), the distant house (it may be Kaba). [২০৩]

মসজিদটির বর্তমান মুতাওয়াল্লী জনাব মিজানুর রহমান জানান, মসজিদের শিলালিপি ঢাকা যাদুঘরের পক্ষ থেকে ষাটের দশকের কোন এক সময় মসজিদ থেকে খুলে নেয়া হয়।

মসজিদের পূর্ব দিকের কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পূর্ব দিকে আরেকটি কক্ষের মত তৈরী করা হয়েছে, এ কক্ষের প্রবেশ পথ উত্তর দিকে। কক্ষটিতে কংক্রীট বীমের ওপর সমান্তরাল ছাদ রয়েছে। মসজিদে উত্তর দিকেও আরেকটি ছোট ঘর তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ ইমাম সাহেবের বসবাসের জন্য।

মসজিদটির সামগ্রিক পর্যবেক্ষণে বলা যায় আপাতঃ দৃষ্টিতে মসজিদটির তেমন কোন গুরুত্ব না থাকলেও মসজিদের ছাদ নির্মাণ কৌশলটি একে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছে এবং সেই অর্থে ঢাকার মুঘল যুগের মসজিদ গুলোর মধ্যে আরমানিটোলা মসজিদের একটি বিশেষ স্থান রয়েছে।

৩২. তারা মসজিদ, ১৭৩৫ ঃ

তারা মসজিদের অবস্থান আরমানিটোলার আবুল খয়রাত রোডে। চমৎকার অলংকরণ সমৃদ্ধ এই মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।

তবে তারা মসজিদের এই চমৎকার অলংকরণ যার জন্য মূলতঃ মসজিদের পরিচিতি, সেই অলংকরণ করা হয় মসজিদ নির্মাণের অপেক্ষাকৃত পরিবর্তী সময়ে। আদিতে মসজিদটি মুঘল স্থাপত্যের অন্যান্য মসজিদের অনুরূপ অলংকরণ বর্জিত সাদামাটা ছিল। মসজিদটি নির্মাণ করেন জনাব গোলাম পীর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে, সেই সময় থেকে মসজিদটি গোলামপীরের মসজিদ নামে পরিচিত ছিল। [২০৪]

আয়তাকার বিশিষ্ট মসজিদটির অভ্যন্তরভাগের পরিমাপ দৈর্ঘ্যে ৩৩ ফুট এবং প্রস্থে ১১ ফুট। [২০৫] মসজিদের চার কোনায় চারটি কর্ণার টাওয়ার রয়েছে এবং টাওয়ার শীর্ষে প্লাস্টার করা কিয়স্ক বিদ্যমান (ভূমিনক্সা, পৃঃ ৩৫)। মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের সম্মুখভাগ আয়তাকার প্যালেন সমৃদ্ধ। মসজিদের পূর্ব দিকে খিলানযুক্ত তিনটি প্রবেশ পথ রয়েছে, মধ্যবর্তী প্রবেশ পথটি অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রতিদিকের প্রবেশ পথের দু'পাশে একটি করে সরু টারেট সংযুক্ত করা হয়েছে। পশ্চিম দেয়ালের পেছনের দিকে তিনটি মিহরাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। এই বর্ধিত অংশগুলোর দু'পাশে সরু টারেট সংযুক্ত রয়েছে। মসজিদের ছাদটি তিনটি গম্বুজ দিয়ে আচ্ছাদিত, মধ্যবর্তী গম্বুজটি পার্শ্ববর্তী দু'টো অপেক্ষা প্রশস্ত (চিত্র–৮৪)। গম্বুজগুলো অষ্টভুজি ড্রামের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং গম্বুজ শীর্ষে পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল রয়েছে।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, পার্শ্ববর্তী গম্বুজ বসানোর ক্ষেত্রে phase of transition- এ লালবাগ দূর্গ মসজিদের অনুরূপ অর্ধগম্বুজ বসানো হয়েছে। গম্বুজের অভ্যন্তর ভাগের নিম্নাংশে প্লাষ্টারের ওপর নানারকম নক্সা করা হয়েছে (চিত্র–৮৫)। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে তিনটি মিহরাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহরাবটি প্রশস্ত। মসজিদের এই আদিরূপ বর্তমানে কেবল মসজিদের দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকের

Dhaka University Institutional Repository

দেয়াল প্রত্যক্ষ করলে উপলব্ধি করা যাবে। ১৯২৬ সালে আলী জান ব্যপারী নামে জনৈক ব্যবসায়ী মসজিদটিকে অলংকরণ সমৃদ্ধ করেন।[২০৬] এই অলংকরণের ফলে মসজিদের সৃষ্টিলগ্নের সাদাসিদে রূপটির সম্পূর্ণটাই অন্তরালে চলে যায়। তবে এ সময় মসজিদে অলংকরণ করতে গিয়ে মসজিদের আঙ্গিক কোন পরিবর্তন করা হয়নি, কেবল পূর্ব দিকে একটি বারান্দা সংযোজিত হয়। এই বারান্দার সম্মুখে ৬টি অষ্টভূজি পিলারের ওপর পাঁচটি খিলান তৈরী করা হয়। বারান্দায় উত্তর ও দক্ষিণ দিকে একটি করে প্রবেশ পথ রয়েছে। এ সময় যে অলংকরণ করা হয় তা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, বারান্দাসহ সমগ্র মসজিদের বহিরাবরণে চিনে মাটির বাসনের ভাঙ্গা টুকরো বসিয়ে অলংকরণ করা হয়। এই অলংকরণ রীতি 'চিনিটিকরী' নামে পরিচিত।[২০৭] এ খানে প্রধানতঃ প্লাস্টারের ওপর সাদা রঙের চিনে মাটির বাসনের ভাঙ্গা টুকরো বসানো হয়েছে এবং তার মধ্যে স্বল্প দূরত্বে অসংখ্য রঙিন তারার নক্সা করা হয়েছে। এই অসংখ্য তারার নক্সা থেকেই মসজিদটি তারা মসজিদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে। মসজিদের বারান্দার বাইরের দিকের অলংকরণটি চিত্তাকর্ষক। বারান্দার পূর্ব দিকে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ সমৃদ্ধ খিলান গুলোর উপরিভাগে আয়তাকার ফ্রেমের মত করা হয়েছে। খিলানের শীর্ষ দেশে ফুলের তোরার নক্সা করা হয়েছে। মসজিদের প্যারাপেটের নীচে একই সমান্তরালে বিভিন্ন প্রকারের নক্সা করা হয়েছে এবং প্যারাপেটে পাতার ন্যায় (basal leaf ornamentation) নক্সা করা হয়েছে। প্যারাপেটের মধ্যবর্তী স্থানের শীর্ষদেশে একটি অর্ধচন্দ্র ও তারা বসানো হয়েছে। প্যারাপেটের ওপর পিনাকেল গুলোও তারার নক্সা খচিত। গম্বুজের আবরণের নীল তারার নক্সাগুলো মসজিদের অপরাপর স্থানের নক্সা অপেক্ষা অধিক সুস্পষ্ট ও সুদৃশ্য।

মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে রঙিন চিত্রিত টালি দিয়ে অলংকরণ করা হলেও একই সাথে চিনিটিকরির অলংকরণও সংযোজিত হয়েছে (চিত্র–৮৬)। মসজিদ কক্ষের অভ্যন্তর ভাগের অলংকরণ করা হয়েছে মূলতঃ পশ্চিম দেয়ালের তিনটি মিহরাব ও পূর্ব দিকের তিনটি প্রবেশ দ্বারকে কেন্দ্র করে। মিহরাব ও প্রবেশ দ্বারের প্রতিটির চারপাশে নির্দিষ্ট উচ্চতায় অলংকরণ সমৃদ্ধ আয়তাকার ফ্রেম করা হয়েছে এবং নিম্নাংশে গোলাপ ফুলের নক্সা যুক্ত রঙিন টালি বসানো হয়েছে। অভ্যন্তর ভাগের প্রতিটি করবাল পেনডেনটিভে বিভিন্ন রঙের কাঁচের টুকরো বসিয়ে ফুলদানি সহ ফুলগাছের নক্সা করা হয়েছে (চিত্র–৮৭)। এই অলংকরণের ফাকে ফাকে সরু আয়না বসানো হয়েছে। অনুরূপ নক্সা মিহরাবের ওপরেও লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদের পূর্ব দেয়ালের বাইরের দিকের নীম্নাংশে গোলাপফুল চিত্রিত টালি বসানো হয়েছে এবং উপরিভাগে জাপানের ফুজিয়ামা পর্বতের দৃশ্য ও ফুলগাছ সহ ফুলদানির নক্সা সম্বলিত টালি বসানো হয়েছে (চিত্র–৮৮)।

মসজিদের অলংকরণ সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, চিনিটিকরি ও চিত্রিত টালির সমন্বয়ে মসজিদের অলংকরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হয়েছে। বস্তুতঃ মসজিদে অলংকরণের দু'টির ধারার সমন্বয় ঘটেছে, প্রথমতঃ দেশীয় কারিগরদের চিনিটিকরির কাজ এবং দ্বিতীয়তঃ বিদেশী অলংকরণ উপাদান চিত্রিত টালি। লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, এই দুই এর সংমিশ্রন কোন বৈসাদৃশ্যের সৃষ্টি করেনি, বরং অপূর্ব এক সমন্বয়ে মসজিদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে বহুগুন।

মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ করা হয়েছে ১৯৮৫ সালে।[২০৮] তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদকে উত্তর দিকে কিছুটা সম্প্রসারণ করে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট করা হয়। তিনটি গম্বুজের সাথে সামঞ্জস্য রাখার জন্য নতুন নির্মিত গম্বুজ দু'টির একটি বড় এবং একটি ছোট করে নির্মাণ করা হয়। মসজিদ কক্ষের অভ্যন্তরে সম্প্রসারিত পশ্চিম দেয়ালে অতিরিক্ত দু'টি মিহরাব সংযোজন করা হয়। বর্ধিত অংশে মূল মসজিদের অলংকরণের অনুরূপ

Dhaka University Institutional Repository

চিনিটিকরীর কাজ করা হয়। মসজিদের সম্মুখের চত্বরে মার্বেল বসানো হয়েছে এবং তারার আকৃতির চৌবাচ্চা নির্মাণ করা হয়েছে। মসজিদের সামনে খোলা আঙ্গিনা এবং তার সামনে আরমানিটোলা স্কুলের খেলার মাঠ থাকায় মসজিদের অবস্থান একলাকাটি বেশ উন্মুক্ত রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে এরূপ উন্মুক্ত থাকবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে। কারণ, পুরানো ঢাকা একটি জনবহুল এলাকা। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে এই স্থানে উন্মুক্ত এলাকা তেমন নেই বল্লেই চলে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, তারা মসজিদের অলংকরণ রীতি যা চিনিটিকরী নামে পরিচিতি, এই রীতির অলংকরণ ঢাকার অপর কয়েকটি মসজিদেও লক্ষ্য করা যায় যেমন, কসাইটুলি মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দী), বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৬), চকমসজিদ (১৬৭৯)। এইসব মসজিদের মধ্যে একমাত্র কসাইটুলি মসজিদে সমগ্র মসজিদ জুড়ে এই রীতির অলংকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে। অপরাপর মসজিদের বিশেষ বিশেষ স্থানে যেমন, গম্বুজ, পূর্ব দেয়াল, মিনার প্রভৃতি স্থানে এই অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় এই শতাব্দীর প্রথম দিকেই এই রীতির প্রচলন হয়। মসজিদ ছাড়াও অন্যান্য ইমারতেও এই অলংকরণ রীতি ব্যবহৃত হয়।

৩৩. আজিমপুর মসজিদ, ১৭৪৬ ঃ

মসজিদটি অবস্থান আজিমপুর কবরস্থানের পেছনে নয়াপল্টনে। কবরস্থানের পশ্চিম দিকের দেয়াল ঘেষে যে রাস্তা চলে গেছে তারই একপাশে মসজিদটি রয়েছে। মসজিদটি নির্মিত হয় ১১৬০ হিজরীতে অর্থাৎ ১৭৪৬ সালে এবং এর নির্মাতা নবাব পরিবারের জনৈক ফয়জুল্লাহ্।[২০৯]

আজিমপুর এলাকার একটি উল্লেখযোগ্য মসজিদ এটি। ঢাকার অপরাপর দ্বিতল মসজিদের অনুরূপ এখানেও উচু প্লাটফর্মের পশ্চিম দিকে মসজিদের অবস্থান এবং প্লাটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির কক্ষ রয়েছে (ভূমিনক্সা, পৃঃ ৩৬)। মসজিদে পৌঁছানোর জন্য প্লাটফর্মের উত্তর দিকে সিড়ি সংযুক্ত রয়েছে। সিড়ি দিয়ে মসজিদ চত্বরে প্রবেশ করার মুখে কিছুটা স্থান ভল্ট করে আচ্ছাদিত রয়েছে। মসজিদটি আকৃতিতে আয়তাকার, মসজিদের চারকোনায় পূর্বে চারটি অষ্টভূজি কর্ণার টাওয়ার ছিল। কর্ণার টাওয়ার গুলোর নীম্নাংশ অনেকটা ফুলদানীর (vase) মত আকৃতি বিশিষ্ট। মসজিদে পূর্ব দিকের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল করা রয়েছে। পূর্ব দিকে প্রবেশের জন্য তিনটি খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। প্রবেশ পথের খিলানগুলো আকৃতিতে four centred এবং খিলান গুলোতে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। প্রতিটি প্রবেশ পথই এক একটি অর্ধ গম্বুজের (half dome) নিচে অবস্থিত। মসজিদের পূর্ব দিকের মধ্যবর্তী অংশটি সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করা রয়েছে এই বর্ধিত অংশের দু'পাশে দু'টি সরু মিনার সংযুক্ত রয়েছে।

মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর শিলালিপির অবস্থান (চিত্র-৯১)। মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকেও একটি করে খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ রয়েছে। উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দেয়ালে আয়তাকার প্যানেল লক্ষ্য করা যায়।

মসজিদের প্রধান প্রবেশ দ্বারের উপর যে শিলালিপি রয়েছে তার বঙ্গানুবাদ এরূপ- "পরম দয়ালু ও দয়াবান আল্লাহ্র নামে শুরু করছি)। আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নাই। এবং মুহাম্মদ (সঃ) আল্লাহ্র রসুল। আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন সাধক ফয়জুল্লাহ্ আল্লাহ্র জন্য একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। সঠিক বিশ্বাস লাভের

Dhaka University Institutional Repository

উদ্দেশ্যে এ মসজিদ উপসনাকারীদের জন্য নির্ভরযোগ্য উসিলায় পরিণত হোক। সুশোভিত বেহেশতের প্রাসাদের ন্যায় এ মসজিদ শান্তির স্থলে পরিণত হোক।

উক্ত ইবাদত খানার তারিখের ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ অর্থ আমি হৃদয়ঙ্গম করলাম। নিশ্চয় এটি আল্লাহ্‌র ঘরের নিরাপদ আশ্রয় এবং সত্যনিষ্ঠ লোকের জন্যে জামে মসজিদ। ১১৬০ হিজরী।" [২১০]

মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে (চিত্র–৯২)। মসজিদের ছাদে একটি গম্বুজ রয়েছে। গম্বুজের শীর্ষে পদ্মপাপড়ির ফিনিয়াল বিদ্যমান।

মসজিদের পশ্চিম দিকের পেছনের দেয়ালের মধ্যবর্তীস্থলে মিহ্‌রাবের বর্ধিত অংশ রয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগটি প্রশস্ত। অভ্যন্তর ভাগের পশ্চিম দিকের দেয়ালে তিনটি মিহ্‌রাব রয়েছে। মধ্যবর্তী মিহ্‌রাবটি প্রধান এবং আকৃতিতে প্রায় অষ্টভূজি। প্রধান মিহ্‌রাবটি বেশ প্রশস্ত এবং এর ভিতরই দু'টি ধাপের একটি মিম্বার রয়েছে। প্রধান মিহ্‌রাবের দু'পাশের দেয়ালে দু'টি কুলুঙ্গি (niches) করা রয়েছে, অনুরূপ কুলুঙ্গি মসজিদের পূর্ব দিকের প্রধান প্রবেশ পথের দু'পাশেও লক্ষ্য করা যায়, তবে এদিকের কুলুঙ্গিতে বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা হয়েছে। মসজিদের ছাদটি বেশ উচু। ঢাকার অপরাপর মুঘল মসজিদগুলোর ছাদের এতটা উচ্চতা লক্ষ্য করা যায়নি। বস্তুতঃ মসজিদের এই ছাদটি নির্মিত হয়েছে এক বিশেষ কৌশলে। মসজিদের ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি গম্বুজ এবং গম্বুজের দু'পাশে দু'টি ভল্ট আকৃতির অর্ধগম্বুজ রয়েছে। মূলতঃ এই ছাদ নির্মাণ রীতিটি মসজিদটিকে ঢাকার অপরাপর মসজিদ অপেক্ষা স্বাতন্ত্র দান করেছে। ঢাকার অপরাপর দ্বিতল মসজিদ গুলোর অধিকাংশই তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এবং কেবল একটি পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট (করতলাব খান মসজিদ)। উল্লেখ্য যে, আজিমপুর মসজিদটি যে বিশেষ রীতিতে নির্মিত সেই রীতির মসজিদ কেবল ঢাকাতেই নয় বরং ভারতীয় উপমহাদেশের আর কোথাও দ্বিতীয়টি নেই।[২১১] ভারতের বাইরে তুরস্কের অটোম্যান যুগের স্থাপত্যে এ রীতির মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। সেখানে কোন কোন মসজিদে মধ্যবর্তী গম্বুজের দু'পাশে দুই এর অধিক অর্ধগম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। তুরস্কের অটোম্যান যুগের এ রীতির মসজিদ নির্মাণের ধারণা বাংলাদেশে এসেছে সম্ভবতঃ মুঘলযুগে ঢাকায় আগত আর্মেনীয়দের মাধ্যমে অথবা ভাগ্যেন্বষণে আগত অটোম্যান কারিগরদের মাধ্যমে।[২১২] প্রকৃতপক্ষে নতুন এই ভাবধারাটি যে প্রকারেই এখানে আসুক না কেন তা মসজিদটিকে যে একটি বিশেষত্ব দান করেছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে গম্বুজের শীর্ষে এবং চার কোনার স্কুইঞ্জে প্লাস্টারের ওপর ফুলের নক্সা। করা হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে প্লাটফর্মের ওপর ১৯৭৬ সালে দু'টি তলা নির্মাণ করা হয়।[২১৩] উল্লেখ্য যে, মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত এ দু'টি তলার উচ্চতা মূল মসজিদের উচ্চতার সমান্তরাল। মূল মসজিদের ছাদ যথেষ্ট উচু থাকার কারণেই একই উচ্চতার মধ্যে দু'টি তলা নির্মাণ করা সম্ভব হয়। এই দুটি তলা নির্মাণের ফলে প্রধান গম্বুজের ড্রাম এবং পার্শ্ববর্তী অর্ধগম্বুজ দুটি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। দু'দিকের অর্ধগম্বুজের উপরও দু'টি কক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে। এই কক্ষগুলোর ভেতর থেকে গম্বুজের ড্রাম লক্ষ্য করা যায় (চিত্র–৯৩)।মসজিদের উত্তর দিকে প্লাটফর্মের সাথে সংযুক্ত করে পাঁচ তলা বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয়েছে। মসজিদের প্লটফর্মের নীচের ভল্ট আকৃতির কক্ষ গুলোর বিন্যাস মির্ধা মসজিদ অথবা এ রীতির অপরাপর মসজিদ অপেক্ষা ভিন্নতর। এই মসজিদের ভল্ট আকৃতির কক্ষ গুলোর পরিধি খুব ছোট নয় এবং কক্ষ গুলোর ছাদের উচ্চতাও খুব নীচু নয়। কক্ষ গুলোর বিন্যাস হয়েছে প্লাটফর্মের পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে। কক্ষগুলোর অবস্থা বেশ ভাল।

সামগ্রিক বিচারের বলা যায় আজিমপুর মসজিদে নির্মাতার ব্যতিক্রম ধর্মী রুচি বোধটি সুস্পষ্ট হয়ে প্রকাশ

Dhaka University Institutional Repository

পেয়েছে। ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোর অধিকাংশই প্রায় একই প্রকার বলা যায়, তার মধ্যে আজিমপুর মসজিদটি একটি বৈচিত্র এনেছে। এই মসজিদের ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে যে কৌশল নেয়া হয়েছে তার বাস্তবায়ন হয়েছে সফলতার সাথে। নির্মাণ কাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত এত দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও ছাদটি অটুট রয়েছে।

প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্যে কোন নতুন ভাবধারার প্রবেশ করলেই চলেনা বরং এই ভাবধারার সফল বাস্তবায়নের মধ্যেই রয়েছে নতুন ভাবধারাটির সার্থকতা। প্রাসঙ্গত ঃ সুলতানী যুগে বাংলার আদিনা মসজিদের কথা (১৩৭৪–৭৫) বলা যায়। আদিনা মসজিদে একটি নতুন ধারার আত্মপ্রকাশ ঘটে, মসজিদের কেন্দ্রিয় nave ভল্ট আকৃতির নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ভল্ট নির্মাণে সে সময় বাংলায় কারিগরী কুশলতা অর্জিত হয়নি। ফলে ভল্টটি স্থায়িত্ব অর্জনে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে আজিমপুর মসজিদে ছাদ নির্মানে নতুন ধারার সূচনা হলেও তার সফল বাস্তবায়ন হয়েছে। এজন্য ধারণা করা যায় যে, এই মসজিদ নির্মাণে সম্ভবতঃ বহিরাগত কারিগরী নির্দেশনা ছিল।

পাদটীকা ঃ–

১. Ahmed Hasan Dani, *Dacca, A Record of its Changing Fortune*, Dhaka, 1962, p, 204

২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪

৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪

৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪

৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪

৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০৪

৭. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে ঢাকা*, ঢাকা, ১৯১০, পৃঃ ১৮৬

৮. Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal*. Dhaka, 1992, p, 132

৯. ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহিম, ডঃ আব্দুল মমিম চৌধুরী, ডঃ এ, বি, এম মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *'বাংলাদেশের ইতিহাস'* ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ; ২৫৪

১০. A. Karim, *Corpus*, p, 132

১১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

১৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

১৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

১৬. Sayed Aulad Hasan, *Notes on the Antiquitis of Dacca*, Dhaka, 1904, p, 27-28

১৭. A. Karim, *Corpus*, p, 131

১৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩২

Dhaka University Institutional Repository

১৯. S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka,* Dhaka, 1956, p, 34

২০. Dani, Dacca, p, 204

২১. আহমদ হাসান দানির *Dacca*, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) আদি মসজিদের পশ্চিম দেয়াল অটুট থাকার কথা উল্লেখ রয়েছে।

২২. Parween Hasan, 'Eight Sultanate Mosques of Dhaka,' *Islamic Art Heritage of Bangladesh,* UNESCO, 1984, p, 181

২৩. মোঃ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা*, ঢাকা, ১৯৮৭, পৃঃ ৩৯৬

২৪. Parween Hasan, *Islamic Art*, p, 181

২৫. S. A. Hasan, *Notes,* p, 27-28

২৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭–২৮

২৭. S. A. Hasan, *Notes,* 1904, p, 83

২৮. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩৩৪

২৯. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 83

৩০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯১

৩১. S. M Taifoor, *Glimpses,* p, 83

৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩

৩৩. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ১৯১

৩৪. S. A. Hasan, *Notes,* p, 83

৩৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৮৩

৩৬. আওলাদ হাসান তার গ্রন্থে (১৯০৪ সালে প্রকাশিত) উল্লেখ করেন যে, প্রায় এক বছর আগে পুরো মসজিদটি ভেঙ্গে পড়ে'। দ্রষ্টব্য ঃ Aulad Hasan, *Notes,* p, 34

৩৭. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩৩৪–৩৫

৩৮. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ২০৭–১০

৩৯. S. M. Taifoor, *Glimpses,* p, 78-80

৪০. Abdul Karim, *Corpus,* p, 190-91

৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯০–৯১

৪২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৭

৪৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫১৭

৪৪. Taifoor, Glimpses, P, 78-80

৪৫. S. A. Hasan, *Notes,* p, 27

৪৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭

৪৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭

৪৮. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃ ঃ ১৮৩

৪৯. S. A. Hasan, *Notes,* p, 27

Dhaka University Institutional Repository

৫০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৭

৫১. Dani, *Dacca,* p, 203

৫২. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৪৩

৫৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৩

৫৫. Dani, *Dacca,* p, 203

৫৬. S. M. Hasan, *Dacca, Gateway to the East,* Dhaka, 1983, p, 12

৫৭. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৫৮. Nazimuddin Ahamed, *The Mughal Monuments of Dhaka,* Dhaka, 1984, p, 167

৫৯. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ১৬৭

৬০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ২০২

৬১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০২

৬২. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০২

৬৩. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৬৪. S. M. Hasan, *Dacca,* p, 10

৬৫. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৬৬. S. A. Hasan, *Notes,* p, 20

৬৭. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৬৮. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃ ঃ ২০২

৬৯. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৭০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃ ঃ ২০২

৭১. প্রাগুক্ত, পৃ ঃ ২০২

৭২. S. A. Hasan, *Notes,* p, 20

৭৩. Dani, *Dacca,* p, 213-14

৭৪. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩৭০

৭৫. Dani, *Dacca,* p, 190-91

৭৬. S. A. Hasan, *Notes,* p, 29-30

৭৭. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ১৮৭-৯০

৭৮. S. A. Hasan, *Notes,* p, 29-30

৭৯. Dani, *Dacca,* p, 190-91

৮০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ১৮৭-৯০

৮১. A. H. Dani, *Muslim Architecture in Bengal,* Dhaka, 1961, p, 194-95

৮২. Dani, *Dacca,* p, 190-91

Dhaka University Institutional Repository

৮৩. Dani, *Muslim Architecture*, p, 194-95

৮৪. Dani, *Dacca*, p, 190-91

৮৫. বিষয়টি তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে সংগৃহীত।

৮৬. Md. Abdul Bari, 'Mughal mosques of Dhaka: A Typological study,' in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka, 1991, p, 324

৮৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৬

৮৮. A. H Dani, *Dacca*, p, 205

৮৯. S. M. Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh*, Dhaka, 1971, p, 63

৯০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৮৬

৯১. Dani, *Dacca*, p,205

৯২. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৮৬

৯৩. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৬

৯৪. স্যার চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, শাহ্‌মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনূদিত), ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১৯

৯৫. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ১৮৪

৯৬. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 149

৯৭. S. A. Hasan, *Notes*, p, 18

৯৮. S. A. Hasan, *Notes*, p, 18

৯৯. A. H. Dani, *Dacca*, p, 190

১০০. S. M. Hasan, *Muslim Monuments*, p, 56

১০১. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯৫-৯৬

১০২. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 149

১০৩. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ৩৩২

১০৪. S. A. Hasan, *Notes*, p, 41

১০৫. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 213-14

১০৬. A. H. Dani, *Dacca*, p, 220-21

১১৭. রহমান আলী তায়েস *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ২০৫-৬

১০৮. S. A. Hasan, *Notes*, p, 41

১০৯. S. M. Hasan, *Glimpses of Muslim Art & Architicture*, Dhaka, 1983, p, 182

১১০. Dani, Dacca, p, 220-21

১১১. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ২০৫-৬

১১২. Nazimuddin Ahmed, *The Mughal Monuments of Dhaka*, Dhaka, 1984, p. 177

১১৩. S. A. Hasan, *Notes*, p, 22

Dhaka University Institutional Repository

১১৪. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯১-১৯২

১১৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১-১৯২

১১৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯১-১৯২

১১৭. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 147-48

১১৮. Dani, *Dacca*, p, 202

১১৯. Taifoor, *Glimpses*, p, 147-48

১২০. S. A. Hasan, *Notes*, p, 22

১২১. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯১-৯২

১২২. Taifoor, *Glimpses*, p, 147-48

১২৩. S.M. Hasan, *Dacca*, p, 11

১২৪. S. A. Hasan, *Notes*, p, 11

১২৫. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯৫

১২৬. Dani, *Muslim Architecture, p, 198*

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৮

১৩০. S. A. Hasan, *Notes*, p, 28-29

১৩১. Dani, *Dacca*, p, 173-74

১৩২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৩-৭৪

১৩৩. S. A. Hasan, *Notes*, p, 28-29

১৩৪. Dani, *Dacca*, p, 173-74

১৩৫. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৮৬-৮৭

১৩৬. Nazimuddin Ahmed, *Mughal Monuments*, p, 176-77

১৩৭. Dani, *Dacca*, p, 173-74

১৩৮. Md. Abdul Bari, *Dhaka*, p, 322

১৩৯. বিষয়টি মসজিদের বর্তমান মুতাওয়াল্লী জনাব আলী মিয়ার কাছ থেকে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে নেয়া হয়েছে।

১৪০. Dani, *Dacca*, p, 175

১৪১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫

১৪২. S. M. Hasan, *Muslim Monuments*, p, 60

১৪৩. দানির *Dacca*, গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ হয় ১৯৬২ সালে। তার গ্রন্থে সাম্প্রতিক কালের সংস্কারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

১৪৪. Dani, *Dacca*, p, 175

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৭৫

Dhaka University Institutional Repository

১৪৬. S. M. Hasan, *Glimpses*, p, 187

১৪৭. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ৩১৩–১৪

১৪৮. S. M. Taifoor, *Glimpses*, p, 167

১৪৯. S. A. Hasan, *Notes*, p, 40-41

১৫০. চার্লস ড'য়লী, ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন, শাহ্‌মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২০

১৫১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২০

১৫২. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃ; ২০৭

১৫৩. Dani, *Muslim Architecture*, p, 200

১৫৪. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ৩০৬

১৫৫. Dani, *Dacca*, p, 218

১৫৬. প্রাগুক্ত, পৃ; ২১৮

১৫৭. Md. Abdul Bari, *Dhaka*, p. 320-21

১৫৮. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০–৩২১

১৫৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২০–৩২১

১৬০. Dani, *Dacca*, p, 216-17

১৬১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১৬–১৭

১৬২. S. M. Hasan, *Glimpses*, p, 182

১৬৩. মসজিদের ইমাম জনাব নুরউদ্দীনের সাথে সাক্ষাৎ কারের মাধ্যমে গৃহীত।

১৬৪. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ৪৮–৪৯

১৬৫. তথ্যটি মসজিদ কমিটির সেক্রেটারীর সাথে সাক্ষাৎ কারের মাধ্যমে গৃহীত।

১৬৬. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ২২২

১৬৭. মুয়াজ্জিন জনাব ফেকু মিয়ার সাথে সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছে।

১৬৮. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা*, পৃঃ ২২২

১৬৯. A. H. Dani, *Dacca*, p-188

১৭০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে*, পৃঃ ১৯৫–৯৬

১৭১. S. A. Hasan, *Notes*, p, 25

১৭২. S. M. Hasan, *Glimpses*, p, 184-85

১৭৩. S. A. Hasan, *Notes*, p, 25

১৭৪. S. M. Hasan, *Glimpses*, p, 184-85

১৭৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৪–৮৫

১৭৬. Dani, *Dacca*, p, 188-89

১৭৭. Roxana Hafiz, 'Khan Md. Mridha's Mosque', in *Architecture and Urban conservaton in the Islamic world*, published by Aga khan trust for culture, Switzerland, 1990, p, 134

Dhaka University Institutional Repository

১৭৮. S. M. Taifoor, *Glimpses,* p, 227-28

১৭৯. Md. Bari, *Dhaka,* p, 326

১৮০. Abdul Karim, 'The Inscription of Khan Muhammad Mirdha's mosque of Dhaka, *Journal of the Asiatic Society of Pakistan.*' Vol -ix, No- 2, Dhaka, 1966, p, 144

১৮১. Md. Bari, *Dhaka,* p, 326

১৮২. A. H. Dani, *Muslim Architecture,* p, 202-3

১৮৩. S. M. Taifoor, *Glimpses,* p, 237-38

১৮৪. দানির গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯৬২) উল্লেখ রয়েছে যে, সম্প্রতি মসজিদের পূর্ব দিকে একটি বারান্দা নির্মিত হয়েছে। Dani, *Dacca,* p, 191-92

১৮৫. S. M. Taifoor, *Glimpses,* p, 237-38

১৮৬. S. A. Hasan, *Notes,* p, 11

১৮৭. Dani, *Dacca,* p, 187

১৮৮. S. M. Taifoor, *Glimpses,* p, 227

১৮৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭.

১৯০. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭

১৯১. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২৭

১৯২. A. B. M. Husain, *Fathpur-Sikri and its Architecture,* Dhaka, 1970, p, 92-93

১৯৩. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩৬৫

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৬৫

১৯৫. Dani, *Dacca,* p, 212

১৯৬. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২

১৯৭. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২১২

১৯৮. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩৩৭

১৯৯. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪২

২০০. Khaleda Rashid, 'Mosques of Dhaka', in *The Daily Star,* March, 17th, Dhaka, 1995

২০১. Dani, *Dacca,* p, 195

২০২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৫

২০৩. Md. Abdul Bari, *Dhaka,* p, 331

২০৪. Dani, *Dacca,* p, 193-95

২০৫. প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯৩–৯৫

২০৬. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৪৫

২০৭. Dr. Enamul Haque, *Glimpses of the Mosques of Bangladesh,* Dhaka, 1985, p, 5

২০৮. মোঃ আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৪৫

২০৯. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ২২৬–২৭

Dhaka University Institutional Repository

২১০. রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে,* পৃঃ ২২৬–২৭

২১১. Md. Abdul Bari, *Dhaka,* p, 324

২১২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩২৪

২১৩. আব্দুর রশীদ, *মসজিদ নির্দেশিকা,* পৃঃ ৩২৯–৩০

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সুলতানী ও মুঘলযুগের মসজিদ স্থাপত্যের রীতিগত বিন্যাস

ঢাকায় পুরানো যেসব মসজিদ রয়েছে তার অধিকাংশই মুঘল যুগের। সুলতানী যুগের কেবল তিনটি মসজিদের অস্তিত্ব বর্তমানে পাওয়া যায়। এসব টিকে থাকা মসজিদে সংস্কার ও সম্প্রসারণের নামে মূল বৈশিষ্ট্যের ব্যপক পরিবর্তন ঘটেছে। ফলে এই সকল মসজিদের কোনটিকেই আমরা সম্পূর্ণ আদি রূপে পাইনা। তথাপি মসজিদগুলোর আদি বৈশিষ্ট্যের যতটুকু এখনো রয়েছে তা থেকে মসজিদগুলোর নির্মাণের রীতিগত বিভিন্নতা কিছুটা অনুধাবন করা যায়।

সুলতানী যুগের মসজিদ

সুলতানী যুগের তিনটি মসজিদের কথা বলা যায়–

(১) বিনত বিবির মসজিদ (১৪৫৬)
(২) নসওয়ালা গলির মসজিদ (১৪৫৯)
(৩) মিরপুর মাজার মসজিদ (১৪৮০)

এই তিনটি মসজিদের মধ্যে নসওয়ালা গলির মসজিদের আদিরূপ সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়েছে, এখন এটি নতুন ভাবে নির্মিত সম্পূর্ণ আধুনিক একটি মসজিদ। তবে আদিতে মসজিদটি কিরূপ ছিল সে সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

বিনত বিবির মসজিদের ব্যপক পরিবর্তন হলেও এর আদি বৈশিষ্ট্যের কিছুটা এখনো অনুধাবন করা যায়। মিরপুর মাজার মসজিদের বর্তমানরূপে মুঘল যুগের স্থাপত্যের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। তথাপি, এর আদি বৈশিষ্ট্যের মুল কাঠামো বোঝা যায়। এই তিনটি মসজিদের সামগ্রিক মূল্যায়ন করে বলা যায় রীতিগত ভাবে তিনটি মসজিদের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। তিনটি মসজিদই এক গম্বুজ বিশিষ্ট। বিনত বিবির মসজিদ ও মিরপুর মসজিদ বর্গাকৃতির তবে নসওয়ালাগলির মসজিদটি আকৃতিতে কিছুটা আয়তাকার।

ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুলতানী যুগে বিভিন্ন রীতির মসজিদ লক্ষ্য করা গেলেও ঢাকায় বিভিন্ন রীতির মসজিদ আদৌ নির্মিত হয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যায় না মূলতঃ ঢাকায় সুলতানী যুগের মসজিদের স্বল্পতার কারণে।

মুঘলযুগের মসজিদ

ঢাকায় অবস্থিত মুঘল যুগে নির্মিত মসজিদগুলোর মধ্যে বেশ কয়েকটি রীতি লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ঃ

সুলতানী যুগে এ রীতির মসজিদ অধিক জনপ্রিয় ছিল। মুঘলযুগেও ঢাকায় এ রীতির মসজিদ নির্মিত হয়। যেমন, মুহাম্মদপূরের আল্লাকুরী মসজিদ (১৬৮০), নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদ (১৬৮৫), চকবাজারের কারাগার মসজিদ (১৭১৪), নারিন্দার হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদ (১৬৬৪) এই রীতির নির্মিত মসজিদের দৃষ্টান্ত।

Dhaka University Institutional Repository

এই মসজিদগুলোর মধ্যে আল্লাকুরী ও হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদ বর্গাকৃতির হলেও কারাগার মসজিদ ও নিমতলী মসজিদ আকৃতিতে আয়তাকার। শেষোক্ত মসজিদ দু'টিতে একটি গম্বুজ এবং গম্বুজের দু'পাশে স্বল্পপরিসরের অর্ধগম্বুজ নিয়ে ছাদটি গঠিত হয়েছে।

(২) তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদ ঃ

ঢাকায় এ রীতির অনেকগুলো মসজিদ রয়েছে। গম্বুজের আকৃতিগত দিক থেকে এ রীতির মসজিদকে দু'টি ভাগে বিন্যস্ত করা যায়।

(ক) সমান আকৃতির তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ঃ এ রীতির মসজিদের তিনটি গম্বুজই সমান আকৃতির। হাজী খাজা শাহ্বাজ মসজিদ (১৬৭৯) এ রীতির মসজিদের অন্তর্গত। উল্লেখ্য যে, ঢাকায় এ রীতির কেবল মাত্র একটি মসজিদই বর্তমানে রয়েছে।

(খ) মধ্যবর্তী গম্বুজটি বড় ঃ মসজিদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজটি বড় করে নির্মাণ করা হয় এবং পার্শ্ববর্তী দু'টি গম্বুজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির হয়। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদই এই রীতির অন্তর্ভূক্ত। যেমন, ইসলাম খানের মসজিদ (১৬১০–১৩), শায়েস্তা খানের মসজিদ (১৬৬৪–৭৮). হাজী বেগ মসজিদ (১৬৪২), খাজা অম্বর মসজিদ (১৬৭৭–৭৮), লালবাগ দূর্গ মসজিদ (১৬৭৮–৭৯), সাত গম্বুজ মসজিদ (১৬৮০), মরিয়ম সালেহা মসজিদ (১৭০৬) বড় ভাট মসজিদ (১৬৮৮), তারা মসজিদ (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত) প্রভৃতি সকল মসজিদেই মধ্যবর্তী গম্বুজটি বড় ও প্রধান করে নির্মাণ করা হয়।

(৩) উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদ ঃ

এ রীতির মসজিদে সাধারণতঃ উচু প্লাটফর্মের উপর পশ্চিম দিকে মসজিদটি স্থাপন করা হয়। এক অর্থে এ রীতির মসজিদকে দ্বিতল মসজিদও বলা যায়। কারণ প্লাটফর্মের নীচে অনেক ক্ষেত্রেই ভল্ট আকৃতির কক্ষ সন্নিবেশিত থাকে। সুলতানী যুগে ঢাকা অথবা বাংলাদেশের কোথাও দ্বিতল মসজিদের কোন উল্লেখ না পাওয়া গেলেও সুলতানী যুগে দিল্লীতে ফিরুজশাহ্ তুঘলকের সময় খিড়কী মসজিদ (১৩৭৫), এবং কালান মসজিদ (১৩৭৫), নামে দু'টি দ্বিতল মসজিদ নির্মিত হয়।
ঢাকায় যে কয়টি দ্বিতল মসজিদ রয়েছে তার মধ্যেও কিছুটা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায় ঃ

(ক) উচু প্লাটফর্মের ওপর আয়তাকার তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে।এই রীতির মসজিদের তিনটি গম্বুজের মধ্যবর্তী গম্বুজটি প্রশস্ত। চক মসজিদ (১৬৭৬), মির্ধা মসজিদ (১৭০৪) মুসা খানের মসজিদ (১৬৭৯), খাজা অম্বর মসজিদ (১৬৭৭–৭৮) এই রীতির অন্তর্গত।

(খ) উচু প্লাটফর্মের ওপর বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। যেমন, গোর–ই–শাহী মসজিদ (১৭২৬)।

(গ) উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের একমাত্র দৃষ্টান্ত ঢাকার বেগম বাজারস্থ করতলাব খানের মসজিদ (১৭০০–৫)। এই মসজিদের ছাদে মধ্যবর্তী স্থানে একটি বড় গম্বুজ এবং দু'পাশে দু'টি করে ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ সর্বমোট পাঁচটি গম্বুজ সুবিন্যস্ত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ঢাকার দ্বিতল মসজিদের মধ্যে একটি ব্যতিক্রম ধর্মী মসজিদ হচ্ছে আজিমপুর মসজিদ (১৭৪৬)।মধ্যবর্তীস্থলে একটি বড় গম্বুজ এবং দু'পাশে দু'টি অর্ধগম্বুজ নিয়ে মসজিদের ছাদ গঠিত হয়েছে। এই রীতির মসজিদ সমগ্র উপমহাদেশে একটি মাত্র রয়েছে।

উল্লেখিত দ্বিতল মসজিদ গুলোর সবগুলোতে প্লাটফর্মের নীচে ভল্ট আকৃতির কক্ষ সন্নিবেশিত রয়েছে। তবে প্লাটফর্মের নীচে কক্ষ নেই এমন একটি মসজিদ হচ্ছে ঢাকার চকবাজার মসজিদ (১৬৭৬)। দ্বিতল মসজিদগুলোর নীচতলার ভল্ট আকৃতির কক্ষগুলোর ব্যবহার ছিল নানাবিধ। মির্ধা মসজিদের মাদ্রাসা হিসেবেও একটি ভূমিকা ছিল। ফলে, নীচতলার কক্ষগুলো এই মাদ্রাসার ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আবার কোন মসিজেদে নীচতলার কক্ষগুলো দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। করতলাব খানের মসজিদে নীচতলার কক্ষগুলো প্রধানত দোকানের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়।

(৪) চৌচালা ছাদ বিশিষ্ট মসজিদ ঃ

মুঘল যুগে ঢাকায় চৌচালা চাল বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হয়। বর্তমানে ঢাকায় এ রীতির দু'টি মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এর একটি চুড়িহাট্টা মসজিদ (১৬৪৯)। অবশ্য এর চৌচালা ছাদ সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ কালে ভেঙ্গে সমান্তরাল করে দোতলা নির্মাণ করা হয়েছে।
এ রীতির অপর নিদর্শন আরমানিটোলা মসজিদ (১৭৩৫)। এর ছাদটি তার আদি বৈশিষ্ট্য নিয়ে অক্ষুন্ন রয়েছে। ঢাকার কোন কোন মসজিদে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট কক্ষ সংযুক্ত হয়েছে। করতলাব খানের মসজিদের উত্তর দিকে একটি দোচালা কুটিরের অনুরূপ কক্ষ সংযুক্ত হয়েছে। হাজী খাজা শাহ্বাজের সমাধিতে অনুরূপ দোচালা কক্ষ সমাধির দক্ষিণ দিকে সংযুক্ত হয়েছে।

(৫) আয়তাকার আট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ ঃ

সুলতানী যুগে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ নির্মিত হলেও (ষাট গম্বুজ মসজিদ ১৪৫০, ছোট সোনা মসজিদ ১৪৯৩–১৫১৯) মুঘল যুগে ঢাকায় অথবা বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে বহু গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ কমই নির্মিত হয়েছে ।
করতলাব খান মসজিদটি ঢাকায় পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের একমাত্র দৃষ্টান্ত। অনুরূপ ভাবে বংশাল জামে মসজিদটি ঢাকার আট গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের একমাত্র উদাহরণ। এই মসজিদের প্রধান প্রার্থনা কক্ষে তিনটি এবং পূর্ব দিকের বারান্দার ছাদে পাঁচটি সর্বমোট আটটি গম্বুজ বিন্যস্ত হয়েছে। মসজিদের নির্মাণ কাল সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বলে অনুমান করা যায়।

(৬) সমান্তরাল ছাদ বিশিষ্ট মসজিদঃ

ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোর মধ্যে একটি মসজিদের ছাদ গম্বুজ বিহীন সমান্তরাল ভাবে নির্মাণ করা হয়। লালবাগ দূর্গের নিকটবর্তী ফররুখ শিয়ার মসজিদের (১৭০৩–৬) সমান্তরাল ছাদ নির্মানে আদিতে কাঠের বীম ও তক্তা ব্যবহার করা হয়। মসজিদটি সুপ্রশস্ত। ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুপরিসর মসজিদের

Dhaka University Institutional Repository

ছাদে একাধিক গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে (বাগের হাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ) ফলে, ঢাকার ফররুখ শিয়ার মসজিদের সমান্তরাল ছাদ স্বভাবতই কৌতুহল উদ্দীপক।

সুতরাং ঢাকায় অবস্থিত পুরাতন মসজিদের রীতিগত শ্রেনীবিন্যাস থেকে এ বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, এখানে মুঘল যুগে প্রধানতঃ তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আয়তাকার মসজিদই অধিক জনপ্রিয় ছিল। প্রাক শায়েস্তা খানি, শায়েস্তা খানি, এমন কি শায়েস্তাখান–উত্তর রীতিতেও এই প্রকৃতির মসজিদই প্রাধান্য পেয়েছে। সেই সাথে উচু প্লাটফর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদও ঢাকায় বেশ কয়েকটি নির্মিত হয়।ঢাকার মুঘল মসজিদগুলোর মধ্যে ব্যতিক্রম ধর্মী মসজিদ হিসেবে করতলাব খান মসজিদ এবং আজিমপুর মসজিদকে চিহ্নিত করা যায়।

উল্লেখ্য যে, ঢাকায় মুগলযুগের এমন কিছু মসজিদ রয়েছে যার মধ্যে আদি বৈশিষ্ট্যের কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নেই, সমগ্র মসজিদই আধুনিক রূপ পরিগ্রহ করেছে। যেমন, জিন্দাবাহার জামে মসজিদ(১৬১২), হায়াৎ ব্যপারী মসজিদ (১৬৬৪), নবরায় লেন মসজিদ (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে নির্মিত), মগবাজার মসজিদ (১৬৭০), আমলীগোলা মসজিদ (১৬৭৬)।

এই মসজিদগুলোকে যদি আমরা আদিরূপে পেতাম তাহলে মসজিদের রীতিগত শ্রেণী বিন্যাস আরো সমৃদ্ধ হতো।

অনুরূপভাবে স্যার চার্লস ড'য়লীর "এন্টিকুইটিজ অফ ঢাকা" গ্রন্থের উল্লেখ করে বলা যায় যে, এই গ্রন্থে পুরাতন অনেক মসজিদের স্কেচ ও বর্ননা রয়েছে। যদিও ড'য়লী বলেছেন যে, ১৮০১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে ঢাকায় ২৩৩টি মসজিদ রয়েছে, তথাপি তিনি তার গ্রন্থে সর্বমোট ৭ টি মসজিদের উল্লেখ করেন। এই মসজিদগুলো যে সকল স্থানে অবস্থিত ছিল তা হচ্ছে–

চকবাজার, বেগম বাজার, রহমতগঞ্জ, মুহাম্মদপুর, মগবাজার, টঙ্গি।

উল্লেখ্য যে, তিনি চকবাজারে দু'টি মসজিদের কথা বলেন। এর একটি বর্তমানের চকবাজার শাহী মসজিদ। তাঁর উল্লেখিত মসজিদগুলোর মধ্যে কেবল সাতগম্বুজ মসজিদ ও চকবাজার মসজিদ ব্যতীত বর্তমানে আর কোন মসজিদেরই অস্তিত্ব নেই। অবশ্য উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ড'য়লী এসব মসজিদের অধিকাংশই ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। প্রকৃতপক্ষে ইমারত নির্মাণের উপকরণের ক্ষণস্থায়ীত্ব (Less-durability) এবং যথার্থ সংরক্ষণের অভাবের ফলে আমাদের অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন সমূহের অনেক কিছুই আজ বিস্মৃতির অতল তলে হারিয়ে গেছে।

সুলতানী ও মুঘলযুগের মসজিদ স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য

রীতিগত ভাবে বিন্যস্ত সুলতানী ও মুঘলযুগের মসজিদগুলোর স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে, সুলতানী যুগের যে তিনটি মসজিদের পরিচয় পাওয়া যায় তার মধ্যে একমাত্র বিনত বিবির মসজিদেই আদি বৈশিষ্ট্যের কিছুটা বর্তমান রয়েছে। সুলতানী যুগের যেসব বৈশিষ্ট্য মসজিদটির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে ঃ (১) মসজিদের চওড়া দেয়াল; (২) বাকানো প্যারাপেট; (৩) ড্রাম বিহীন অর্ধবৃত্তাকার গম্বুজ; (৪) গম্বুজ বসানোর ক্ষেত্রে করবেল পেনডেনটিভ ব্যবহৃত হয়েছে এবং (৫) অষ্টভুজী কর্নার টাওয়ার।

Dhaka University Institutional Repository

প্রকৃতপক্ষে সুলতানী যুগে বাংলার মসজিদ স্থাপত্যের যে সকল বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তার কতটা বিনত বিবির মসজিদে প্রতিভাত হয়েছিল এখন তা বোঝা যায় না। কারণ, মসজিদের সংস্কার ও পরিবর্ধন করে আদি বৈশিষ্ট্যের অনেক কিছুই বিনষ্ট করে ফেলা হয়েছে। বাংলার স্থাপত্যের অলংকরণে টেরাকোটা বিশেষ স্থান দখল করে আছে, ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে সুলতানী যুগের মসজিদে এই টেরাকোটা অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু বিনত বিবির মসজিদে আদিতে টেরাকোটা অলংকরণ করা হয়েছিল কিনা তা এখন বোঝার উপায় নেই। মসজিদের গায়ে বর্তমানে পলেস্তরার আবরণ পড়েছে। এছাড়া মসজিদে মুঘল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের কিছু বিষয় সংযোজিত হয়েছে। যেমন, মসজিদের বাকানো প্যারাপেটে এবং গম্বুজের ভেতরের দিকের নিম্নাংশে মার্লন অলংকরণ মূলতঃ মুঘল যুগের স্থাপত্যের একটি বৈশিষ্ট্য।

মিরপুর মাজার মসজিদকে দৃশ্যতঃ সুলতানী যুগের স্থাপত্য বলে মনে হয় না, বর্গাকৃতির এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের খুঁটিনাটি সকল বিষয়ে মুঘল স্থাপত্যের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত হয়। একমাত্র আরবী ও ফার্সী শিলালিপি দু'টি প্রমাণ করছে এটি সুলতানী যুগের একটি স্থাপত্য কর্ম।

মুঘলযুগের মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য

ঢাকায় মুঘল যুগের মসজিদ সংখ্যায় বেশী এবং সুলতানী যুগের মসজিদের তুলনায় এদের অবস্থা উত্তম থাকায় এযুগের মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যগুলো অধিক স্পষ্টরূপে লক্ষ্য করা যায়।

(১) প্লাস্টারের ব্যবহার ঃ

সুলতানী যুগের অনুরূপ মুঘল যুগের মসজিদ গুলোতেও ইট স্থাপত্য নির্মাণের প্রধান উপকরণ হিসেবে ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু মুঘল যুগে চুন সুরকী মিলিয়ে পলেস্তরা তৈরী করে ইমারতের গায়ে ব্যবহার করা হয়। প্রতিটি মুঘল ইমারতেই পলেস্তরা ব্যবহৃত হয়। ফলে ইমারতের গায়ে একটা মসৃণভাব আসে।

(২) সমান্তরাল প্যারাপেট ঃ

সুলতানী যুগের স্থাপত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য ইমারতের বাকানো প্যারাপেট ঢাকার মুঘল যুগের মসজিদে সম্পূর্ণ পরিহার করা হয়। এর পরিবর্তে মসজিদগুলোতে সমান্তরাল প্যারাপেট দেয়া হয়। ব্যতিক্রম হিসেবে ঢাকায় লালবাগ দূর্গের অভ্যন্তরে দরবার কক্ষের প্যারাপেট কিছুটা বাকানো লক্ষ্য করা যায়। ঢাকার বাইরে অবশ্য মুঘল যুগেও মসজিদে বাকানো প্যারাপেট নির্মিত হয়েছে (টাঙ্গাইলের আতিয়া মসজিদ। (১৬০৯)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, অনেকেই সুলতানী যুগের ইমারতের বাকানো প্যারাপেটকে ইমারতের সৌন্দর্য হিসেবে ব্যবহার করা ছাড়াও এর উপযোগীতা হিসেবে ব্যাখ্যা করেন বৃষ্টির পানি সহজে গড়িয়ে পরতে পারে। তবে বলা যায়, যদি কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হতো তাহলে ঢাকার মুঘল ইমারতেও সন্দেহাতীত ভাবে এই বাকানো প্যারাপেট ব্যবহৃত হতো।

(৩) ড্রামযুক্ত গম্বুজ ঃ

সুলতানী যুগের মসজিদগুলোতে মূলতঃ ড্রাম বিহীন গম্বুজ ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু মুঘল মসজিদে গম্বুজ বসানোর ক্ষেত্রে ড্রাম ব্যবহৃত হয়; ফলে গম্বুজগুলো উচু দেখায় এবং ইমারতের উচ্চতার সাথেও একটি সামঞ্জস্য বজায় থাকে। ড্রাম গুলো অষ্টভূজি আকৃতিতে নির্মিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৪) গম্বুজের আকৃতিগত পরিবর্তন ঃ

মুঘল যুগে গম্বুজগুলোর আকৃতিগত পরিবর্তন সুচিত হয়। গম্বুজের গায়ে শীর তোলা হয়। লালবাগ দূর্গ মসজিদের গম্বুজ আকৃতিতে কিছুটা bulbous এবং শীর (fluted) তোলা। ড'য়লীর গ্রন্থে অঙ্কিত মসজিদগুলোর চিত্রে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গম্বুজগুলো শিরতোলা দেখা যায়। এমনকি সাতগম্বুজ মসজিদের গম্বুজ গুলো আকৃতি আদিতে ভিন্নরূপ ছিল তা উপলব্ধি করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে মসজিদের গম্বুজ নীচু ও চ্যাপ্টা করে তৈরী (squat) করা হয়। যেমন, শায়েস্তা খানের মসজিদ, শাহ্বাজ খানের মসজিদ, ভাট মসজিদ। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় এযুগের গম্বুজগুলো দৃশ্যতঃ পরিপাটি ও চমৎকার।

(৫) কর্ণার টাওয়ার ঃ

সুলতানীযুগের মসজিদের কর্ণার টাওয়ার মুঘল যুগের মসজিদেও অব্যাহত থাকে। কারণ, স্থাপত্যে কর্ণার টাওয়ারের ব্যবহার হয় সম্পূর্ণ রূপেই কাঠামোগত (structural) কারনে। তবে এসময় কর্ণার টাওয়ারে বৈচিত্র আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। মসজিদগুলোর অষ্টভূজাকৃতি কর্ণার টাওয়ার গুলোর গায়ে স্বল্প দূরত্বে ব্যান্ডের মত গঠনশৈলী দেয়া হয়। কখনো কর্ণার টাওয়ারের নীম্নদেশ ফুলদানির (vase) মত আকৃতি দেয়া হয়। যেমনটি আজিমপুর মসজিদ, চক মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। কর্ণার টাওয়ারগুলোর শীর্ষে কিয়স্ক, কুপোলা বসিয়ে কর্ণার টাওয়ার গুলোকে আরো আকর্ষনীয় করে তোলা হয়। একটি বৈচিত্র ধর্মী কর্ণার টাওয়ার সাত গম্বুজ মাসজিদে লক্ষ্য করা যায়। প্রায় ১২ ফুট ব্যাসের দুটি স্তরে বিন্যস্ত এ মসজিদের কর্ণার টাওয়ার গুলো মুলতঃ ফাকা ভাবে নির্মিত হয় এবং কর্ণার টাওয়ারগুলোর শীর্ষে ক্ষুদ্রাকৃতির গম্বুজ বসানো হয়। কর্ণার টাওয়ার গুলোর এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য থাকার কারণে সমগ্র মসজিদে তা বৈচিত্র নিয়ে আসে।

(৬) বিভিন্ন আকৃতির খিলান ঃ

মুঘল যুগের মসজিদে four centred খিলানের অধিক প্রচলন হলেও একই সাথে বহুভাজ যুক্ত (multicusped), flat top প্রভৃতি বিভিন্ন ধরনের খিলান ব্যবহৃত হয়ে স্থাপত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে।

(৭) ইমারতের মধ্যবর্তীস্থানের প্রধান্য প্রতিষ্ঠা ঃ

ঢাকার মসজিদ গুলোতে মধ্যবর্তী স্থানকে প্রাধান্য দেয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যটি কেন্দ্রিয় স্থাপত্য রীতিতেও লক্ষ্যনীয়। এই উদ্দেশ্যে মসজিদের পূর্বদিকের দেয়ালের মধ্যবর্তী স্থান সম্মুখ দিকে কিছুটা বর্ধিত করে নির্মাণ (projected fronton) করা হয় এবং বর্ধিত অংশের দু'পাশে turret সংযুক্ত করে বর্ডার দেয়া হয়। বর্ধিত অংশের মধ্যে অবস্থিত প্রবেশ দ্বারকে প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়। একই উদ্দেশ্যে মধ্যবর্তী গম্বুজকেও প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়।

(৮) এলকভ বা অর্ধগম্বুজের ব্যবহার ঃ

কেন্দ্রিয় স্থাপত্যরীতির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঢাকার মুঘল স্থাপত্যেও লক্ষ্য করা যায়। এলকভ ব্যবহার করার ফলে একদিকে যেমন চওড়া দেয়ালে একটি হালকা ভাব আসে অন্যদিকে তা ইমারতের সৌন্দর্য বাড়ায়। প্রধানতঃ প্রবেশ পথের খিলান গুলো এলকভ বা অর্ধগম্বুজের (half dome) নীচে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া দেয়ালে কুলঙ্গি তৈরী (niches) করেও বৈচিত্র আনা হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(৯) ল্যাটারাল আর্চ ঃ

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মুঘল মসজিদগুলোর অভ্যন্তর ভাগ প্রধানতঃ দু'টি ল্যাটারাল আর্চ দিয়ে তিনটি 'বে'তে বিভক্ত করা হয়। কখনো এই ল্যাটারাল আর্চে multicusped আকৃতি ব্যবহার করে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়।খাজা শাহ্বাজ ও বংশাল মসজিদের ল্যাটারাল আর্চে একাধিক ভাজযুক্ত অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়।

(১০) ফিনিয়াল ঃ

গম্বুজ শীর্ষে ফিনিয়ালের অবস্থান মুঘল মসজিদে লক্ষ্য করা যায়। তবে এই ফিনিয়ালের নক্সা প্রতিটি মসজিদেই মোটামুটি একই রকম দেখা যায় অর্থাৎ পদ্মপাপড়ির নক্সার ওপর কলস ফিনিয়াল। ফিনিয়াল ব্যবহারের ফলে সামগ্রিক ভাবে গম্বুজ গুলো আকর্ষনীয় হয়েছে।

(১১) পাথরের ব্যবহার ঃ

পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার কারণে ঢাকার মসজিদে পাথরের ব্যবহার হয়েছে খুব সামান্যই। যে দু'একটি মসজিদে পাথর ব্যবহার হয়েছে তা মূলতঃ ইমারতের যেসব স্থানকে বেশী মজবুত করা প্রয়োজন সে স্থানেই। ঢাকার মসজিদ গুলোর মধ্যে শাহ্বাজ খানের মসজিদেই সর্বাধিক পাথরের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের পূর্ব দেয়ালের একেবারে নীম্নাংশে সমান্তরাল ভাবে পাথর বসনো হয় এবং এর মধ্যে ফুল পাতার নক্সা করা হয়। এছাড়া মসজিদের চৌকাঠে, মিহ্রাবে, মিম্বারে পাথর ব্যবহার করা হয়। খাজা অম্বর মসজিদ ও মুসা খানের মসজিদের প্রবেশদ্বারে এবং মিম্বারে পাথর ব্যবহৃত হয়েছে।

(১২) ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বৈচিত্র ঃ

ঢাকার মুঘল মসজিদ গুলোর মধ্যে কোন কোন মসজিদের ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছুটা বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। যেমন, নিমতলী মসজিদ এবং কারাগারের অভ্যন্তরের মসজিদের ছাদে গম্বুজের দু'পাশে স্বল্পপরিসরের অর্ধ গম্বুজের ন্যায় নির্মাণ করা হয়।

আজিমপুর মসজিদের ছাদে মধ্যবর্তী স্থানের বড় গম্বুজের দু'পাশে দু'টি অর্ধ গম্বুজ তৈরী করা হয়। চুড়িহাট্টা, আরমানিটোলার মসজিদের ছাদ চৌচালা কুটিরের চালের অনুরূপ তৈরী করা হয়।

(১৩) দোচালা কুটিরের সংযোজন ঃ

ঢাকার কোন কোন মসজিদে দোচালা কুটিরের অনুরূপ চাল বিশিষ্ট কক্ষ নির্মাণ করা হয়। যেমন, করতলাব খানের মসজিদের উত্তর দিকে দোচালা কুটিরের মত একটি কক্ষ সংযোজন করা হয়। একই ভাবে খাজা শাহবাজের সমাধিতেও দোচালা কুটিরের অনুরূপ কাঠামো লক্ষ্য করা যায়। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ঢাকার বাইরেও লক্ষ্য করা যায় (শাহ্ মুহম্মদের মসজিদ, এগার সিন্দুর, ১৬৮০)

(১৪) অলংকরণ ঃ

মুঘল যুগের ঢাকার মসজিদগুলোতে তেমন কোন অলংকরণ নেই বললে চলে। প্লাষ্টার করা ইমারতে নানা ধরনের প্যানেল করে কিছুটা বৈচিত্র আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। সুলতানী যুগে মসজিদের অলংকরণে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ (টেরাকোটা) ব্যবহৃত হয়। ফলে মসজিদ গুলো দৃশ্যতঃ চমৎকার ছিল। সুতরাং স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে মুঘলযুগে ঢাকার স্থাপত্যে কেন পোড়ামাটির ফলকে অলংকরণ ব্যবহৃত হয়নি। এর ব্যাখ্যা হিসেবে

Dhaka University Institutional Repository

বলা যেতে পারে যে, সম্ভবত মুঘল স্থাপত্যের নির্মাতাদের ব্যক্তিগত রুচি বোধই এর জন্য দায়ী। তারা স্থাপত্যে নতুন ধারা সঞ্চারের লক্ষ্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ গ্রহন না করাই সমিচিন মনে করে থাকতে পারেন অথবা বাংলাদেশের এই সুপ্রচলিত অলংকরণ শিল্প তাদের আদৌ আকর্ষনীয় মনে হয়নি।
অন্যদিকে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে মুঘল যুগের স্থাপত্যে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ ব্যবহৃত হয়েছে (আতিয়া মসজিদ, ১৬০৯ খ্রীঃ)। অথচ বিশেষ ভাবে রাজধানী ঢাকাতেই এর অনুপস্থিতি লক্ষ্যনীয়। বস্তুতঃ মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী হিসেবে ঢাকায় কেন্দ্রের (দিল্লী, আগ্রা) প্রভাব ছিল বেশী। ফলে এসময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে যা কিছু পরিবর্তন আনা হয় তা প্রকট হয়ে ধরা পড়ে ঢাকাতেই। রাজধানীর বাইরে অন্যত্র কেন্দ্রের প্রভাব পড়ে সামন্যই। এজন্য মুঘল যুগে ঢাকার মসজিদে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ করা না হলেও ঢাকার বাইরে পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ সমৃদ্ধ মসজিদ লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সুলতানী যুগের অলংকরণ ধারা অব্যাহত থাকে। আবার এমনো হতে পারে যে, ঢাকায় এসময় পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ শিল্পে অভিজ্ঞ কারিগরের অভাব ছিল ফলে তার প্রয়োগ সম্ভব হয়নি।

(ক) মার্লন অলংকরণ ঃ ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের অলংকরণ বলতে প্রধানতঃ মার্লন অলংকরণ বোঝায়। প্রতিটি মুঘল মসজিদের সমান্তরাল প্যারাপেটে ও অষ্টভূজী ড্রামে মার্লন অলংকরণ করা হয়েছে। অনেক সময় মসজিদের অভ্যন্তরভাগে মিহরাব ফ্রেমের ওপর সমান্তরাল ভাবে মার্লন অলংকরণ লক্ষ্য করা যায়। খাজা শাহ্বাজ ও দিলকুশা মসজিদে এরূপ রয়েছে। আবার কখনো গম্বুজের ভেতরের দিকে আবরণের নিম্নাংশে মার্লন অলংকরণ করা হয়। গোর-ই-শাহী মসজিদে এরূপ দেখা যায়।

(খ) প্যানেল ঃ মসজিদের পলেস্তরা করা দেয়ালে বৈচিত্র আনা হয় নানা রকম প্যানেল করে। মূলতঃ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে (facade) আয়তাকার ও বর্গাকৃতির সারিবদ্ধ প্যানেল করা হয়। কখনো আয়তাকার প্যানেলের ভেতর কুলঙ্গি করা হয়। সাতগম্বুজ মসজিদের পূর্ব দেয়ালে এরূপ লক্ষ্য করা যায়। খিলান আকৃতির প্যানেল করেও ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। সাত গম্বুজ মসজিদের কর্ণার টাওয়ার ও পশ্চিম দেয়ালে খিলান আকৃতির প্যানেল বিশেষ আকর্ষনীয়।

(গ) বহুভাজ যুক্ত (multi cusped) অলংকরণ ঃ মসজিদের খিলানে, প্যানেলের ভেতর বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করে ইমারতের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা হয়। ঢাকার অধিকাংশ মুঘল মসজিদের প্রবেশ দ্বারের খিলানে বহুভাজ যুক্ত অলংকরণ করা হয়। অনেক সময় ল্যাটারেল আর্চেও বহুভাজযুক্ত আকৃতি দেখা যায়। যেমন, শাহ্বাজ খানের মসজিদ ও বংশাল মসজিদে এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। সাতগম্বুজ মসজিদের প্যানেলে এবং কুলঙ্গিতে বহুভাজ যুক্ত অলংকরণ ব্যবহার করা হয়।

(ঘ) পাথর খোদাই এর কাজ ঃ ঢাকার মসজিদে পাথর খোদাই এর কাজ বিরল। একমাত্র খাজা শাহ্বাজ মসজিদের পূর্ব দেয়ালের বাইরের দিকের নীম্নদেশে পাথরের কাজ লক্ষ্য করা যায়। মসজিদে পাথরের তৈরী চমৎকার নক্সা করা দু'টি পিলারের ওপর মিহরাব নির্মাণ করা হয়। মিহরাবের খিলানটি বহুভাজযুক্ত এবং খিলানের স্পেন্ড্রেলে বর্ষার ফলকের ন্যায় (spear head) অলংকরণ করা হয়।

(ঙ) ফুল পাতার নক্সা (floral motif) ঃ প্লাষ্টারের উপর প্যানেল অথবা বহুভাজযুক্ত অলংকরণ করা ছাড়ও মসজিদের অভ্যন্তরভাগের অলংকরণে বিশেষ করে মিহরাবের ফ্রেমের উপর ফুল পাতার নক্সা লক্ষ্যনীয়।

Dhaka University Institutional Repository

মোটামুটি ভাবে সকল মসজিদেই একই রকম ফুল পাতার নক্সা ব্যবহৃত হয়েছে। আজিমপুর মসজিদের গম্বুজের ভেতরের দিকের শীর্ষদেশে প্লাষ্টারের ওপর একটি সম্পূর্ণ ফুল এবং দু'পাশের অর্ধ গম্বুজে ফুলের অর্ধাংশের নক্সা করা হয়।

(চ) এরাবেস্ক ঃ ঢাকার মসজিদে জ্যামিতিক নক্সার প্রচলন কম। একমাত্র গোর-ই-শাহী মসজিদে এই নক্সা লক্ষ্য করা যায়। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে মিহরাব খিলানের টিম্পেনামে জ্যামিতিক নক্সা অত্যন্ত সুচারুভাবে করা হয়। অনুরূপ নক্সা অভ্যন্তর ভাগের পূর্ব দেয়ালের প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপরে করা হয়। জ্যামিতিক নক্সার সংযোজন মসজিদটিকে বিশেষত্ব দিয়েছে।

(ছ) ঘন্টা নক্সা (bell motif) : ঢাকার মুঘল মসজিদের অলংকরনের মধ্যে একটি ব্যতিক্রমধর্মী অলংকরণ লক্ষ্য করা যায় নিমতলী ছাতাওয়ালা মসজিদের অভ্যন্তরভাগে।গম্বুজের আবরণের নিম্নাংশে একই সমান্তরালে আয়তাকার ও ঘন্টার আকৃতির নক্সা সন্নিবেশ করা হয়। উল্লেখ্য যে, এই ঘন্টা নক্সা বাংলার স্থাপত্যে প্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায় এবং বলা যায় এই নক্সার মূল নিহিত রয়েছে প্রাক মুসলিম যুগের স্থাপত্যে। বাংলার স্থাপত্যের টেরাকোটা অলংকরণে বহুলভাবে শেকল ও ঘন্টা নক্সা ব্যবহৃত হয়েছে।

(জ) চিনিটিকরী ঃ বস্তুতঃ চিনেমাটির বাসনের ভাঙ্গা টুকরোকে নানা ভাবে সাজিয়ে ইমারতের অলংকরণ করার রীতির প্রচলন হয় ঢাকায় উনবিংশ শতাব্দীতে। এসময় ঢাকার কিছু পুরানো মসজিদে এই অলংকরণ রীতির সংযোজন করা হয়। এ রীতির অলংকরণ সমৃদ্ধ মসজিদের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত তারা মসজিদ ও কসাইটুলী মসজিদ। এছাড়া বিনত বিবির মসজিদ, নিমতলি ছাতাওয়ালা মসজিদেও এই অলংকরণ রীতির প্রয়োগ করা হয়। এ ধরনের অলংকরণে মসজিদ চিত্তাকর্ষক দেখায়।

সামগ্রিকভাবে ঢাকার মুঘল মসজিদে উপরে আলোচিত বেশিষ্ট্য সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। প্রকৃতপক্ষে ঢাকা সুবা বাংলার রাজধানীতে পরিনত হবার পর ঢাকার স্থাপত্যে কেন্দ্রীয় স্থাপত্য রীতির অনুকরণ করার প্রবনতা লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে শায়েস্তা খানি স্থাপত্য রীতিতে এই প্রবনতা বেশী দেখা যায়। কিন্তু দিল্লী-আগ্রার ইমারতের অবিকল অনুকরণ এখানে সম্ভব ছিল না; প্রধানতঃ ইমারত নির্মাণের উপযুক্ত উপকরণের দূস্প্রাপ্যতার কারনে। উত্তর ভারতের স্থাপত্য প্রধানতঃ পাথর দিয়ে নির্মিত। কিন্তু বাংলাদেশে পাথরের দূস্প্রাপ্যতার কারনে ইট-ই ছিল ইমারত নির্মাণের প্রধান উপকরণ। একারণে ইটের ওপর পলেস্তরা দিয়ে ইমারতের গায়ে মসৃন ভাব আনা হয় এবং তার ওপর নানারকম প্যানেল, বহুভাজ, এলকভ, মার্লন করে ইমারতের সৌন্দর্য বাড়ানো হয়। বাংলার স্থাপত্যের সুপ্রচলিত অলংকরণ রীতি পোড়ামাটির ফলকের অলংকরণ অথবা অলংকৃত ইটের ব্যবহার ঢাকার মুঘল স্থাপত্যে পরিহার করা হয়। শায়েস্তা খানের আমলেই ঢাকায় বেশী ইমারত নির্মিত হয় এবং তার উদ্দেশ্য ছিল ঢাকার ইমারত গুলোতে যতদূর সম্ভব কেন্দ্রীয় স্থাপত্য রীতির প্রতিফলন ঘটানো। আর শায়েস্তা খানের উত্তর সুরিরা তাঁকে অনুসরণ করে গেছেন মাত্র। ফলে ঢাকার মুঘল স্থাপত্যে প্রচ্ছন্ন ভাবে কিছুটা একঘেয়েমী অথবা বৈচিত্রহীনতা প্রকাশ পেয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

মসজিদের অবস্থান ও মুঘল ঢাকার ক্রমবিকাশ

ঢাকার ইতিহাস সুপ্রাচীন। তবে একটি লোকালয় হিসেবে ঢাকা পরিচিতি পেয়েছে সুলতানী যুগ থেকে এবং মুঘল যুগে সুবা বাংলার রাজধানীতে পরিণত হলে (১৬১০) ঢাকার গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। রাজধানীর পত্তন হলে ঢাকায় জনসমাগম ঘটে, নতুন নতুন জনপদ গড়ে উঠে।মুঘল যুগে ঢাকার বিকাশ প্রক্রিয়া ঢাকায় নির্মিত বিভিন্ন ইমারত রাজি বিশেষতঃ মসজিদ গুলো প্রত্যক্ষ করে উপলব্ধি করা যায় (মানচিত্র-৫)। বস্তুতঃ ঢাকার বিভিন্ন মসজিদের অবস্থান, আকৃতি ও বিভিন্ন এলাকায় মসজিদের সংখ্যার প্রতি লক্ষ্য করে মুঘল যুগে ঢাকার বিভিন্ন এলাকার গুরুত্ব এবং সেই সাথে জনসংখ্যার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়।

সুলতানী যুগে ঢাকার ব্যপ্তি কতটা ছিল তা অনুসন্ধান করলে দেখা যায় সেসময় ঢাকায় মুসলমান অধ্যুষিত এলাকা ছিল কম। প্রধানতঃ বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্বের এলাকা থেকে দোলাই খাল পর্যন্ত স্থান নিয়ে সুলতানী যুগের ঢাকা গড়ে উঠেছিল। ঢাকায় বর্তমানে সুলতানী যুগের কেবল তিনটি মসজিদ টিকে রয়েছে ঃ

১। বিনত বিবির মসজিদ
   স্থাপিতঃ ১৪৫৬ খ্রিঃ
   অবস্থানঃ নারিন্দা
২। নসওয়ালা গলির মসজিদ
   স্থাপিতঃ ১৪৫৯ খ্রিঃ
   অবস্থানঃ উর্দুরোড, চকবাজার
৩। মিরপুর মাযার মসজিদ
   স্থাপিতঃ ১৪৮০ খ্রিঃ
   অবস্থানঃ মিরপুর

নারিন্দায় অবস্থিত বিনত বিবির মসজিদ ঢাকায় টিকে থাকা সুলতানী যুগের প্রাচীনতম মসজিদ। মসজিদটি নারিন্দায় মুসলমানদের আদি বসতির কথা তুলে ধরে। বিনত বিবির মসজিদটি এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির। সুলতানী যুগের টিকে থাকা অপর দু'টি মসজিদের মধ্যে নসওয়ালা গলির মসজিদের অবস্থান চকবাজারের উর্দূরোডে। মসজিদটি যেস্থানে অবস্থিত তার প্রাচীন নাম গিরদকিল্লা। এখানকার একটি রাস্তার নাম ছিল নসওয়ালাগলি। মসজিদের কাছে একটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। চকবাজারের প্রাধান্য মুঘল আমলে প্রতিষ্ঠিত হলেও সুলতানী যুগ থেকেই যে চকবাজারের আশে পাশে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছিল তা নসওয়ালা গলির মসজিদের অবস্থান থেকে বোঝা যায়। মসজিদটি আদিতে এক গম্বুজ বিশিষ্ট এবং আয়তাকার ছিল। সুলতানী যুগের টিকে থাকা তৃতীয় মসজিদটির অবস্থান মিরপুরে। এই মসজিদটিও বর্গাকৃতির এবং এক গম্বুজ বিশিষ্ট। মিরপুরে এই মসজিদের অবস্থান এটাই প্রমান করে যে সুলতানী যুগে এখানে মুসলমানদের জনবসতি ছিল এবং কেবল তাই নয় স্থানটি ছিল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে এখনে মুঘলযুগে 'শাহবন্দর' নামে একটি শুল্ক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

সুলতানী যুগের এ তিনটি মসজিদের অবস্থান লক্ষ্য করে বলা যায় যে, কেবল বাবু বাজারের পূর্ব দিকেই নয় বরং পশ্চিম দিকেও দু'একটি স্থানে সুলতানী আমলে মুসলমানদের বসতি গড়ে উঠেছিল। লক্ষ্যনীয় যে, সুলতানী যুগের টিকে থাকা এই তিনটি মসজিদ ছিল স্বল্প পরিসরের। সুতরাং এরূপ অনুমান করা যায় যে, সুলতানী আমলে মুসলমানদের বসতির অঞ্চলে মুসলমান জনসংখ্যার ঘনত্ব তেমন বেশী ছিল না। উল্লেখ্য যে, বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব দিকে হিন্দু নামের বসতি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, শাঁখারী বাজার, বাংলা বাজার, কুমার টুলি, বৈরাগী টোলা, নারিন্দা, লক্ষ্মী বাজার, সূত্রাপুর প্রভৃতি। মূলতঃ প্রাক মুসলমান যুগের এই সব আদি বসতির এলাকাতেই মুসলমানরা প্রথম বসতি স্থাপন করেন।

১৬১০ সালে ইসলাম খান ঢাকায় মুঘল সুবা বাংলার রাজধানী প্রতিষ্ঠা করেন। রাজধানী হবার পর ঢাকা হয়ে উঠেছিল সমগ্র বাংলার একটি প্রধান শহর ও ব্যবসা কেন্দ্র। রাজধানী পত্তনের প্রাথমিক পর্যায়ে ইসলামপুরের ভূমিকা ছিল অপরিসীম। ইসলামপুরে মুঘলযুগের কয়েকটি মসজিদ রয়েছে ঃ

১। ইসলাম খানের মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬১০–১৩ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ আওলাদ হাসান লেন, ইসলামপুর

২। নবরায় লেন মসজিদ
স্থাপিত ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
অবস্থান ঃ নবরায় লেন, ইসলামপুর

৩। জিন্দাবাহার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬১২ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ জিন্দাবাহার, ইসলামপুর

৪। শায়েস্তা খানের মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৬৪ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ মিটফোর্ড, বাবু বাজার

৫। বংশাল মসজিদ
স্থাপিত ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে
অবস্থান ঃ বংশাল

ইসলাম খান ঢাকায় আসার পর তাঁর নিজের জন্য এবং তাঁর সাথে আগত লোক লস্করের জন্য স্বভাবতই একটি মসজিদ নির্মানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। নারিন্দার বিনত বিবির মসজিদটি ছিল ক্ষুদ্র পরিসরের। ফলে, অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়। ইসলাম খানের সময় (১৬১০–১৩) ঢাকার সীমানা ছিল পূর্বে সদরঘাট থেকে পশ্চিমে চকবাজার। ঢাকার পুরোনো দূর্গকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র। মুঘল যুগে নতুন শহরের বিকাশে সুলতানী যুগের ঢাকাও সম্পৃক্ত হয়। বাবু বাজার থেকে পাটুয়াটুলী পর্যন্ত এলাকা ইসলামপুর নামে অদ্যাবধি পরিচিত।

ইসলাম খান ঢাকায় আগমনের পরপরই তার বেশ কিছু অনুচর সাময়িক ভাবে যে স্থানে বসতি স্থাপন করেন, তাই কালক্রমে মুঘলটুলী নাম পরিচিত হয়ে উঠে। অনেকে মনে করেন মুঘলরা আসার আগেও ঢাকায় একটি

Dhaka University Institutional Repository

নৌঘাঁটি ছিল। নৌঘাঁটির রক্ষনাবেক্ষনের সাথে যারা জড়িত ছিলেন তারা যে এলাকায় বসবাস করতেন তা পরিচিত হয়ে উঠে পুরোনো মুঘলটুলী নামে।[১]

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগে নবরায় লেনে একটি মসজিদ নির্মিত হয় এবং ১৬১২ সালে জিন্দাবাহারে আরেকটি মসজিদ নির্মিত হয়। এই দু'টি মসজিদ নির্মানের ফলে বোঝা যায় যে, রাজধানী পত্তনের পর ঢাকায় মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

ঢাকার স্থাপত্যে নবাব শায়েস্তা খানের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। তার দু'দফার সুবাদারীর আমলে (১৬৬৪–৭৭, ১৬৮০–৮৮) ঢাকায় নির্মিত হয়ে মুঘল স্থাপত্যের চমৎকার নিদর্শন সমূহ। একজন সুশাসক হিসেবেও শায়েস্তা খানের খ্যাতি রয়েছে। বাবু বাজারে মিটফোর্ড হাসপাতালের অভ্যন্তরে নবাব শায়েস্তা খান নির্মিত তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। বুড়িগঙ্গা নদী মসজিদের দক্ষিণ পাশ দিয়ে প্রবাহমান। শায়েস্তা খানের সুবাদারীর প্রথম পর্যায়ে বাবু বাজারই ছিল তাঁর অবস্থান ক্ষেত্র। মসজিদের সন্নিকটে ছিল তাঁর কাঠের তৈরী প্রাসাদ। ট্যাভার্নিয়ার নবাবের সাথে এই প্রাসাদে ১৬৬৬ সালে সাক্ষাৎ করেছিলেন।[২] বাবু বাজারের কাছে বুড়িগঙ্গা তীরে ঘাট ও বাঁধ নবাব শায়েস্তা খানের সময় নির্মিত হয়।বাবু বাজারের খালের মুখে একটি নহবত খানা এবং খালের উপর একটি সেতু নির্মাণ করা হয়। বস্তুতঃ বুড়িগঙ্গা নদী তীরে বাঁধ, সেতু ও নহবত খানা এসব মিলিয়ে ছিল এক চমৎকার দৃশ্য। [৩]

বংশালে দু'টি সারিতে বিন্যস্ত মোট আট গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদে বর্তমানে কোন শিলালিপি না থাকলেও মসজিদের নির্মাণ কৌশল প্রত্যক্ষ করে মসজিদটিকে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে নির্মিত বলে অনুমান করা যায়। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় ইসলাম পুরে মুঘলযুগের পাঁচটি মসজিদের অবস্থান সেই এলাকার ক্রমবর্ধমান মুসলমান জনগোষ্ঠির কথাই তুলে ধরে। অর্থাৎ মুঘলযুগে বুড়ি গঙ্গা নদীর উত্তর ধারে বাবু বাজার থেকে বংশাল পর্যন্ত এলাকা জুড়ে মুসলমানদের প্রাথমিক বসতি গড়ে উঠে।

হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৬৪ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ নারিন্দা

নারিন্দায় ১৬৬৪ সালে হায়াৎ ব্যাপারী নামে জনৈক ব্যবসায়ী অনেকটা বিনত বিবির মসজিদের অনুরূপ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। অর্থাৎ এই মসজিদটি বিনত বিবির মসজিদের মত এক গম্বুজ বিশিষ্ট ও বর্গাকৃতির। নারিন্দায় সুলতানী যুগে নির্মিত একটি মসজিদ থাকা সত্ত্বেও ১৬৬৪ সালে আরেকটি মসজিদ নির্মাণ নারিন্দায় মুঘলযুগে মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির কথাই প্রমান করে। একই সাথে অরেকটি বিষয় সুস্পষ্ট হয় যে, সুলতানী যুগের ঢাকা মুঘল ঢাকার অন্তর্ভূক্ত হয়।

চকবাজার ছিল মুঘল ঢাকার প্রাণ কেন্দ্র। এখানে তাই নির্মিত হয় অনেক গুলো মসজিদ। বর্তমানে চকবাজারে যে সব মসজিদের অস্তিত্ব পাওয়া যায় সেগুলো হচ্ছে যথাক্রমে ঃ

১। চুড়িহাট্টা মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৪৯ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ চুড়িহাট্টা

Dhaka University Institutional Repository

২। চক বাজার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৭৬ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ চকবাজার
৩। করতলাব খান মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭০০–৪ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ বেগম বাজার
৪। কেন্দ্রীয় কারাগার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭১৪ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ কারাগার অভ্যন্তরে
৫। আরমানিটোলা মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭৩৫ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ আরমানিটোলা
৬। তারা মসজিদ
নির্মাণ কাল ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
অবস্থান ঃ বংশাল

চকবাজারের খ্যাতি বহুদিন থেকে। মুঘলরা আসার পূর্বেই চকে মুসলমানদের বসতি ছিল। নসওয়ালা গলির মসজিদ তাই প্রমাণ করে। তবে মুঘলযুগে চক হয়ে উঠেছিল ঢাকার বাণিজ্য ও প্রশাসনের প্রধান কেন্দ্র। শাহ্ সূজার সুবাদারীর আমলে ১৬৪৯ সালে চুড়িহাট্টায় মুহাম্মদী বেগ একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রকৃতপক্ষে প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হবার ফলে চক বাজারে আরো মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দেয়। তবে নসওয়ালা গলির মসজিদের পরিমাপের (২৭´×১৬$\frac{১}{২}$´) তুলনায় চুড়িহাট্টা মসজিদটি খুব প্রশস্ত ছিল না (৩০´×১৩´)। অর্থাৎ প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণতহলেও ১৬৪৯ সালের মধ্যে চক বাজারে মুসলমান জনসংখ্যা খুব বেশী ছিল না। চুড়িহাট্টা মসজিদ থেকে আরো একটি বিষয় উপলব্ধি করা যায় যে, ইসলামপুরের পাশাপাশি চকবাজারেও মুঘল বসতি গড়ে উঠে। মুঘল যুগে চকের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই স্থানকে কেন্দ্র করে কাশ্মিরী, ইরানী, গ্রীক, আর্মেনীয়, ইংরেজ প্রভৃতি ব্যবসায়ীরা তাদের ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতো। ১৬৪৪ সালে মুঘল কর্মচারী আবুল কাসেম বণিকদের সুবিধার্থে নির্মাণ করেন বড় কাটরা এবং এর রক্ষানাবেক্ষনের ব্যয় নির্বাহের জন্য তৈরী হয় বাইশটি দোকান। [৪] শায়েস্তা খানের আমলে বড় কাটরার নিকটেই নির্মিত হয় ছোট কাটরা (১৬৬৪–৭১)।

ঢাকার পুরানো দূর্গের কাছে একটি প্রধান মসজিদ হিসেবে শায়েস্তা খান নির্মাণ করলেন চকবাজার মসজিদ। মসজিদটি আকৃতি (৫৩′×২৬′) এবং ভাব গাম্ভির্যে যথার্থই ছিল মুঘল যুগের একটি প্রধান মসজিদ। সুবাদার ও উমারাগন এই মসজিদে জুমার নামাজ পড়তেন এবং মসজিদের উঁচু চত্বর থেকে তাঁরা মুহার্‌রম ও অন্যান্য বিষয় প্রত্যক্ষ করতেন।[৫] নায়বে নাজিমরা এখানে ঈদের নামাজ আদায় করতেন।

চকবাজারের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য মসজিদ করতলাব খানের মসজিদ। মসজিদের নির্মাতা মুর্শিদ কুলী খানেরই

Dhaka University Institutional Repository

অপর নাম করতলাব খান। একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে ১৭০২ সালে মুর্শিদ কুলী খান এখানে একটি বাজার প্রতিষ্ঠা করেন এবং এর নামকরণ করেন 'বাদশাহী বাজার'।১৭৩৩–৩৪ সালে তাঁর জামাতা দ্বিতীয় মুর্শিদ কুলি খান বাজারটির পুনঃ সংস্কার করেন। সম্ভবতঃ মানসিংহের আমল থেকেই বাজারটির যাত্রা শুরু যা পূর্ণতা লাভ করেছিলো মুর্শীদ কুলি খানের সময়। [৬] করতলাব খানের মসজিদের নীচের তলার কক্ষগুলো মূলতঃ দোকান হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবসা বানিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে চকবাজারের পরিচিতির কারণে এখানে যা কিছু নির্মিত হয়েছে তার একটি বাণিজ্যিক ভূমিকাও ছিল।

বস্তুতঃ ঢাকার বিভিন্ন এলাকার বিভিন্ন ভূমিকা অনুযায়ী সেসব স্থানের মসজিদেরও বিভিন্ন ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। যেমন, লালবাগ এলাকায় মির্ধা মসজিদ দ্বিতল হলেও মসজিদের নীচের তলার কক্ষ গুলো দোকান হিসেবে ব্যবহৃত না হয়ে মাদ্রাসার ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হয়। লালবাগ ছিল মূলতঃ প্রশাসনিক এলাকা, মুঘল যুগে এখানে দোকান পাট গড়ে উঠেনি। জনকল্যাণার্থে মুর্শীদ কুলি খান বেগম বাজার মসজিদের কাছে একটি 'বাওলী' বা ধাপযুক্ত কূয়ো নির্মাণ করেন।

১৮০৯ সালে চার্লস ড'য়লী চকবাজারের কথা বলেছেন, "চক পরিচিত পুরানো নাখাস হিসেবে। এটি প্রায় দু'শো ফুটের একটি স্কয়ারের মত। সূর্যাস্তে এখানে ভিড় হয় প্রচন্ড।"[৭] অনুমান করা যায় যে, মুঘল আমলে চক দাস বিক্রয় কেন্দ্র হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছিল।[৮] চকের খ্যাতি কেবল প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেই ছিলনা, স্থানটি ছিল বড় বড় ওলামাদের মিলন কেন্দ্র। তাদের তফসির ও হাদিসের বয়ান শোনার জন্য ভক্ত প্রানের ভিড় লেগেই থাকতো।[৯]

বর্তমান কেন্দ্রিয় কারাগারের অভ্যন্তরে ১৭১৪ সালে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ নির্মিত হয়। ১৭৩৫ সালে আরমানিটোলায় নির্মিত হয় বাংলার চৌচালা কুটিরের চালের অনুরূপ ছাদ বিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্রাকৃতির মসজিদ। আরমানিটোলা নামটি সম্ভবতঃ এই এলাকায় বসবাসকারী আর্মেনীয়দের স্মৃতি বহন করছে।অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবুল খয়রাত রোডে নির্মিত হয় মির্যা গোলাম পীরের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ। পরবর্তী কালে মসজিদটি তারা মসজিদ নামে পরিচিত হয়। মির্যা গোলাম পীর ছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর ঢাকার একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি মীর আবু সাঈদের পৌত্র।[১০] এই শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে (১৯২৬) আলী জান ব্যাপারী নামে জনৈক ব্যবসায়ী মসজিদের সংস্কার এবং মসজিদকে অলংকরণ সমৃদ্ধ করেন।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে, প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে চকের গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। ফলে এখানে আমরা অনেকগুলো মসজিদ লক্ষ্য করি। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চকে নির্মিত তিনটি মসজিদের অবস্থান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে ১৬৭৯ সাল থেকে চকের গুরুত্ব কমে আসলেও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে চকের ভূমিকা অব্যাহত থাকে এবং এর ফলশ্রুতিতে চকবাজারে আরো মসজিদ নির্মিত হয়। চককে কেন্দ্র করে পাশ্ববর্তী এলাকা সমূহে মুসলমান বসতি বৃদ্ধি পায়।

লালবাগ এলাকার পত্তন হয়েছে মুঘল আমলে, খুব সম্ভবতঃ ঢাকা রাজধানী হওয়ার সাথে সাথে। নাম দেখে মনে হয়, লালবাগ অঞ্চলে ছিল বিস্তৃত ফুলের বাগান।[১১] চক বাজারের পর লালবাগের প্রতি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এ এলাকাতেও নির্মিত হয় বেশ কয়েকটি মসজিদ।

(১) আমলিগোলা মসজিদ

স্থাপিত ঃ ১৬৭৬ খ্রিঃ

Dhaka University Institutional Repository

অবস্থান ঃ লালবাগ

(২) লাল বাগ দূর্গ মসজিদ
স্থাপিত ১৬৭৯ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ লালবাগ

(৩) ভাট মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৮৮ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ লালবাগ

(৪) খান মুহাম্মদ মির্ধার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭০০–৪ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ আতিশ খানা মহল্লা, লালবাগ

(৫) ফররুখ শিয়ার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭০৩–৬ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ লালবাগ

১৬৭৯ সালে লালবাগ দূর্গের নির্মাণ কাজ আরম্ভ হলে মুঘল প্রশাসনিক কেন্দ্র চকবাজার থেকে লাল বাগে স্থানান্তরিত হয়। ১৬৭৬ সালে আমলিগোলায় একটি মসজিদ নির্মিত হয়। মুঘল যুগে আমলিগোলার নাম ছিল আমির গোলা বা আমীর গঞ্জ। [১২] আমলিগোলার অবস্থান লালবাগের পশ্চিমে। এই মসজিদটির অবস্থান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, লালবাগ দূর্গ নির্মাণ করার পূর্ব থেকেই এই অঞ্চলে মুঘলদের বসতি ছিল। ১৬৭৮ সালে যুবরাজ আজম লালবাগ দূর্গের নির্মাণ কাজ আরম্ভ করেন। প্রশাসনিক কেন্দ্রে পরিণত হলে লালবাগে জনসংখ্যা বৃদ্ধিপায়। যুবরাজ আজম দূর্গের অভ্যন্তরে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের একটি অন্যতম নিদর্শন।যুবরাজ আজম লালবাগ দূর্গকে মূলতঃ একটি প্রাসাদ দূর্গ হিসেবে নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি এর নির্মাণ কাজ আরম্ভ করলেও শেষ করতে পারেননি, সম্রাট আওরঙ্গজেবের আদেশে তাঁকে ঢাকা ত্যাগ করতে হয়। তাঁর পরিবর্তে ১৬৭৯ সালে দ্বিতীয় বারের মত সুবাদার হয়ে আসলেন শায়েস্তা খান। কিন্তু তিনিও এ দূর্গের নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারেননি, লালবাগ দূর্গ তাই অসমাপ্ত অবস্থাতেই রয়ে যায়। লালবাগ দূর্গের দক্ষিণ দিকের রক্ষাবুহ্য (bastion) ঘেসে বয়ে যেত বুড়ি গঙ্গা নদী।

১৬৮৮ সালে ভাট মসজিদ নির্মিত হয়। মসজিদটি প্রশস্ত ও তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। লালবাগ দূর্গের দক্ষিণ তোরণের কিছুটা দক্ষিণে নির্মিত হয় ফররুখ শিয়ার মসজিদ। এটি ছিল মুঘল ঢাকার সবচেয়ে প্রশস্ত মসজিদ। এখানে তিনটি সারিতে প্রায় ১৫০০ জন লোকের স্থান সংকুলান হতো। এতবড় একটি মসজিদ নির্মাণের কারণ হিসেবে বলা যায় প্রশাসনিক কেন্দ্র চকবাজার থেকে লালবাগে স্থানান্তরের ফলে এই স্থানের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার কারণে প্রশস্ত একটি মসজিদ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। লালবাগের আতিশ খানা মহল্লায় নির্মিত হয় মির্ধা মসজিদ। আতিশ খানা গড়ে উঠে মুঘল আমলে। লালবাগ দূর্গের নিকটবর্তী এই স্থানটিতে হয়তো অস্ত্রাগার ছিল, যা থেকে এই আতিশ খানা নামের উৎপত্তি।[১৩] ঢাকার প্রধান কাজী ইবাদুল্লাহ্‌র নির্দেশে খান মুহাম্মদ মির্ধা এই মসজিদ নির্মাণ করেন। দ্বিতল এই মসজিদের নীচের কক্ষগুলো ছাত্রাবাস হিসেবে ব্যবহৃত হতো।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার
382729

Dhaka University Institutional Repository

লালবাগ এলাকার এই সব মসজিদ প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে লালবাগের গুরুত্ব এবং সেই সাথে এই এলাকার জনসংখ্যা বৃদ্ধির পরিচয় তুলে ধরে।

লালবাগের উত্তর পশ্চিমে আজিমপুরে মুঘল যুগের চারটি মসজিদ রয়েছে ঃ

(১) হাজী বেগ মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৮৩ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ পলাশী

(২) মরিয়ম সালেহা মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭০৬ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ বাবুপুরা, নীলক্ষেত

(৩) গোর–ই শাহী মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭২৬ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ সলিমউল্লাহ্ এতিম খানার অভ্যন্তরে

(৪) আজিম পুর মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৭৪৬ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ নয়াপল্টন, আজিমপুর

আজিমপুর নাম নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, অনেকে মনে করেন সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র শাহজাদা আজমের নামানুসারে এলাকার নাম হয় আজিমপুর। ১৬৭৭–৭৯ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার সুবাদার। তাঁর কর্মচারীরা এই এলাকায় বসবাস করতেন। [১৪] অনেকে আবার বলেন আওরঙ্গজেবের পৌত্র শাহ্জাদা আজিম উশ্শানের নাম থেকে এলাকার নাম হয়েছে আজিমপুর। ১৬৯৭–১৭০৩ পর্যন্ত তিনি ছিলেন বাংলার সুবাদার। তবে বিতর্ক যাই থাকুক না কেন, ধরে নেয়া যেতে পারে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে আভিজাতদের আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠেছিল আজিমপুর। [১৫]

আজিমপুর এলাকার প্রাচীনতম মসজিদ পলাশীর হাজীবেগ মসজিদ। মসজিদটির প্রতিষ্ঠাতা মজহার হাসান হাজীবেগ ছিলেন মুঘল সেনা বাহিনীর একজন অধ্যক্ষ। মসজিদটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট। আজিমপুরের দ্বিতীয় মসজিদ নীলক্ষেতের বাবুপুরায় অবস্থিত মরিয়ম সালেহা মসজিদ। মসজিদের সাথেই একটি ছোট কবরস্থান রয়েছে। এখনে যারা সমাহিত আছেন, তাদের মধ্যে অন্যতম হচ্ছেন শাহ্বাগুদিওয়ান। তাঁর পুত্র আব্দুল্লাহ্র কন্যা ছিলেন মরিয়ম সালেহা। বিনত বিবির মসজিদের পর কোন মহিলা কর্তৃক নির্মিত এটাই ঢাকার দ্বিতীয় মসজিদ।

আজিমপুরের সলিমউল্লাহ্ এতিম খানার অভ্যন্তরে দ্বিতল ও একগম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে। মূল মসজিদটি আকৃতিতে ছোট হলেও অলংকরণে সমৃদ্ধ। আজিমপুরের নয়াপল্টনে নির্মিত হয়েছে দ্বিতল আরেকটি মসজিদ। প্রশস্ত এই মসজিদের নির্মাণ শৈলীতে বহিরাগত প্রভাব সুস্পষ্ট।

আজিমপুর এলাকার এই চারটি মসজিদ থেকে এবিষয় অনুধাবন করা যায় যে, রাজকর্মচারীদের আবাসস্থল হিসেবে স্থানটি উল্লেখযোগ্য ছিল এবং লক্ষ্য করা যায় যে একমাত্র গোর–ই– শাহী মসজিদ ব্যতীত অপর

Dhaka University Institutional Repository

তিনটি মসজিদই বেশ বড় অর্থাৎ এই এলাকায় যারা বসবাস করতেন তাদের স্থান সংকুলানের জন্য মসজিদ গুলো প্রশস্ত করে নির্মাণ করা হয়।সুতরাং বলা যায় যে, আজিমপুর গড়ে উঠে আবাসিক এলাকা হিসেবে লালবাগোত্তর কালে। মুসলমান জনসংখ্যার ক্রমবৃদ্ধি এই এলাকায় বসতি স্থাপনের কারণ। তবে ঢাকেশ্বরী মন্দিরের অবস্থান দেখে অনুমান করা হয় যে, আজিমপুরের দক্ষিণ পূর্বে একটি হিন্দু বসতি ছিল। এবং এই হিন্দু বসতির পাশাপাশি উত্তর পশ্চিম দিকে গড়ে উঠেছিল মুঘল যুগের নূতন আবাসিক এলাকা আজিমপুর।

ঈদগাহ্
স্থাপিত ঃ ১৬৪০ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ ধানমন্ডি

আজিমপুরের উত্তর পশ্চিমে পীল খানার অবস্থান। মুঘলযুগে এমনকি কোম্পানীর আমলেও এখানে হাতি শালা ছিল। মুঘল সেনা ছাউনি হিসেবে পীল খানা ব্যবহৃত হয়েছে। পীলখানার উত্তরে শাহ্ সুজার আমলে ধানমন্ডিতে একটি প্রশস্ত ঈদগাহ্ নির্মাণ করা হয়। নির্মাণ কালে ঈদগাহ্টি বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে রায়ের বাজার গ্রামের অন্তর্ভূক্ত ছিল। ঈদগাহ্র এলাকাটি ছিল আশে পাশের নীচু ভূমির মধ্যে অপেক্ষাকৃত উচু। প্রকৃত পক্ষে ধানমন্ডি এলাকাটি ছিল নীচু এবং এই শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকেও এখানে ধানক্ষেত বিদ্যমান ছিল। ঈদগায়ে সুবাদার, আমির ওমরাহ এবং সর্বসাধারণ নামাজ পড়তেন। এখানে বাৎসরিক একটি মেলা বসতো। মুঘল আমলের এটাই ঢাকার একমাত্র ঈদগাহ্। বস্তুতঃ ঈদগাহ্টি ছিল পীলখানা এবং মুহাম্মদ পুরের মধ্যে একটি যোগসুত্র।

মুহাম্মদপুরে শায়েস্তা খানের আমলের কয়েকটি স্থাপত্য কর্ম লক্ষ্য করা যায় ঃ

(১) সাত গম্বুজ মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৮০ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ জাফরাবাদ, মিরপুর

(২) আল্লাকুরী মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৮০ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ মিরপুর

নবাব শায়েস্তা খানের আমলে ঢাকায় যে কয়টি মসজিদ নির্মিত হয়েছে তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য মসজিদ সাত গম্বুজ মসজিদ। স্থাপত্য নৈপুণ্যে এটি ঢাকার একটি অন্যতম মসজিদে পরিণত হয়েছে। ড'য়লীর গ্রন্থে সাতগম্বুজ মসজিদের স্কেচ ও বর্ণনা রয়েছে।[১৬] সাত গম্বুজ মসজিদের দক্ষিণ দিকে নির্মিত হয়েছে এক গম্বুজ বিশিষ্ট আল্লাকুরী মসজিদ। মসজিদটি আকৃতিতে ছোট হলেও অলংকরণে আকর্ষনীয়। সাত গম্বুজ মসজিদের কিছুটা উত্তরে রয়েছে অষ্টভূজাকৃতির একটি সমাধি। মুহাম্মদপুরে মুঘলদের একটি ঘাঁটি গড়ে উঠেছিল। প্রকৃত পক্ষে উত্তর–পশ্চিম দিক থেকে নদীপথকে প্রহরা দেয়ার ক্ষেত্রে স্থানটি ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মুঘল আমলে জাফরাবাদ (মুহাম্মদপুর) বাণিজ্য কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলে মসজিদ, সমাধি প্রভৃতির অবস্থান স্থানটির গুরুত্বের কথা তুলে ধরে।

Dhaka University Institutional Repository

মুঘল আমল থেকেই বিশেষ এলাকা হিসেবে রমনার ইতিহাসের সূচনা। এখানে দু'টি মসজিদ রয়েছেঃ

(১) হাজী খাজা শাহ্বাজ মসজিদ

স্থাপিত ঃ ১৬৭৯ খ্রিঃ

অবস্থান ঃ সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ-পূর্ব কোনে, রমনা।

(২) মুসা খানের মসজিদ

স্থাপিত ঃ ১৬৭৯ খ্রিঃ

অবস্থান ঃ শহিদ উল্লাহ্ হলের উত্তর পশ্চিম কোনে, রমনা।

মুঘল যুগে রমনা এলাকা দু'টি মহল্লায় বিভক্ত ছিল। একটি মহল্লা সুজাতপুর; অপরটি চিশতিয়া। সুজাতপুর মহল্লার নাম হয় ইসলাম খানের সময়কালের একজন বিখ্যাত সেনাপতি সুজাত খানের নামে। সোহরাওয়ার্দি উদ্যানের দক্ষিণ পশ্চিম অংশ চিশতিয়া নামে পরিচিত ছিল। চিশতিয়ায় ইসলাম খান চিশতির বংশের বেশ কিছু সদস্য বসবাস করতেন, একারণে মহল্লার নাম হয় চিশতিয়া। তাদের অনেকেরই কবর রয়েছে এই এলাকায়। পরবর্তিকালে এলাকার নাম হয় পুরানো নাখাস অর্থাৎ পুরানো দাস বাজার। সম্ভবতঃ মুঘল অমলে এখানে দাস বিক্রি হতো। রমনা নামকরণ মুঘলদেরই।[১৭] তইফুর জানিয়েছেন পুরানো হাইকোর্ট ভবন থেকে বর্তমান সড়ক ভবন পর্যন্ত মুঘলরা তৈরী করেছিল বাগান, যারনাম বাগ-ই-বাদশাহী। ১৯০৩ সালে তিনি হাইকোর্ট এলাকায় বিশাল এক ফটক দেখেছিলেন; যেটি তার মতে খুব সম্ভবত বাগ-ই বাদশাহীর' ফটক ছিল। ১৯০৪-৫ সালে নতুন রাজধানী নির্মাণ কালে ভেঙ্গে ফেলা হয় এই ফটক।[১৮]

সুতরাং ধরে নেয়া যায় মুঘলযুগে সম্পূর্ণ রমনা এলাকা ছিল এরূপঃ দক্ষিণ পূর্বে সাজানো বাগান এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান কলাভবন থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে কার্জন হল এলাকা পর্যন্ত দু'টি আবাসিক এলাকা, মহল্লা সুজাতপুর ও মহল্লা চিশতিয়া। যেখানে তৈফুরের মতে ছিল বাড়ি, বাংলো, সমাধি প্রভৃতি। [১৯]

তবে তৈফুর যেভাবে বর্ননা করেছেন, তাতে মনে হয় সম্পূর্ণ সুজাতপুরই সম্ভবতঃ ছিল ঘরবাড়িতে পূর্ণ, কিন্তু তা সম্ভব ছিল না। মুঘল আমলে (বিশেষ করে যখন সুজাতপুরের পত্তন হয়) মসজিদ নির্মানের দিকেই বেশী মনোযোগ দেয়া হয়, আবাসিক গৃহ নির্মানে নয়।[২০] তাছাড়া এই এলাকায় জনবসতি বেশী থাকলে মসজিদও সংখ্যায় বেশী থাকতো। এখানে কেবল দু'টি মসজিদ রয়েছে।

সুবাদার মুহাম্মদ আজমের সুবাদারীর সময় নির্মিত হয় হাজী খাজা শাহ্বাজের মসজিদ। খাজা শাহ্বাজ ছিলেন ঢাকার একজন বিখ্যাত ব্যবসায়ী। বর্তমানের শহীদুল্লাহ্ হল এলাকা মুঘল আমলে পরিচিত ছিল বাগ-ই-মুসা খান নামে। মুসাখান ছিলেন বাংলার বিখ্যাত বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ঈসা খানের পুত্র। সুবাদার ইসালাম খানের সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন মুসা খান। কিন্তু ইসলাম খান তাঁর সাথে সদয় ব্যবহার করেছিলেন। শহীদুল্লাহ্ হলের পাশেই মুসা খানের দ্বিতল মসজিদ রয়েছে। মসজিদটি মূলতঃ নির্মাণ করেন মুসাখানের পুত্র মুনওয়ার খান। উল্লেখ্য যে, নবাবপুরের কাছে 'মুনওয়ার বাজার' বসিয়েছিলেন মুনওয়ার খান স্বয়ং।[২১]

খাজা অম্বর মসজিদ

স্থাপিত ঃ ১৬৭৭-৭৮ খ্রিঃ

অবস্থান ঃ কাওরান বাজার

Dhaka University Institutional Repository

মিরজুমলার আমলে (১৬৬০–৬৩) ঢাকার উত্তর সীমা বেশকিছুটা বর্ধিত হয়। তিনি শহরের উত্তর সীমানায় একটি দেউড়ী নির্মাণ করেন (বর্তমানের রমনা গেইট)। এছাড়া তিনি ঢাকা টঙ্গি সড়ক এবং টঙ্গি সেতু নির্মাণ করেন। তবে মিরজুমলা নির্মিত ঢাকার প্রবেশ দ্বার থেকে টঙ্গি পর্যন্ত জনবসতি ছিল কম। মিরজুমলা কর্তৃক নির্মিত অপর সড়কটি হচ্ছে ঢাকা নারায়নগঞ্জ সড়ক।২২ তার নির্মিত এদু'টি সড়ক ঢাকার বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রাখে। সপ্তদশ শতাব্দীতে তেজগাঁ এবং কাওরান বাজারের উত্তরে ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের বসতি গড়ে উঠে। কাওরান বাজারে মুঘল আমলে একটি গুরুত্বপূর্ণ "চেক পোষ্ট" ছিল।এখানে তল্লাশীর পর শহরের বিভিন্ন স্থানে লোকজন যেতে পারতো।২৩ শায়েস্তা খানের প্রধান আমাত্য খাজা অম্বর কাওরাণ বাজারে একটি সরাই খানা, পুল, কূয়ো এবং একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। তিন গম্বুজ বিশিষ্ট খাজা অম্বরের মসজিদটি একদা এই স্থানে মুঘলদের কর্মতৎপরতার সাক্ষ্য দিচ্ছে।

দিলকুশা মসজিদ
স্থাপিত ঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে
অবস্থান ঃ দিলকুশা, মতিঝিল।

মতিঝিল গড়ে উঠেছিল মুঘল আমলে। এলাকাটি ছিল মির্জা মুহাম্মদের মহল, মহলের ভেতর ছিল একটি বড় পুকুর। পরবর্তি কালে এর নামে নাম হয় মতিঝিল। মতিঝিল এলাকায় রয়েছে শাহ্জালাল দক্ষিনীর মাযার (১৪৭৬) এই স্থানে বাৎসরিক একটি মেলা বসতো।২৪ দিলকুশায় তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদ রয়েছে।

মগবাজার মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৭০ খ্রিঃ
অবস্থানঃ মগবাজার

মগবাজারের সাথে জড়িত রয়েছে আদিবাসী মগদের স্মৃতি। মগরা বার বার বাংলা আক্রমন করেছিল। ১৬২০ সালে তারা আক্রমন করেছিল ঢাকা, সে সময় মুঘল সুবাদার ইব্রাহিম খান ফতেহজঙ্গ তাদের পরাজিত করেন। সুবাদার দ্বিতীয় ইসলাম খানের সময় (১৬৩৫–৩৯) আরাকানের মগ রাজার ভ্রাতুষ্পুত্র ও গভর্নর মুকুট রায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সুবাদারের কাছে আত্মসমর্পন করেছিলেন। দ্বিতীয় ইসলাম খান ঢাকার যে এলাকায় তাদের বসতি স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন সে এলাকাই মগবাজার নামে পরিচিত হয়।২৫ মগবাজারে ১৬৭০ সালে নির্মিত একটি মসজিদ রয়েছে, বর্তমানে মসজিদের আদি রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

নিমতলী মসজিদ
স্থাপিত ঃ ১৬৮৫ খ্রিঃ
অবস্থান ঃ নিমতলী

নায়েব নাজিম জসরৎ খান (১৭৫৫ খ্রিঃ) যখন বড় কাটরায় থাকতেন তখন নিমতলীতে তার জন্য নির্মিত হতে থাকে একটি প্রাসাদ। প্রাসাদ নির্মিত হলে জসরৎ খান বড় কাটরা ত্যাগ করে তার প্রাসাদে গিয়ে উঠেন। তবে, নায়েব নাজিমের আবাসস্থল গড়ে উঠার পূর্বেই যে নিমতলীতে মুঘল বসতি ছিল, তার প্রমান মেলে নিমতলীতে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের অবস্থান থেকে (১৬৮৫ খ্রিঃ)।

Dhaka University Institutional Repository

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, চার্লস ড'য়লী তার গ্রন্থে ঢাকার পুরানো অনেক মসজিদের কথা বলেছেন। ১৮০৮ সালে তিনি ঢাকার কালেক্টর নিযুক্ত হয়ে আসেন। ইংরেজ কর্মচারী হয়েও ঢাকার স্থাপত্যের প্রতি তাঁর যে অনুরাগ জন্মেছিল তা তার বর্ণনা ও স্কেচে সুস্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ১৮০১ সালের এক জরিপে দেখা গেছে ঢাকায় ২৩৩ টি মসজিদ ছিল কিন্তু ১৮০৮ সালে তিনি এসব মসজিদের অধিকাংশই ভগ্নপ্রাপ্ত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেন। কোম্পানীর আমলে ঢাকার দূর্দশার চিত্র তাঁর বর্ণনা ও স্কেচে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। তিনি ঢাকার ৭টি মসজিদের উল্লেখ করেন।[২৬]

১। ড'য়লী চকবাজার মসজিদ সম্পর্কে এতটুকুই বলেছেন যে, চকবাজারের পেছনে রাজকীয় মসজিদটি বর্তমান ধর্মনিষ্ঠ নবাবের নামাজ আদায়ের স্থান।(চিত্র–৯৬)

২। তিনি চকবাজারে ছোট কাটরার দক্ষিণ দিকে এক গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের কথা বলেছেন। ড'য়লী উল্লেখিত এই মসজিদ থেকে বোঝা যায় যে, চকবাজারে বর্তমানে টিকে থাকা মসজিদ গুলো ছাড়াও আরো মসজিদ ছিল। (চিত্র–৯৭)

৩। ঢাকা থেকে টঙ্গি যাবার পথে ঢাকার উপকণ্ঠে একটি মসজিদের কথা তিনি বলেছেন। সম্ভবতঃ মিরজুমলা কর্তৃক ঢাকা টঙ্গি সড়ক নির্মাণের পরই এই মসজিদ নির্মিত হয়।(চিত্র–৯৮)

৪। ড'য়লী বেগম বাজারের ফটকের নিকটবর্তী একটি মসজিদের উল্লেখ করেছেন, মসজিদটি বুড়িগঙ্গার অতি নিকটে ছিল। মসজিদের সামনে ইতস্তত ছড়ানো ধ্বংসাবশেষ দেখে তাঁর মনে হয়েছে পূর্বেকার কোন প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দিয়ে মসজিদটি তৈরী। বেগম বাজারে করতলাব খানের মসজিদ ছাড়াও যে আরো মসজিদ ছিল তা ড'য়লীর বর্ণনা থেকে উপলব্ধি করা যায়। (চিত্র–৯৯)

৫। তিনি সাতগম্বুজ মসজিদকে গঙ্গার শাখা তীরস্থ মসজিদ নামে ব্যাখ্যা করেছেন। মসজিদের যে চিত্র তাঁর গ্রন্থে রয়েছে তার সাথে বর্তমানের সাত গম্বুজ মসজিদের (১৬৮০) সাদৃশ্য রয়েছে।(চিত্র–১০০)

৬। সাইফ খানের মসজিদ হিসেবে ড'য়লী তিন গম্বুজ বিশিষ্ট একটি মসজিদের বর্ণনা দিয়েছেন। মসজিদের নির্মাণ কাল সম্পর্কে তিনি বলেছেন জাহাঙ্গিরের রাজত্বকালে রাজা মোহন সিং (সম্ভবতঃ মান সিংহ) কর্তৃক এ মসজিদের গোড়াপত্তন হয়, আদিতে এটিকে মন্দির হিসেবে নির্মাণ করার ইচ্ছে থাকলেও এই অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অচিরেই অভিষ্ট লক্ষ্য পরিবর্তিত হয়ে যায়। মসজিদের নির্মাণ কাজ সাঈফ খান শেষ করেন। সম্ভবতঃ মসজিদটি রহমত গঞ্জে প্রতিষ্ঠিত ছিল কারণ, তিনি উল্লেখ করেছেন যে, রহমত গঞ্জের জমি ও বসত বাটির রাজস্ব থেকে এই মসজিদের ব্যয় নির্বাহ হতো।(চিত্র–১০১)

৭। ড'য়লী মগবাজারের মসজিদ নামে একটি মসজিদের স্কেচ তার গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু মসজিদের কোন বর্ণনা নেই। (চিত্র–১০২)

মোটামুটি ভাবে ড'য়লী চক, টঙ্গি, বেগম বাজার, মোহাম্মদপুর, রহমতগঞ্জ ও মগবাজার এলাকায় সাতটি মসজিদের উল্লেখ করেছেন।

ড'য়লী তার গ্রন্থে যেসব মসজিদের বর্ণনা বা উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে বর্তমানে সাতগম্বুজ মসজিদ ও চক মসজিদের অস্তিত্ব রয়েছে। তিনি মগবাজারে যে মসজিদের উল্লেখ করেন সেই মসজিদ এবং বর্তমানে মগবাজারে ১৬৭০ সালে নির্মিত যে মসজিদ রয়েছে (বর্তমানে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত) তা একই মসজিদ হতে পারে বলে অনুমান করা যায়।

ড'য়লীর গ্রন্থে আরো দুটি মসজিদের স্কেচ রয়েছে।[২৭] কিন্তু এই মসজিদ গুলোর অবস্থান কোথায় তা জানা যায়

Dhaka University Institutional Repository

না বা এদের কোন বর্ননা নেই (চিত্র–১০৩, ১০৪)। বস্তুতঃ ড'য়লীর দেখা অধিকাংশ মসজিদই বর্তমানে নেই। উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই তিনি মসজিদগুলো ভগ্নপ্রাপ্ত ও লতাগুল্মে আচ্ছাদিত অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর দেখা সেসব মসজিদের অস্তিত্ব যদি আজ থাকতো তাহলে এ বিষয়ে আমাদের তথ্য নিঃসন্দেহে আরো সমৃদ্ধ হতো। ড'য়লী বলেছেন যে, ঢাকায় নির্মিত মসজিদ গুলোর নির্মাণ কাল লক্ষ্য করলে উপলব্ধি করা যায় যে, এদের অধিকাংশই নির্মিত হয়েছিল ঢাকার বানিজ্যিক সমৃদ্ধির স্বর্ণযুগে অর্থাৎ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে। অনেকগুলো মসজিদ আরো পরবর্তী সময়ের তবে সতের শতকের শেষভাগ এবং আঠারো শতকের সূচনা কালেই যে ঢাকার যাবতীয় মহার্ঘ স্থাপত্যের সৃষ্টি হয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই।[২৮]

সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে, ঢাকায় প্রাচীন যেসব মসজিদ বর্তমানে টিকে রয়েছে এবং ছিল তার ভিত্তিতে মুঘলযুগে ঢাকার বিকাশের বিষয় এবং জনসংখ্যার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে ধারণা অনেকটাই সুস্পষ্ট হয়।

সুলতানী যুগে ঢাকা গড়ে উঠেছিল মূলতঃ বাবু বাজারের পূর্ব, উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্বের এলাকা নিয়ে। মুঘলযুগের ঢাকা গড়ে উঠে প্রধানতঃ বাবু বাজারের পশ্চিম দিকে, তবে বাবু বাজারকে সুলতানী ও মুঘল যুগের ঢাকার চুড়ান্ত সীমারেখা হিসেবে চিহ্নিত করা যায় না। কারণ, লক্ষ্য করা গেছে যে, বাবু বাজারের পূর্ব এবং উত্তর পূর্বে মুঘল বসতি ছিল। ইসলামপুরের পত্তন হয়েছিল অনেকটা পুরানো ও নতুন ঢাকার সংমিশ্রণে। ইসলাম খানের সময় থেকে শায়েস্তা খানের সময় পর্যন্ত (১৬১০–১৬৮৮) ইসলামপুরের গুরুত্বছিল যথেষ্ট। এ ছাড়া চকবাজার, লালবাগ, আজিমপুর এসব প্রতিটি স্থানই মুঘল যুগে বিশেষ প্রাধান্য পূর্ণ ছিল। চকবাজারের গুরুত্ব ছিল দ্বিবিধ। প্রথমতঃ প্রশাসনিক, দ্বিতীয়তঃ বাণিজ্যিক। তবে বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবেই চকের পরিচিতি ছিল বেশী।

লালবাগের পরিচিতি ছিল প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে। সরকারী কর্মচারীদের আবাসিক এলাকা হিসেবে গড়ে উঠে লালবাগের নিকটবর্তী আজিমপুর। আজিমপুরের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত পীলখানায় ছিল সৈন্যছাউনী আর হাতিশালা। অন্যদিকে মুহম্মদপুরে গড়ে উঠেছিল মুঘলদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। শুল্ক কেন্দ্র হিসেবে পরিচিত ছিল মিরপুরের শাহ্‌বন্দর।[২৯] কাওরান বাজারেও অনুরূপ আরেকটি শুল্ক কেন্দ্র ছিল। রমনা এলাকায় যে দুটি মহল্লা গড়ে উঠে তার সিংহভাগ স্থান জুড়ে ছিল মুঘলদের মনোরম উদ্যান। কাজেই বলা যায় প্রধানতঃ বাবুবাজারের পশ্চিম দিকে মুঘল ঢাকার বিকাশ হতে থাকে। অন্যদিকে মিরজুমলা নির্মিত সড়ক ধরে শহরের উত্তর দিকে ঢাকার কিছুদূর বিকাশ হয়। তবে এদিকে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল কম।

ঢাকার বিভিন্ন স্থানে একই সময় নির্মিত বিভিন্ন মসজিদ প্রত্যক্ষ করে এবিষয়টি অনুধাবন করা যায় যে, বুড়িগঙ্গা নদীর তীর ধরে এবং উচু স্থান দেখে একই সময় ঢাকার বিভিন্ন স্থানে মুঘল বসতি গড়ে উঠেছিল। সুতরাং মুঘলযুগে ঢাকার বিকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন এলাকার পত্তনের সময়ের কোন কালানুক্রমিক চিত্র নেই। মুঘলরা যখন যেস্থান গুরুত্বপূর্ণ ও সুবিধাজনক মনে করেছিলেন তখনই সেই স্থানে বসতি স্থাপন করেন। তাদের বসতি অঞ্চলের কোন কোনটিতে ইতিপূর্বেই অর্থাৎ সুলতানী যুগে অথবা প্রাক–মুসলিম যুগে জনবসতি ছিল। তথাপি এ বিষয় নিঃসন্দেহে বলা যায় মুঘলরা সংক্ষিপ্ত পরিসরের ঢাকাকে ক্রমশঃ একটি বৃহত্তর পরিধিতে নিয়ে আসেন এবং এই বৃহত্তর পরিধির ঢাকায় ক্রমান্বয়ে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছিল। ইসলামপুর, চকবাজার, লালবাগ, আজিমপুর, মুহাম্মদপুর প্রভৃতি এলাকায় মসজিদের সংখ্যার প্রতি দৃকপাত করে উপলব্ধি করা যায় মুঘলযুগে এসব গুরুত্বপূর্ণ স্থানে জনসংখ্যার ঘনত্ব ছিল বেশী।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় মুঘল সুবা বাংলার রাজধানীর পত্তনের পর ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে যেমন ঢাকার বিকাশ হতে থাকে তেমনি একই ভাবে এখানে জনসংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। ১৭১৭ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হলে ঢাকার গুরুত্ব যেমন হ্রাস পায় তেমনি জনসংখ্যাও কমতে থাকে। ১৮০৮ সালে ঢাকায় কালেক্টর হয়ে আসা স্যার চার্লস ড'য়লীর বর্ণণা ও আঁকা স্কেচ থেকে উপলব্ধি করা যায় ঢাকা কতটা জনশূন্য ছিল এবং ঢাকার জৌলুস কতটা নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছিল।

পাদটিকা ঃ

(১) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃঃ ২৩৯

(২) Abdul Karim, *Corpus of the Arabic and Persian Inscrsiption of Bengal*, Dhaka, 1992, p, 464

(৩) রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, ঢাকা ১৯৮২, পৃঃ ৪৪

(৪) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ১৭৪–৭৫

(৫) S.M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka*, Dhaka, 1957, p. 87

(৬) মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ৬৮

(৭) স্যর চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, শাহ্ মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ১১

(৮) মু, মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ৭০

(৯) রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা*, পৃঃ ৮০

(১০) মু, মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ১৩২

(১১) প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৬১

(১২) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩

(১৩) প্রাগুপ্ত, পৃঃ ২

(১৪) S.M. Taifoor, *Glimpses*, p. 203

(১৫) মু, মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২

(১৬) চালর্স ডয়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন*, পৃঃ ২০–২১।

(১৭) মু, মামুন, *ঢাকা*, পৃঃ ২৪২–৪৩

(১৮) S. M. Taifoor, *Glimpses*, p. 335

(১৯) প্রাগুক্ত, ৩৩৬

(২০) মু, মামুন, *ঢাকা*, ২৪৩

(২১) প্রাগুক্ত, ২৩৯

(২২) A. Karim, 'Origin and Development of Mughal Dhaka', in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka 1991, p. 32.

(২৩) S. M. Taifoor. *Glimpses*, p. 213

(২৪) মু, মামুন, *ঢাকা*, ২০৪

Dhaka University Institutional Repository

(২৫) প্রাগুক্ত, ২০২

(২৬) ড'য়লীর গ্রন্থে এসব মসজিদের উল্লেখ রয়েছে যথাক্রমে পৃঃ ১১, ৯, ১০, ১০, ২১, ২২, ১৯,

(২৭) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১ ও ১৩।

(২৮) প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১

(২৯) K. M. Mohsin, ' Commercial and Industrial Aspect of Dhaka in Eighteenth Century', in Sharifuddin Ahmed (ed.), *Dhaka Past Present Future*, Dhaka, 1991, p. 69.

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ঢাকার মসজিদ স্থাপত্যের সংস্কার ঃ ঐতিহ্যের বিলুপ্তি

ঢাকায় সুলতানী ও মুঘল যুগের যে ৩৩টি মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো তার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যে, খুব কম সংখ্যক মসজিদই আদি অবয়ব নিয়ে অপরিবর্তিত অবস্থায় বিরাজ করছে। অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে বিলুপ্ত হতে চলেছে আমাদের ঐতিহ্যের নির্দশন সমূহ।

মসজিদ গুলোকে তাদের বর্তমান অবস্থাভেদে তিনটি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়।এর ফলে, প্রতিটি মসজিদ সংস্কার ও পরিবর্তনের ফলে যে রূপ পরিগ্রহ করেছে তা সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়বে।

এই তিনটি শ্রেণী হচ্ছেঃ

১. প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন মসজিদ
২. পুরাতন মসজিদের সাথে নতুন সংযোজন
৩. সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মসজিদ

প্রতিটি শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত মসজিদগুলোকে আমরা একে একে আলোচনা করবো।

১। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন মসজিদ ঃ

ঢাকায় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে কয়েকটি মসজিদ রয়েছে। এইসব মসজিদের সামগ্রিকভাবে সংরক্ষণ ভালো হচ্ছে। এই বিভাগের অধীনে পাঁচটি মসজিদ রয়েছে ঃ

ঈদগাহ্ মসজিদ, লালবাগ দুর্গ মসজিদ, হাজী খাজা শাহ্বাজ মসজিদ, সাত গম্বুজ মসজিদ এবং মির্ধা মসজিদ।

ঈদগাহ, ১৬৪০ঃ

দীর্ঘদিন ধরে ঈদগাহ্র পশ্চিম দিকের দেয়ালটি কেবল টিকে ছিল। সাম্প্রতিক ঈদগাহ্র সংস্কার করা হয় অনেকটা মূল পরিকল্পনা অনুসরণ করে। ঈদগাহ্র সংস্কার উত্তম হলেও এর দক্ষিণ পূর্ব কোনে একটি মসজিদ নির্মিত হওয়ায় পূর্বদিক থেকে ঈদগাহ্টি অনেকটা আড়াল পড়ে গেছে। এই মসজিদের মিহ্রাবের বর্ধিত অংশ ঈদগাহ্র পূর্ব দিকের দেয়ালের ভিতরের দিকে দেখা যায়, ফলে তা সম্পষ্টতই দৃষ্টি কটু। মসজিদটি ঈদগাহ্ থেকে কিছুটা দূরত্বে নির্মাণ করলে এই ত্রুটিটি দূর করা সম্ভব হতো। (চিত্র – ১৭)

লালবাগ দুর্গ মসজিদ, ১৬৭৮ ঃ

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে মসজিদটির সংস্কার ও সংরক্ষণ হওয়াতে মসজিদটির অবস্থা ভালো রয়েছে। সর্বোপরি লালবাগ দূর্গের সুপরিসর আঙ্গিনার অভ্যন্তরে মসজিদটি প্রতিষ্ঠিত থাকায় মসজিদের পাশ ঘেষে কোন ইমারত গড়ে উঠতে পারেনি; যেমনটি ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদের ক্ষেত্রে ঘটেছে। এই মসজিদের পূর্বদিকে বাঁশ ও ত্রিপোল দিয়ে অস্থায়ী ভাবে নামাজ পড়ার উপযোগী ব্যবস্থা নেয়া হয়, এই দৃষ্টান্ত ঢাকার পুরাতন অন্যান্য মসজিদের ক্ষেত্রে গ্রহন করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

খাজা শাহ্‌বাজ মসজিদ, ১৬৭৯ ঃ

খাজা শাহ্‌বাজের মসজিদ ও সমাধি যে আঙ্গিনায় রয়েছে তার অভ্যন্তরে প্রবেশের প্রধান পথ ছিল আদিতে পূর্ব দিকে। বর্তমানে পূর্বদিকে শিশু একাডেমী ও অন্যান্য ইমারত নির্মিত হওয়ায় পূর্বেকার প্রবেশ পথটি বন্ধ হয়ে গেছে অথচ এই পথটি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত ছিল। মসজিদের দক্ষিণ পশ্চিম দিকে নির্মিত হয়েছে তিন নেতার মাজারের উচু সমাধি সৌধ। সমাধি সৌধের উচু স্থাপত্য পশ্চিম দিক থেকে মসজিদটিকে অনেকাংশে ঢেকে দিয়েছে। পুরাতন এই মসজিদটির সন্নিকটে উচু একটি সমাধি সৌধ নির্মাণ করার পূর্বে এই ঐতিহ্যবাহি মসজিদটির অবস্থানের কথা বিবেচনা করে দেখা উচিত ছিল। আধুনিক স্থাপত্য ঐতিহ্যবাহি স্থাপত্যকে কিভাবে গ্রাস করে তার স্পষ্ট দৃষ্টান্ত এই মসজিদটি লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। (চিত্র – ৪৪)

সাত গম্বুজ মসজিদ, ১৬৮০ ঃ

সাত গম্বুজ মসজিদের ছাদে বর্তমানে অর্ধবৃত্তাকার যে তিনটি গম্বুজ লক্ষ্য করা যায়, আদিতে গম্বুজ গুলোর আকৃতি অনুরূপ ছিল কিনা, তাতে সন্দেহ রয়েছে। ১৮০৮ সালে চালর্স ড'য়লীর আঁকা চিত্রে গম্বুজ তিনটির আকৃতি ভিন্নরূপ লক্ষ্য করা যায়, অনেকটা ছাতার আকৃতি বিশিষ্ট।[১] (চিত্র –) তবে কর্ণার টাওয়ার গুলোর শীর্ষের কপুলার আকৃতি বর্তমানের মত অর্ধবৃত্তাকার ছিল। ১৮০৮ সালের পরবর্তী সময়ে সম্ভবতঃ মসজিদটির সংস্কার কালে গম্বুজগুলো বর্তমান আকৃতি (অর্ধবৃত্তাকার) প্রাপ্ত হয়। তবে গম্বুজ গুলোর আকৃতি পরিবর্তিত হলেও তা ইমারতের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। বিশেষতঃ কর্নার টাওয়ার শীর্ষের কপুলাগুলোর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।
সাম্প্রতিক কালে মসজিদের উত্তর পশ্চিম দিকে একটি বহুতল মাদ্রাসা ভবন নির্মিত হয়েছে। মসজিদ ও তার পারিপার্শ্বিক এলাকা নিয়ে যে চমৎকার দৃশ্যপটের সূচনা হয়েছিল তা এই উচু মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের ফলে ম্লান হয়ে গেছে। মাদ্রাসা ভবন নির্মাণে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু এরূপ একটি পুরাকীর্তির পেছনে এ ধরনের একটি উঁচু ভবন নির্মাণ কোন অবস্থাতেই যুক্তিসঙ্গত হয়নি। প্রকৃতপ্রস্তাবে এ বিষয়টি পুরাকীর্তির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাবোধের অভাবের কথাই তুলে ধরে।(চিত্র –৫২)

মির্ধা মসজিদ, ১৭০৪ ঃ

মির্ধা মসজিদের সংরক্ষণ ভালো হলেও মসজিদের আঙ্গিনার উত্তর দিকের দেয়ালের বাইরে বহুতল বিশিষ্ট একটি অট্টালিকা নির্মিত হয়েছে, এই ভবনটি নির্মানের ফলে মসজিদের পরিপার্শ্বিক সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়েছে। এমনিভাবে যদি মসজিদের চার পাশ ঘিরে বহুতল বিশিষ্ট ইমারত গড়ে উঠতে থাকে তাহলে মসজিদটি অচিরেই সম্পূর্নভাবে আমাদের দৃষ্টির আন্তরালে চলে যাবে। (চিত্র – ৬৭)

সামগ্রিক ভাবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে মসজিদগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, এই সব মসজিদের সংরক্ষণ ভালো হচ্ছে। তবে এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কেবল মসজিদটি রক্ষা করলেই চলবে না, পারিপার্শ্বিক এলাকাটিও যেন পুরাকীর্তির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ থাকে। লক্ষ্য করা গেছে সাত গম্বুজ মসজিদ, খাজা শাহবাজ মসজিদ, মির্ধা মসজিদ প্রভৃতিতে পারিপার্শ্বিক এলাকার সামঞ্জস্য অধুনা ক্ষুন্ন হয়েছে। ঢাকার পুরাতন আরো কিছু মসজিদকে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীনে এনে যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

২। পুরাতন মসজিদের সাথে নতুন সংযোজন ঃ

ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদই সংস্কারের কারণে এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই শ্রেণীভুক্ত মসজিদ গুলোতে দেখা গেছে আদি মসজিদের বিভিন্ন রকম অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ।

বিনত বিবির মসজিদ, ১৪৫৬ ঃ

মসজিদটি ঢাকার সর্বপ্রাচীন টিকে থাকা মসজিদ হলেও বিষয়টির প্রতি গুরুত্ব দেয়া হয়নি। অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের ফলে ইমারতের কতটা ক্ষতি হতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মসজিদটি। এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির এই মসজিদকে সম্প্রসারণ কল্পে মসজিদের পশ্চিম ও দক্ষিন দিকের দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে ফেলা হয় এবং পূর্ব দিকের দেয়ালের ঘনত্ব কিছুটা হ্রাস করা হয়। সম্প্রসারিত অংশের পূর্ব দিকে অতিরিক্ত তিনটি প্রবেশ দ্বার নির্মাণ করা হয় এবং এর সাথে সাদৃশ্য রেখে মসজিদের আদি পূর্বাংশের খিলানযুক্ত প্রবেশ দ্বারগুলোকে সমান্তরাল করা হয়। ফলে, একসময় আদি মসজিদের প্রবেশ পথ যে খিলানযুক্ত ছিল তা এখন বোঝা যায় না। আদি মসজিদের পূর্ব দিকের দেয়ালের দরজা গুলোর উচ্চতা সম্প্রসারিত পূর্বাংশের দেয়ালের দরজাগুলো উচ্চতা অপেক্ষা নীচু; ফলে তা দৃষ্টিকটু দেখায় (চিত্র -৪)। উত্তর দিকের আদি দেয়ালটি অক্ষুন্ন থাকলেও প্রবেশ পথটি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। মসজিদের ওপরে দু'টি তলা নির্মাণ করার ফলে মসজিদের আদি গম্বুজটি সম্পূর্ণ ঢাকা পড়ে গেছে। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় অধুনা নির্মিত ত্রিতল এই মসজিদটির মধ্যে আদি মসজিদের কিছু বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন থাকলেও অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের ফলে দৃশ্যতঃ পুরাতন মসজিদকে তেমন বোঝা যায়না। অথচ পরিকল্পনা অনুযায়ী সম্প্রসারণ করলে মসজিদটিকে অখন্ড অবস্থায় রক্ষা করা যেতো। উদাহরণ স্বরূপ মুহাম্মদপুরের আল্লাকুরী মসজিদে কথা বলা যায়। এই মসজিদটি (১৬৮০) বিনত বিবির মসজিদের অনুরূপ এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির। মসজিদের সম্প্রসারণ কল্পে মূল মসজিদের কোন ক্ষতি না করে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে কিছু অংশ সম্প্রসারণ করে সম্প্রসারিত অংশের ওপরে টিনের চাল দেয়া হয়েছে। যদিও এই সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটি বাইরে থেকে অনেকটা আড়াল পড়ে গেছে তথাপি বলা যায় মূল মসজিদটির কোন ক্ষতি হয়নি। মসজিদটি তার আদিরূপ নিয়ে অখন্ড অবস্থায় বিরাজ করছে। বিনত বিবির মসজিদের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ভাবে সম্প্রসারণ ঘটানো হলে মূল মসজিদটিকে রক্ষা করা যেতো।

মিরপুর মাজার মসজিদ, ১৪৮০ ঃ

মিরপুর মাজার মসজিদটিতে বহুবার সংস্কার করা হলেও এর মূল কাঠামোটি অক্ষুন্ন রয়েছে। মসজিদটির কোন রকম সম্প্রসারণ হয়নি। তবে মসজিদের বর্তমান রূপের মধ্যে মুঘল স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য অধিক প্রতিয়মান। দৃশ্যতঃ বোঝার উপায় নেই যে এটি সুলতানী যুগের একটি মসজিদ। প্রকৃতপক্ষে বিভিন্ন সময়ের সংস্কারে মসজিদে মুঘল যুগের স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যের সঞ্চার ঘটেছে। সাম্প্রতিক কালে মসজিদের সম্মুখের চত্বরে নানা বর্ণের টালি বসানো হয়েছে। এছাড়া মসজিদে রঙ ও টাইলস্ দিয়ে জমকালো ও আধুনিক ভাব আনার প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, যা এই পুরাতন স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ (চিত্র-৭)। মূলতঃ মসজিদটিকে তার আদি অবয়বে রাখাই বাঞ্চনীয় ছিল। সুলতানী যুগের মসজিদ ঢাকায় কেবল তিনটি থাকায় এই মসজিদটির যথাযথ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম খানের মসজিদ, ১৬১০-১৩ ঃ

এই মসজিদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় যে, তিন গম্বুজ বিশিষ্ট আদি মসজিদটি মোটামুটি অক্ষত থাকলেও মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করে দোতলা করা হয়েছে, ফলে পুরাতন মসজিদটি সম্পূর্ণভাবে আড়াল পড়ে গেছে। কেবল মসজিদের অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেই আদি মসজিদটি বোঝা যায়। আদি মসজিদের কিছু বৈশিষ্ট্য সম্প্রসারণ কালে বিনষ্ট করা হয়েছে, পূর্ব দিকে তিনটি খিলান যুক্ত প্রবেশ দ্বারকে সমান্তরাল দরজায় পরিণত করা হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে প্লাস্টারে বিভিন্ন রঙ দেয়ার ফলে আদি মসজিদের ভাবগাম্ভির্য বিনষ্ট হয়েছে (চিত্র –১০)। ঐতিহ্যবাহী পুরাতন এই মসজিদটিকে অখন্ড অবস্থায় রক্ষা করার প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ ভাবে মসজিদটির সাথে জড়িত রয়েছে ঢাকায় মুঘল রাজধানী প্রতিষ্ঠাতার ইতিহাস।

হাজী বেগ মসজিদ, ১৬৪২ ঃ

পলাশীর হাজী বেগ মসজিদটি মোটামুটি ভাবে অক্ষত অবস্থায় থাকলেও মসজিদ কক্ষকে উত্তর দিকে কিছুটা সম্প্রসারণ করে এর আদি অবস্থাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে, সর্বোপরি মসজিদের উত্তর দিকের খিলান আকৃতির যে তিনটি প্রবেশ পথ ছিল তার মধ্যবর্তী খিলানযুক্ত প্রবেশ পথ অবিকৃত থাকলেও দু'পাশের দুটির উপরিভাগ সমান্তরাল করা হয়, এই পরিবর্তনটি ছিল অনাবশ্যক এবং স্পষ্টতই এতে স্থাপত্য বৈশিষ্ট্য ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। সম্প্রসারিত পূর্বাংশে তিনটি প্রবেশ পথ করা হয়েছে lintel এর সাহায্যে সমান্তরাল করে, অথচ একই দিকে মসজিদের আদি অংশের প্রবেশ পথ তিনটি খিলান আকৃতির, ফলে দৃশ্যতঃ মসজিদের সাম্প্রতিক সম্প্রসারণ মূল মসজিদের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। সাম্প্রতিক কালে মসজিদের আঙ্গিনার চারপাশ ঘিরে যে বেষ্টনীর দেয়াল দেয়া হয়েছে তাতে দেখা যায় বেষ্টনীর দক্ষিণ দিকের দেয়াল দিয়ে মসজিদের দক্ষিণ পূর্ব দিকের কর্ণার টাওয়ার আড়াল পড়ে গেছে। ফলে দেখলে মনে হবে এদিকের কর্ণার টাওয়ার বিলুপ্ত হয়ে গেছে। কিছুটা সতর্কতা অবলম্বন করলে এসব ত্রুটি এড়ানো যেতো এবং এখনো তা দূর করা সম্ভব। দক্ষিণ দিকের দেয়াল নতুন করে দেয়া যায় যাতে মসজিদের দক্ষিণ পূর্বের কর্নার টাওয়ার দেখা যায়। মসজিদ কক্ষের উত্তর দিকে সম্প্রসারিত অংশকে নির্মূল করে মসজিদকে তার পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদ, ১৬৬৪ ঃ

এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদটিও অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে তার আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটাই হারিয়ে ফেলেছে। দক্ষিণ দিকে মসজিদের আদি এক গম্বুজ বিশিষ্ট কক্ষের অনুরূপ সম্প্রসারণ করা হয় এবং পূর্বদিকে দোতলা করে সম্প্রসারণ করা হয়। এ ধরণের সম্প্রসারণের ফলে আদি মসজিদটি তেমন বোঝা যায় না। অথচ এই মসজিদটিকেও তার আদি অবস্থায় রক্ষা করা যেতো এবং সম্প্রসারণ করতে হলে আল্লাকুরী মসজিদের ন্যায় ব্যবস্থা গ্রহন করা যেতো।

সমজিদের সাম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে (জানুয়ারী '৯৫) লক্ষ্য করা যায় যে, ইতিপূর্বে মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্যের যতটুকু অবশিষ্ট ছিল তা বিলুপ্ত করে সম্পূর্ণ নতুন করে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

চক মসজিদ, ১৬৭৬ ঃ

চক বাজার মসজিদটি ছিল মুঘল ঢাকার সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ। অথচ এবিষয়ের প্রতি কোন লক্ষ্য না রেখে অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ করে মসজিদটিকে ব্যপকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করা হয়েছে। উচু ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত মসজিদের আদি গম্বুজ তিনটি ভেঙ্গে দোতলা নির্মাণ করা হয়। স্থাপত্য বৈশিষ্ট্যকে এভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে দোতলা নির্মানের কোন যৌক্তিকতা নেই। মসজিদের সম্মূখের প্লাটফর্মের কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়। কিন্তু এই সম্প্রসারন হয়েছে বৈসাদৃশ্যপূর্ন ভাবে। নতুন সম্প্রসারিত অংশের মেঝে অপেক্ষাকৃত উচু। ঢাকার এই ঐতিহ্যবাহী মসজিদটি সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাবে হারিয়েছে তার পূর্বেকার স্বকীয়তা। একসময় মসজিদটি মুঘল ঢাকায় যে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা রেখেছিল, এখন আর তা বোঝার উপায় নেই।

খাজা অম্বর মসজিদ, ১৬৭৭-৭৮ ঃ

কাওরান বাজারস্থ খাজা অম্বর মসজিদটি অক্ষত অবস্থায় থাকলেও ৮০–এর দশকে মসজিদের পূর্ব দিকে চারতলা বিশিষ্ট একটি মসজিদ ভবন নির্মাণ করার ফলে পুরাতন মসজিদের পূর্বেকার গুরুত্ব ক্ষুন্ন হয়েছে। আদি মসজিদের পূর্ব দিকের প্রবেশ পথটি এখন রুদ্ধ হয়ে গেছে, নতুন নির্মিত মসজিদের ভেতরের প্রবেশ পথ দিয়ে আদি মসজিদে প্রবেশ করতে হয়। উচু ভবনটি আদি মসজিদকে পূর্ব দিক থেকে সম্পূর্ন আড়াল করে দিয়েছে (চিত্র – ৩৩)। অধিকাংশ লোকই এখন নতুন মসজিদে নামাজ পড়তে আসেন এবং পুরাতন মসজিদটি অনেকটা অবহেলার শিকার হয়ে পড়েছে। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, পুরাতন মসজিদের সম্মুখে এতবড় একটি ভবন নির্মান করে মসজিদের অতীত গৌরব ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করা হয়েছে। পরিতাপের বিষয় এই যে, এই উচু মসজিদ ভবন নির্মিত হয়েছে সরকারী উদ্যোগ। সাধারন জনগনের ইতিহাস সচেতনতা না থাকতে পারে; কিন্তু যে সব ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ সরকারী উদ্যোগ সংস্কার ও সম্প্রসারন করা হচ্ছে সেসব ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা গ্রহন করা হবে তা আশা করা অযৌক্তিক হবে না।

এক্ষেত্রে বলা যায় সরকারী উদ্যোক্তাদের ঐতিহ্যের প্রতি অবহেলার কারনেই এধরনের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ সম্ভব হয়েছে। নতুন মসজিদটি নিকটবর্তী কোন স্থানে নির্মিত হতে পারতো। খাজা অম্বরের মত একটি ঐতিহ্যবাহী মসজিদের সাথে নতুন একটি ইমারতের সংযোজনের কোন যুক্তিসঙ্গত কারন নেই।

শায়েস্তা খানের মসজিদ, ১৬৬৪-৭৮ ঃ

শায়েস্তা খানের তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটি অনেকটা অবহেলার শিকার। মিটফোর্ড হাসপাতালের চত্বরে অবস্থিত মসজিদের চারপাশে হাসপাতালের বিভিন্ন ভবন রয়েছে, ফলে বাইরে থেকে মসজিদটি তেমন বোঝা যায় না। মসজিদের পূর্বদিকে কিছুটা সম্প্রসারন করে উপরে টিনের চাল থাকাতে মসজিদের পূর্বদিক অনেকটা আড়াল পড়ে গেছে (চিত্র–৩৫)। তবে, পূর্ব দিকের এই সম্প্রসারিত অংশকে নির্মূল করে মসজিদটি যথাযথ সংরক্ষনের ব্যবস্থা নেয়া যায়।

Dhaka University Institutional Repository

মুসা খানের মসজিদ, ১৬৭৯ ঃ

মুসা খানের দ্বিতল মসজিদের কোন সম্প্রসারণ না হলেও মসজিদটির যথাযথ সংরক্ষনের অভাব রয়েছে। মসজিদের প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর অবস্থা ভাল নয়, কোন কোন কক্ষের দেয়ালের পালেস্তরা খসে ইট বেড়িয়ে পড়েছে (চিত্র –৪৮)। এই কক্ষগুলোর আশু সংস্কার প্রয়োজন। মসজিদের আঙ্গিনাটিও অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় রয়েছে–সর্বত্রই বড় বড় ঘাস ও ঝোপ–ঝাড় গজিয়েছে। মসজিদের আশে পাশে বিভিন্ন ইমারত থাকায় মসজিদটি ভালো করে দেখা যায় না। ঝোপ–ঝাড় পরিষ্কার করে, প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর সংস্কার করে মসজিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন; বিশেষ করে এই মসজিদের সাথে জড়িয়ে রয়েছে বাংলার বারো ভূঁইয়ার অন্যতম ঈসা খানের পুত্র মুসা খানের নাম।

বংশাল মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) ঃ

বংশালের এই মসজিদটির মূল কাঠামো অক্ষত অবস্থায় থাকলেও মসজিদের পূর্ব, দক্ষিণ ও উত্তর দিকে সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের সম্মুখ ভাগ দেখা যায় না (চিত্র –৫৮)। সুতরাং মসজিদের এইরূপ বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারণ করা যুক্তিসঙ্গত হয়নি।

আল্লাকুরী মসজিদ, ১৬৮০ ঃ

এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির আল্লাকুরী মসজিদের সামগ্রিক অবস্থা ভালো বলা যায়। মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করে উপরে টিনের চাল দেয়ায় মসজিদের সম্মুখ ভাগ আড়াল পড়ে গেছে (চিত্র –৫৪)। তবে, আমাদের সৌভাগ্য এই যে, সম্প্রসারণ লক্ষ্যে মূল মসজিদের কোন ক্ষতি করা হয়নি অথচ ঢাকার অপরাপর এক গম্বুজ বিশিষ্ট বর্গাকৃতির মসজিদে (বিনত বিবি, হায়াৎ ব্যাপারী) অপরিকল্পিত সম্প্রসারণে আদি মসজিদের ব্যপক ক্ষতি করা হয়েছে। এই মসজিদটি বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় থাকলেও আগামিতে কতটা থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ, স্থানীয় লোকদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে যে, মসজিদটি দ্বিতল করার পরিকল্পনা নেয়া হচ্ছে। কাজেই ভবিষ্যতে মসজিদকে দোতলা করতে গিয়ে আদি মসজিদের কোন ক্ষতি করা হবে না তা নিশ্চিতরূপে বলা যায়না। মসজিদের চারপাশে অনেক দোকান পাট রয়েছে ফলে স্থানটি ঘনবসতিপূর্ণ।

নিমতলী মসজিদ, ১৬৮৫ ঃ

এক গম্বুজ বিশিষ্ট নিমতলী মসজিদের মূল কাঠামো অক্ষুন্ন থাকলেও অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। আদি মসজিদের উত্তর দিকের দেয়াল সম্পূর্ণ ভেঙ্গে উত্তর দিকে কিছুটা সম্প্রসারণ করা হয়। এভাবে সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের মূল কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করে দোতলা নির্মাণ করার ফলে আদি মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে আড়াল পড়ে গেছে। মসজিদের পূর্ব দিকে এরূপ সম্প্রসারণ করে মসজিদের আদিরূপকে বিনষ্ট করা হয়েছে।
মসজিদের সম্প্রতিক পর্যবেক্ষণে (মার্চ '৯৫) লক্ষ্য করা যায় আদি মসজিদকে সম্পূর্ণ ভেঙ্গে বহুতল বিশিষ্ট নতুন একটি মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ভাট মসজিদের, ১৬৮৫ ঃ

তিনগম্বুজ বিশিষ্ট এই মসজিদের কাঠামোগত কোন পরিবর্তন না হলেও পূর্ব দিকের অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে মসজিদের সম্মুখ ভাগ বাইরে থেকে দেখা যায় না। মসজিদের ছাদের তিনটি গম্বুজের মধ্যে মধ্যবর্তী প্রশস্ত গম্বুজটির আকৃতি পার্শ্ববর্তী দুটোর অপেক্ষা ভিন্নতর অর্থাৎ মধ্যবর্তী গম্বুজটি কিছুটা নীচু ধরণের (squat) এবং পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দুটি উচু। অনুমান করা যায় মসজিদের তিনটি গম্বুজের আকৃতি একই রকম অর্থাৎ নীচু ধরণের ছিল। সম্ভবতঃ কোন সময় সংস্কার কালে পার্শ্ববর্তী গম্বুজ দু'টোর আকৃতির পরিবর্তন করা হয়। ফলে এখন তা স্পষ্টতঃ দৃষ্টিকটু। কারণ, গম্বুজ গুলোর মধ্যে সামঞ্জস্যের অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

দিলকুশা মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে) ঃ

দিলকুশা মসজিদের মূল কাঠামো অক্ষুন্ন থাকলেও মসজিদের সাম্প্রতিক সংস্কার ও পরিবর্তন মসজিদের আদি রূপকে বিনষ্ট করেছে বহুলাংশে। মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের দু'পাশে যে তিনটি জানালা করা হয়েছে তা সম্পূর্ণ মসজিদের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। অধুনা মসজিদের দরজা-জানালায় কাঁচের পাল্লা দিয়ে আধুনিকতার প্রয়োগ ঘটানোর প্রচেষ্টা নেয়া হয়েছে, এবিষয়টিও একটি পুরাতন স্থাপত্যের সাথে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করে দোতলা করা হয়েছে। ফলে, আদি মসজিদের সম্মুখ ভাগ দেখা যায় না। মসজিদের বাহিরাবরণে যে ধরণের প্লাষ্টার করা হয়েছে (bontile) সেটাও এই পুরাতন স্থাপত্যের ক্ষেত্রে যথার্থ নয়। একটি পুরাতন ইমারতকে আধুনিকরূপ দিতে গেলে তা কতটা দৃষ্টিকটু দেখায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ এই মসজিদটি। দুঃখজনক এই যে, মসজিদের সাম্প্রতিক সংস্কার ও পরিবর্তন হয়েছে ১৯৮৫ সালে 'রাজউক' এর তত্ত্বাবধানে। সরকারী উদ্যোগে পুরাতন ইমারতের এ ধরনের বিনষ্ট করার প্রক্রিয়া চললে সাধারণ জনগনের কাছে কতটা আর আমরা আশা করতে পারি। মসজিদের পূর্ব দিকে বিভিন্ন সুউচ্চ ভবন নির্মাণ করায় পূর্ব দিকটি একরকম আড়াল পরে গেছে।(চিত্র-৬১)

করতলাব খান মসজিদ, ১৭০০-৪ ঃ

পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট করতলাব খানের মসজিদটি আপাত দৃষ্টিতে উত্তম অবস্থায় থাকলেও মসজিদটির যথাযথ সংরক্ষণ হচ্ছে না। মসজিদের পূর্ব দিকে বারান্দা দেয়ায় মসজিদের সামগ্রিক রূপে ছন্দপতন ঘটেছে। প্লাটফর্মের নীচের কক্ষ গুলোর রক্ষণাবেক্ষন ভাল নয়। বেগম বাজার এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ন বিধায় মসজিদটি সম্পূর্ণরূপে দেখা যায় না। এটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন, ফলে মসজিদটির যথাযথ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। মসজিদ সংলগ্ন ধাপযুক্ত যে কুয়ো (বাওলী) ছিল, তার কেবল একটি খিলান এখন রয়েছে। সেই কূয়োর স্থানটির পুনঃ সংস্কার প্রয়োজন। কারণ, এ ধরনের কুয়ো একটিও বাংলাদেশে নেই। নিরাপত্তার প্রয়োজনে কুয়োর চারপাশ প্রাচীর দিয়ে ঘিরে দেয়া যেতে পারে।

মরিয়ম সালেহা মসজিদ, ১৭০৬ ঃ

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মরিয়ম সালেহা মসজিদের আঙ্গিক কোন পরিবর্তন করা না হলেও মসজিদের পূর্ব দিকে সম্প্রসারনের ফলে মসজিদের সম্মুখ ভাগ দেখা যায় না। পূর্ব দিকে সম্প্রসারিত হল ঘরের ছাদের অলংকরণ আদি মসজিদের অলংকরনের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। মসজিদের অবস্থান এলাকাটি ঘনবসতিপূর্ণ ফলে সম্পূর্ণ

Dhaka University Institutional Repository

মসজিদ দেখা যায় না, এছাড়া মসজিদের পশ্চিম দিকটি অপরিছন্ন অবস্থায় রয়েছে (চিত্র–৭৫)। মসজিদের চারপাশে যেসব দোকান পাট ও ছোট ছোট বসতবাড়ি গড়ে উঠেছে তার কিছু নির্মূল করে মসজিদ এলাকাটি পরিছন্ন ও উন্মুক্ত করা যায়।

কারাগার মসজিদ, ১৭১৪

কারাগার এলাকার অভ্যন্তরে এক গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদটির কাঠামোগত কোন পরিবর্তন করা না হলেও পূর্ব দিকে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ফলে, একদিকে যেমন তা আদি মসজিদের সাথে সংগতিবিহীন হয়েছে অন্যদিকে এর ফলে মসজিদের পূর্বদিক দৃষ্টির অন্তরালে চলে গেছে। তবে পূর্বদিকের এই সম্প্রসারিত অংশকে নির্মূল করে মসজিদটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

তারা মসজিদ, (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে) ঃ

তিন গম্বুজ বিশিষ্ট তারা মসজিদে ১৯২৬ সালে অলংকরণের নিমিত্তে "চিনি টিকরীর" কাজ করা হলে মসজিদের সৌন্দর্য বহুগুন বৃদ্ধি পায়। ১৯৮৫ সালে তারা মসজিদকে উত্তর দিকে খানিকটা সম্প্রসারণ করা হয় এবং ছাদে আরো দু'টি গম্বুজের সংযোজন করা হয়। এই সম্প্রসারণটি সম্পূর্ণরূপে অপ্রয়োজনীয় ছিল। এর ফলে একদিকে যেমন এটি বাহুল্য হয়েছে অন্যদিকে এতে মসজিদের মূল কাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে (চিত্র–৮৯)। এ ধরণের সম্প্রসারণ ও পরিবর্তন একটি পুরাকীর্তির ক্ষেত্রে কাম্য নয়। তিনটি গম্বুজ নিয়ে সমগ্র মসজিদের মধ্যে যে সুসামঞ্জস্যতা ছিল, মসজিদকে পাঁচ গম্বুজ বিশিষ্ট করায় তা ব্যাহত হয়েছে। সম্প্রসারিত অংশে 'চিনি টিকরীর' অলংকরণ করা হলেও তাতে পূর্বের মত মাধুর্য নেই (চিত্র–৯০)। সামগ্রিক ভাবে বলা যায় তারা মসজিদের সৌন্দর্য নিহিত ছিল এর সুসামঞ্জস্যতার মধ্যে, অলংকরনের নিপূণতার মধ্যে। সেই সৌন্দর্য আজ অনেকটাই ম্লান হয়ে গেছে উত্তর দিকের সম্প্রসারণের ফলে। এই সম্প্রসারণ কাজটিও হয়েছে সরকারী উদ্যোগে। সম্প্রসারণ কালে মসজিদের পূর্ব দিকে একটি তারার আকৃতির হাউজ নির্মাণ করা হয়েছে। এই হাউজের প্রতিটি পাশে চিনি টিকরীর কাজ করলে তা মসজিদের অলংকরনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতো। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, বিনত বিবির মসজিদের পশ্চিম দিকে তারার আকৃতির চৌবাচ্চা রয়েছে যার পাশগুলোতে চিনি টিকরীর অলংকরণ করা রয়েছে।

গোর-ই-শাহী মসজিদ, ১৭২৬ ঃ

এক গম্বুজ বিশিষ্ট দ্বিতল এই মসজিদের সামনের প্লাটফর্মের উন্মুক্ত চত্বরের তিন পাশে দেয়াল দিয়ে ঘিরে ওপরে ছাদ দেয়ার ফলে মূল মসজিদটি বাইরে থেকে সম্পূর্ণভাবে দেখা যায় না (চিত্র–৮১)। এই পরিবর্তনটি মসজিদের প্লাটফর্মের উন্মুক্ততার মধ্যে আবদ্ধ ভাব এনে দিয়েছে। মসজিদে সাম্প্রতিক কালে যে মিনার তৈরী করা হয়েছে তা সমগ্র স্থাপত্যের সাথে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। মসজিদের প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর সাম্প্রতিক কালের সংস্কারের ফলে কোন কোন কক্ষের ভল্ট আকৃতির ছাদ সমান্তরাল করা হয়েছে, এরফলে মসজিদের স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদের অভ্যন্তর ভাগে প্লাষ্টারের ওপর বিভিন্ন রঙ দেয়ার ফলে স্থাপত্যের সৌন্দর্য বিঘ্নিত হয়েছে। সর্বোপরি সমগ্র মসজিদের বহিরাবরনে যে ঘিয়ে রঙ দেয়া হয়েছে একটি পুরাতন স্থাপত্যের সাথে তা সংগতিপূর্ন নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আরমানিটোলা মসজিদ, ১৭৩৫ ঃ

চৌচালা চাল বিশিষ্ট এই মসজিদের বর্তমানে অপরিকল্পিত সম্প্রসারন হয়েছে। মূলতঃ আরমানি টোলার শরৎ চন্দ্র চক্রবর্তী সড়ক মসজিদের পশ্চিম পাশ দিয়ে চলে গেছে। ফলে, রাস্তা থেকে মসজিদের পেছন দিক খানিকটা দেখা যায়। মসজিদের ছাদটি খুব উচুঁ নয়। পশ্চিম দিকে দোকান নির্মিত হওয়ায় মসজিদটি অনেকটা ঢাকা পড়ে গেছে। মসজিদের পূর্ব-দিকে একটি কক্ষের মত করে সম্প্রসারণ করা হয়েছে। এর ফলে আদি মসজিদের পূর্ব দিকটি অন্তরালে চলে গেছে।মসজিদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকে পূর্বে একটি করে প্রবেশ পথ ছিল কিন্তু সাম্প্রতিক কালে তা বন্ধ করে দেয়ায় সমগ্র মসজিদে একটি আবদ্ধতা বিরাজমান। অন্যদিকে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাবের দু'পাশে দু'টি বর্গাকৃতির জানালা করা হয়েছে। এই জানালা দু'টি মসজিদের সৃষ্টি লগ্নে তৈরী করা হয়েছিল কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে কারণ, সাধারন ভাবে মসজিদের পশ্চিম দেয়ালে মিহরাব ছাড়া অন্য কিছু নির্মাণ করা হয় না। মসজিদের উত্তরদিকে সংলগ্ন অবস্থায় একটি কক্ষ তৈরী করা হয়েছে মসজিদের ইমামের থাকার জন্য।মসজিদের আকৃতি ছোট হওয়ায় পূর্ব ও উত্তর দিকে মসজিদের সম্প্রসারণের ফলে স্থাপত্যের অখন্ড ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে। ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য এই নিদর্শনটির যথাযথ সংরক্ষণ হয়নি।

আজিমপুর মসজিদ, ১৭৪৬ ঃ

আজিমপুরের দোতলা মসজিদের প্লাটফর্মের ওপর দু'টি তলা নির্মান করার ফলে মসজিদটির সামনের দিক একেবারে ঢাকা পড়ে গছে। আদি মসজিদের পূর্বদিকের দু'টি কর্নার টাওয়ার ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে। এই কর্নার টাওয়ার দু'টির আশু সংস্কার প্রয়োজন।

বর্তমানে আদি মসজিদ ও সম্প্রসারিত পূর্বাংশের ছাদ সমান্তরাল হওয়ায় মূল গম্বুজটি মনে হয় যেন আকস্মিক ছাদ ফুড়ে বের হয়েছে। গম্বুজের ড্রাম, দু'পাশের দু'টি অর্ধগম্বুজের উপরিভাগ এর কিছুই এখন ছাদের উপরে দেখা যায় না (চিত্র-৯৪)। উত্তর দিকে মসজিদের সাথে সংলগ্ন অবস্থায় পাঁচতলা বিশিষ্ট একটি মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের ফলে মসজিদের অখন্ড ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদের প্লাটফর্মের নীচের কক্ষগুলোর অবস্থা ভালো নয়। পূর্ব দিকে দু'টি কক্ষ ভেঙ্গে মসজিদের সম্প্রসারণ কাজ চলছে, পুরাতন বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে মসজিদের এরূপ সম্প্রসারণ চলতে থাকলে ভবিষ্যতে মসজিদের আদি বৈশিষ্ট্যের কতটুকু টিকে থাকবে তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে (চিত্র-৯৫)। অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ একটি পুরাকীর্তির জন্য কতটা ক্ষতিকর হতে পারে তার আরেকটি দৃষ্টান্ত আজিমপুর মসজিদ। মসজিদের পূর্বদিকের সম্প্রসারণ, উত্তর দিকের মাদ্রাসা ভবন- এসব কিছু মিলিয়ে মসজিদে একটি আবদ্ধ ভাবের সৃষ্টি হয়েছে। অথচ এই রীতির মসজিদ কেবল বাংলাদেশে নয় সমগ্র উপমহাদেশে দ্বিতীয়টি নেই। সুতরাং মসজিদটির যথাযথ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা নেয়া উচিত।

এই দ্বিতীয় শ্রেনীর অন্তর্গত মসজিদগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, প্রতিটি মসজিদই অপরিকল্পিত সম্প্রসারনের শিকার; অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ করতে গিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আদি মসজিদটি; অনেক সময় আধুনিকরূপ দিতে গিয়ে বিনষ্ট হয়েছে পুরাতন বৈশিষ্ট্যাবলী। তবে যেহেতু এই শ্রেনীভূক্ত মসজিদ সমূহের মূল কাঠামো মোটামুটি অক্ষত রয়েছে, সেহেতু সুপরিকল্পিত সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদগুলোর আদি অবস্থা ফিরিয়ে আনা সম্ভব। মসজিদগুলো সাধারণভাবে স্থানীয় লোকদের দ্বারা রক্ষনাবেক্ষণ করা হচ্ছে। তাদের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

সচেতনতা নেই, ফলে অতিসত্বর কোন কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে এ সকল পুরাতন স্থাপত্যের যতটুকু অস্তিত্ব রয়েছে তাও ভবিষ্যতে থাকবে কিনা তাতে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। কারণ ইতিমধ্যে লক্ষ্য করা গেছে যে, নিমতলী ও হায়াৎ ব্যাপারী মসজিদের আদি রূপের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটিয়ে নবরূপায়ন করা হয়েছে।

৩. সম্পূর্ণ পরিবর্তিত মসজিদ ঃ

ঢাকায় পুরানো মসজিদ গুলোর মধ্যে কতিপয় মসজিদ রয়েছে যার আদি বৈশিষ্ট্যের তেমন কিছুই বর্তমানে টিকে নেই; সম্পূর্ন পরিবর্তিত হয়ে গেছে। কোন মসজিদে হয়তো কেবল শিলালিপি রয়েছে এবং এক্ষেত্রে শিলালিপিটি মসজিদের প্রাচীনত্ব প্রমানের একমাত্র সাক্ষ্য বহন করে। যেসকল মসজিদে শিলালিপি নেই সেসকল মসজিদের প্রাচীনত্ব নিয়ে সন্দেহের উদ্রেক হয়। কারণ অপরিকল্পিত সংস্কার ও সম্প্রসারণ করে এদের আদিরূপের এতটা পরিবর্তন করা হয়েছে যে, রীতিগতভাবে বিচার করেও বোঝার উপায় নেই মসজিদগুলো কোন সময়ে নির্মিত।

নসওয়ালা গলি মসজিদ, ১৪৫৯ ঃ

১৮৯৭ সালে ভূকম্পনে মসজিদটি ক্ষতি গ্রস্থ হলে তা সংস্কারের কোন প্রচেষ্টা নেয়া হয়নি। ১৯০৮ সাল পর্যন্ত আদি মসজিদের দেয়ালগুলো টিকে ছিল। ১৯৬৬ সালে যখন আদি মসজিদের নিকটেই নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করা হয় তখন মাটির নীচে পুরাতন মসজিদের দেয়াল ও মিহরাব দেখা যায়। ঢাকার সুলতানী যুগের এই মসজিদটি সম্পর্কে বলা যায় যথাসময়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে মসজিদটিকে সংরক্ষণ করা যেতো। ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পে মসজিদের গম্বুজটি কেবল ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছিল, দেয়ালগুলো অক্ষত ছিল। সে সময়ই মসজিদটিকে যথাযথ ভাবে সুগঠিত করা যেতো।পুরাকীর্তি সংরক্ষনের প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে আমাদের হারাতে হয়েছে নসওয়ালাগলির মসজিদের মত আরো অনেক মসজিদ। বর্তমানে নির্মিত মসজিদটি আদি মসজিদের স্থানে নির্মিত আধুনিক একটি মসজিদ। ইচ্ছে করলে আদি মসজিদের নক্সা অনুকরণে তা পুনর্নির্মাণ করা যেতো। মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। শিলালিপিটি মসজিদে সংস্থাপন করা হলে কিছুটা হলেও মসজিদটি তার প্রাচীনত্বের কথা তুলে ধরবে।

জিন্দাবাহার জামে মসজিদ, ১৬১২ ঃ

মসজিদের আদি রূপের কিছুই বর্তমানে নেই। সম্পূর্ণ আধুনিকরূপ পরিগ্রহ করেছে মসজিদটি। মসজিদের গায়ে উৎকীর্ন শিলালিপি এর প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। এই মসজিদটি ঢাকায় মুঘল রাজধানী স্থাপনের প্রাথমিক সময়ের মসজিদ। তাই মসজিদটির সংরক্ষণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

নবরায় লেন মসজিদ, (সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) ঃ

নবরায় লেনের এই মসজিদটির সম্পূর্ন পরিবর্তিত রূপে আদি বৈশিষ্ট্যের কোন চিহ্ন নেই। এমনকি এখানে বর্তমানে কোন শিলালিপি নেই যা মসজিদটির প্রাচীনত্ব প্রমানের সাক্ষ্য দেবে।

Dhaka University Institutional Repository

চুড়িহাট্টা মসজিদ, ১৬৪৯ ঃ

মসজিদটি ঢাকার মুঘল স্থাপত্যের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন হওয়া সত্ত্বেও কেবল অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে এর আদিরূপ বিনষ্ট হয়েছে। মসজিদের চৌচালা ভল্ট আকৃতির ছাদটি ছিল বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ন, অথচ মসজিদকে দোতলা করার সময় চৌচালা ছাদটি ভেঙ্গে সমান্তরাল করা হয়। এছাড়া মসজিদের উত্তর দিকের দেয়াল ভেঙ্গে সম্প্রসারণ করা হয়। সুতরাং বলা যায় অপরিকল্পিত সম্প্রসারণের ফলে মসজিদটি হারিয়েছে তার অতীতের সকল চিহ্ন। আদি মসজিদকে অক্ষত রেখে মসজিদের পূর্বদিকে সম্প্রসারণ করা হলে অন্ততঃ পুরানো স্থাপত্যটি রক্ষা পেতো।

মগবাজার মসজিদ, ১৬৭০ ঃ

চারতলা বিশিষ্ট আধুনিক এই মসজিদে অতীতের কোন চিহ্ন নেই। কেবল শিলালিপিটি এর প্রাচীনত্বের কথা তুলে ধরেছে। মসজিদটির আদি অবয়ব কেমন ছিল তা জানা যায় না। চার্লস ড'য়লী তার গ্রন্থে মগবাজারের মসজিদ নামে যে মসজিদের স্কেচ অঙ্কন করেছেন সেই মসজিদ এবং এইটি অভিন্ন মসজিদ হতে পারে; তবে এ বিষয়ে কোন সুনির্দিষ্ট তথ্য না থাকায় নিশ্চিত হওয়া যায় না।[২] মগবাজার মসজিদটিকে যথাসময়ে সংরক্ষণ করা হলে আজ কেবল শিলালিপিটি দেখে এর প্রাচীনত্ব অনুমান করতে হতো না।

আমলিগোলা মসজিদ, ১৬৭৬ ঃ

আমলিগোলার ক্ষুদ্রাকৃতির মসজিদের সম্পূর্ন পরিবর্তন হয়েছে। মসজিদের নতুন রূপকল্প হয়েছে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ ভাবে, মূল কক্ষের দক্ষিন দিকের দেয়াল কোনাকুনি ভাবে নির্মিত হয়েছে। মসজিদের শিলালিপিটি মসজিদের দেয়ালে সংযুক্ত অবস্থায় না থেকে খোলা অবস্থায় রয়েছে।

ফররুখ শিয়ার মসজিদ, ১৭০৩-৬ ঃ

এই মসজিদের কিছুই বর্তমানে টিকে নেই, সুদীর্ঘ কাল ধরে মসজিদে নানাবিধ সংস্কারের ফলে অতীতের সকল চিহ্ন মুছে গেছে। সর্বোপরি প্রচুর অর্থব্যয়ে মসজিদের সাম্প্রতিক সংস্কারের মাধ্যমে মসজিদটি সম্পূর্ন আধুনিকরূপ পরিগ্রহ করেছে। মসজিদে কোন শিলালিপি নেই যা মসজিদটির প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেবে।

এই শ্রেণীভূক্ত মসজিদগুলো সম্পর্কে বলা যায় যে, যেহেতু এসব মসজিদের আদিরূপ সম্পূর্ন পরিবর্তিত হয়ে গেছে সেহেতু দৃশ্যতঃ বোঝার উপায় নেই এগুলো পুরানো মসজিদ। কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল শিলালিপি ইমারতের প্রাচীনত্বের সাক্ষ্য দেয়। পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া এসব পুরানো স্থাপত্যের আদিরূপ ফিরিয়ে আনা আদৌ সম্ভব নয়।

সুতরাং লক্ষ্য করা যায় যে, সঠিক সংরক্ষনের অভাবে ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে এবং অনেক ক্ষেত্রে মসজিদগুলোর আদি বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্নটাই বিলুপ্ত হয়ে গেছে। যে সকল কারণ আমাদের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের নিদর্শন বহনকারী পুরানো মসজিদগুলোর সঠিক সংরক্ষণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে তা নীচে আলোচনা করা হলো ঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ

সংরক্ষণের সাথে অর্থের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। পর্যাপ্ত অর্থ ব্যতিরেকে পুরানো স্থাপত্যের যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। লক্ষ্য করা যায় যে, সরকারী তহবিল থেকে এখাতে অর্থ বরাদ্দ করা হয় খুব সামান্যই।৩ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগকে বার্ষিক একলক্ষ টাকা প্রদান করা হয় সমগ্র বাংলাদেশ ব্যাপী তালিকাভূক্ত ২২৯ টি পুরাতন ইমারত ও ঐতিহাসিক স্থানের সংরক্ষণের জন্য।৪ বস্তুতঃ প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এই অর্থ সামান্যই। বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অন্ন, বস্ত্র বাসস্থানের চাহিদা মেটানোর বিষয়কে মূখ্য করে দেখা হয় এবং এসব খাতেই সিংহভাগ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। একটি উন্নয়নশীল দেশের জন্য তাদের প্রত্নতাত্বিক নিদর্শনের যথাযথ সংরক্ষণ করার যে প্রয়োজন রয়েছে, এবিষয়ে আদৌ মনোনিবেশ করা হয় না। ফলে, প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে পুরানো স্থাপত্য কর্মের যথাযথ সংস্কার ও সংরক্ষণ ব্যহত হয় এবং অনেক ক্ষেত্রে পুরো স্থাপত্যটি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

দ্বিতীয়ত ঃ

পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে পুরানো স্থাপত্যের যথাযথ সংস্কার ব্যহত হলেও এই বিষয়টিই যে স্থাপত্য সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় তা নয়। কারন অনেক সময় দেখা যায় অর্থের জোগান হলেও সুনির্দিষ্ট নীতি মালার অভাবে স্থাপত্যের যথাযথ সংরক্ষণ হয় না। আমাদের দেশে অধিকাংশ পুরাতন মসজিদ এলাকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা সংস্কার করা হয়।দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে একটি ধর্মীয় অনুভূতি রয়েছে যে মসজিদের উন্নতিকল্পে অর্থ দান করলে পূন্য হবে, ফলে অনেকেই বিশেষতঃ ধর্মপ্রান ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মসজিদে অর্থদান করেন এবং সেই অর্থে মসজিদের তথাকথিত উন্নতিকল্পে চলে অতীত বৈশিষ্ট্যের বিলুপ্তি ঘটিয়ে অপরিকল্পিত সম্প্রসারন ও পরিবর্তন।

তৃতীয়তঃ

স্থান সংকুলানের বিষয়টিকে মুখ্য করে মসজিদের সম্প্রসারন করা হয় এবং যেহেতু এক্ষেত্রে কোন সঠিক নিয়ম নীতি অনুসরণ করা হয় না সেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষতি গ্রস্থ হয় মূল মসজিদটি। আবার কখনো বা অপরিকল্পিত সম্প্রসারনের ফলে পুরাতন মসজিদটি ঢাকা পড়ে যায়। অথচ পরিকল্পনা মাফিক সম্প্রসারন করলে সহজেই রক্ষা করা যায় পুরাতন স্থাপত্যটিকে। উদাহরণ সরূপ আল্লাকুরী মসজিদের (১৬৮০) কথা বলা যায়, স্থান সংকুলানের জন্য মসজিদের উত্তর, দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে কিছুদূর সম্প্রসারণ করা হয়েছে, কিন্তু আদি মসজিদটির কোন ক্ষতি করা হয়নি।

চতুর্থতঃ

আধুনিকীকরণের প্রতি আমাদের একটি প্রবণতা রয়েছে। উন্নয়নশীল দেশে নগরায়ন প্রক্রিয়ায় সবকিছুতেই একটি আধুনিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয়।৫ যে কোন পুরাতন ইমারতকেই আমরা খুব দ্রুত অধুনিকরূপ দিয়ে তাকে দৃশ্যতঃ সুন্দর করতে চাই। কিন্তু এর ফলে আমাদের কি হারাতে হলো সে ব্যপারে আমরা সচেতন নই। কারণ, আপতঃ দৃষ্টিতে পুরাতন ইমারত সেকেলে, এজন্য লক্ষ্য করা যায় প্রচুর অর্থ ব্যয়ে পুরাতন মসজিদে নানা রকম মোজাইক , প্লাস্টার, মার্বেল পাথর ব্যবহার করা হয়। দরজা – জানালায় দেয়া হয় দামী কাঁচের পাল্লা। দিলকুশা মসজিদ এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। ঢাকার অধিকাংশ পুরাতন মসজিদই এই আধুনিকতার করাল গ্রাসে কম বেশী ক্ষতি গ্রস্থ হয়েছে।একটি পুরাতন স্থাপত্যের ক্ষেত্রে আধুনিক ভাবধারার প্রয়োগ কতটা

Dhaka University Institutional Repository

অপ্রয়োজনীয় ও বৈসাদৃশ্যপূর্ন সর্বসাধারণ সে বিষয়ে অবহিত নয় বলেই ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে আমাদের ঐতিহ্যের নিদর্শন সমূহ। আমরা আধুনিক প্রযুক্তি গ্রহন করে ইমারতের যথপোযুক্ত সংস্কার ও সংরক্ষন করতে পারি, কিন্তু কোন ভাবেই একটি পুরাতন ইমারতে আধুনিক বৈশিষ্ট্যের সংযোজন করতে পারি না।

পঞ্চমতঃ

প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইনের কার্যকারিতার অভাব পুরানো মসজিদগুলো যথাযথ সংরক্ষনের পথে প্রধান অন্তরায়।কমপক্ষে একশত বছরের পুরানো স্থাপত্যের সংরক্ষনের সরকারী আইন রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার প্রয়োগ হচ্ছে না। স্থানীয় ভাবে অধিকাংশ মসজিদের রক্ষাণাবেক্ষণ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে আইনের কোন প্রয়োগ নেই। এমনকি সরকারী উদ্যোগেও যেসব মসজিদ সংস্কার করা হয়েছে (তারা মসজিদ, দিলকুশা মসজিদ, কাওরান বাজার মসজিদ) সেখানেও এই আইনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়নি। সর্বোপরি এই আইনের একটি প্রধান সীমাবদ্ধতা এই যে, এই আইনে কেবল পুরানো ইমারতটি সংরক্ষনের কথা বলা হয়েছে, ইমারতের পারিপার্শ্বিক অবস্থা রক্ষার কোন উল্লেখ নেই।[৬] ফলশ্রুতিতে যা দাড়ায় তা হচ্ছে ইমারতটি সংরক্ষণ হলেও এর পাশ ঘেসে অথবা সম্মুখে এমন কিছু নির্মিত হয় যা পুরানো ইমারতকে ক্ষতিগ্রস্থ করে অথবা ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করে, আবার কখনো পুরানো ইমারতের পুরোটাই ঢাকা পড়ে যায়। প্রকৃত পক্ষে কোন উন্নয়নমূলক (দালানকোঠা, দোকান) কাজ করতে হলে বিশেষ অনুমতির প্রয়োজন। প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ যাচাই করে দেখবেন পুরানো ইমারতটির নিকটে অন্য আরেকটি ইমারত নির্মিত হলে তা পুরানো ইমারতের জন্য কতটা ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াবে। কিন্তু আমাদের দেশে তেমনটি কখনোই পর্যবেক্ষণ করে দেখা হয় না। যে কোন একটি ইমারত নির্মাণ করার পূর্বে ইমারত নির্মাণের নক্সা যেমন রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) পর্যবেক্ষণ করে দেখবেন তেমনি নির্মাণাধীন নতুন ইমারতের আশে পাশে কোন পুরাতন স্থাপত্যকীর্তি আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ করার দায়িত্ব প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের। কিন্তু আমাদের দেশে এই বিভাগটির এই বিষয়ে দায়িত্বে চরম অবহেলার পরিচয় পাওয়া যায়।তা না হলে সাতগম্বুজ মসজিদের পেছনেই নির্মিত হতো না বহুতল বিশিষ্ট মাদ্রাসা ভবন; শাহ্বাজ মসজিদের পশ্চিম দিকে তৈরী হোতনা তিন নেতার উচু সমাধি সৌধ; মির্ধা মসজিদের উত্তর দিকে তৈরী হোতনা বহুতল বিশিষ্ট আবাসিক ভবন। কেবল এই তিনটি মসজিদ নয়, ঢাকার প্রায় অধিকাংশ পুরানো মসজিদ ঘিরেই গড়ে উঠেছে অসংখ্য ঘরবাড়ি, দোকান পাট যা পুরানো স্থাপত্যের স্থায়িত্বের ক্ষেত্রে হুমকির কারণ হয়ে দাড়িয়েছে।

ষষ্টতঃ

প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞ লোকের অভাব স্থাপত্যের যথাযথ সংরক্ষণে অন্তরায় সৃষ্টি করে। বস্তুতঃ স্থাপত্য সংরক্ষণের বিষয়টি অত্যন্ত জটিল এবং এবিষয়ে যথার্থ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা না থাকলে স্থাপত্যের সঠিক সংস্কার ও সংরক্ষণ হবে কিনা তাতে সন্দেহ রয়েছে।অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা গেছে যে, অভিজ্ঞ লোকের অভাবে সংস্কার কালে ইমারতের মূল বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হয়েছে। যারা প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের দায়িত্বে আছেন তারা যদি এবিষয়ে অভিজ্ঞ না হন, তাহলে পুরাকীর্তি সংরক্ষণের গুরুত্ব যেমন তারা উপলব্ধি করতে পারবেন না, তেমনি কোন পদ্ধতিতে সংরক্ষণ করা হবে সে বিষয়েও সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে অপারগ হবেন।[৭] অনেক সময় লক্ষ্য করা গেছে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে এতটা বিলম্ব করা হয় যে, ততদিনে পুরাকীর্তিটি বিলুপ্তির দোর গোড়ায় এসে পৌছায়।[৮]

Dhaka University Institutional Repository

সপ্তমতঃ

প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণের ক্ষেত্রে একযোগে বহুলোকের সম্মিলিত প্রচেষ্টার প্রয়োজন।এখানে স্থপতি, ঐতিহাসিক, পরিকল্পনাকারী (Planner), প্রত্নতত্ত্ববিদ, নৃতত্ত্ববিদ, সমাজবিজ্ঞানী, প্রকৌশলী, শ্রমিক কর্মচারী প্রভৃতি লোকের সম্মিলিত ভূমিকা রয়েছে।[৯] এদের প্রত্যেকেরই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। আমাদের দেশে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ বিষয়ে এখনো প্রশিক্ষণ দেয়ার মত উদ্যোগ নেয়া হয়নি। প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ বিষয়ে সরকারের যে সকল বিভাগ সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যেও যথাযথ সহযোগিতার অভাব রয়েছে। ফলে সামগ্রিক ভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষনের বিষয়টি অবহেলিত হচ্ছে।[১০]

অষ্টমতঃ

প্রতিটি মসজিদে একটি মসজিদ কমিটি রয়েছে। এই কমিটি তাদের ইচ্ছানুযায়ী মসজিদে নানা রকম সংস্কার ও পরিবর্তনের কাজ চালান। এমনকি প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক সংরক্ষিত মসজিদের ক্ষেত্রেও লক্ষ্য করা গেছে মসজিদ কমিটি প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইনকে অমান্য করে মসজিদে অনেক রদবদল করেছেন। যেমন, মির্ধা মসজিদের বেষ্টনীর দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বারটি মসজিদ কমিটির নির্দেশনায় নির্মিত।এ বিষয়টি কোন বড় ধরণের ত্রুটি না হলেও অনেক ক্ষেত্রে মসজিদ কমিটির নির্দেশনায় অনেক ত্রুটিপূর্ণ সংস্কার হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে প্রত্মতত্ব সংরক্ষণ আইনের কার্যকরী প্রয়োগ ঘটেনি বলেই তা সম্ভব হয়েছে।

নবমতঃ

জনসাধারণের মধ্যে পুরাকীর্তি সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে, এবং এটাই মসিজদগুলো বিনষ্ট হবার অন্যতম কারণ। অধিকাংশ মসজিদই স্থানীয় ভাবে স্থানীয় জনগণ দ্বারা রক্ষাণাবেক্ষণ হচ্ছে।এজন্য বলা যায় যে, অর্থের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে মসজিদের যথাযথ সংরক্ষণ ব্যহত হলেও অনেক সময় অর্থের যোগান থাকলেও সঠিকভাবে সংরক্ষণ হয় না। প্রকৃতপক্ষে, অপরিকল্পিত সম্প্রসারণ ও পরিবর্তনের ফলে মসজিদগুলোর আদি বৈশিষ্ট্য বিনষ্ট হচ্ছে ক্রমাগত।

ঢাকার পুরানো ও ঐতিহ্যবাহী মসজিদগুলোর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া প্রয়োজন। অনেকেই বলতে পারেন বাংলাদেশের মত একটি উন্নয়নশীল দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে চাহিদা পুরনের বিষয় গুলোই মূখ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ রক্ষা করার বিষয়টি তাই গৌন হয়ে দাড়ায়।[১১] এক্ষেত্রে বলা যায় যে, প্রতিটি জাতির জন্যই তার সংস্কৃতির পরিচয় একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হচ্ছে এসব প্রত্মতাত্ত্বিক নিদর্শন। স্থাপত্য হচ্ছে সংস্কৃতির একটি সমৃদ্ধ উৎস, যে উৎসের কোন পরিপূরক নেই (Architecture is an irreplaceable cultural resource)।[১২] সুদীর্ঘ কাল ধরে শিল্পের এই শক্তিশালী মাধ্যমটি মানুষের জীবন ও পরিবেশের ওপর প্রভাব বিস্তার করে এসেছে। প্রত্মতাত্ত্বিক নির্দশন সমূহ মূলতঃ আমাদের অতীতের বস্তুনিষ্ঠ দলীল। লিখিত ইতিহাসের স্বল্পতার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ ইতিহাসের উপাদান হিসেবে কাজ করে। প্রকৃতপক্ষে স্থাপত্যের মাধ্যমে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের মানুষের মধ্যে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। [১৩]

পুরাতন মসজিদগুলোর সঠিক সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেয়ার ক্ষেত্রে সম্ভাব্য যেসব পদক্ষেপ গ্রহন করা যায় সে সম্পর্কে বলতে গেলে বলা যায় ঃ

Dhaka University Institutional Repository

প্রথমতঃ

অতীত ঐতিহ্যের নিদর্শন সমূহকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের জনসাধারণকে সচেতন করে তুলতে হবে। কোন কর্মসূচীই এলাকার স্থানীয় জনসমর্থন ব্যতীত সফল হতে পারে না। কারণ, অধিকাংশ মসজিদই স্থানীয় জনসাধারণ দ্বারা রক্ষানাবেক্ষণ করা হচ্ছে। জনসচেতনতা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম যেমন, সংবাদপত্র, পত্র–পত্রিকা, বেতার, টেলিভিশন প্রভৃতি ব্যবহার করা যায়। পৌরসভা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। তরুণ সমাজকে আমাদের ঐতিহ্যের সাথে পরিচিত করতে হবে এবং এই উদ্দেশ্যে বিদ্যালয়ের পাঠ্য বই–এ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ বিষয়ে একটি অধ্যায় সংযোজন করা যায়। [১৪]

দ্বিতীয়তঃ

আমাদের দেশে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানের চাহিদা পুরণের বিষয়ের পাশাপাশি প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষনের বিষয়কেও গুরুত্ব দিতে হবে। কারণ সাম্প্রতিক কালে প্রতিটি দেশেই পর্যটনকে অর্থনীতির একটি উৎস হিসেবে গ্রহন করা হয়। এজন্য ঐতিহাসিক স্থান, স্থাপত্য নিদর্শন প্রভৃতি সংরক্ষণের বিষয়টিকে গুরুত্ব দেয়া হয়। [১৫] আমাদের দেশে স্বল্প সংখ্যক হলেও যে কয়টি প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আছে তার যথাযথ সংরক্ষনের মাধ্যমে পর্যটনের ক্ষেত্রকে সমৃদ্ধ করা যায়। সুতরাং সংরক্ষণের বিষয়টিকে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সম্পৃক্ত করে দেখতে হবে।

তৃতীয়তঃ

সরকারের প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ আইনকে কার্যকরী করে তুলতে হবে। প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ বিভাগের অধীনে আরো অনেক পুরানো মসজিদ তালিকা ভূক্ত করতে হবে এবং এই তালিকাভুক্তি যেন যথার্থ ভাবে হয়, সে বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে। কারণ, অনেক সময় দেখা গেছে যথার্থ তালিকা ভূক্তি না করার কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সমূহ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

চতুর্থতঃ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারী প্রতিষ্ঠান প্রভৃতিকে পর্যাপ্ত অর্থ সংগ্রহের জন্য এগিয়ে আসতে হবে। কারণ, সরকারের একার পক্ষে সবগুলো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষনের ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। নানা ভাবে প্রচারণা চালিয়ে অর্থসংগ্রহ করার প্রচেষ্টা নেয়া যায়।

পঞ্চমতঃ

প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষণ বিষয়ে অভিজ্ঞ স্থপতি, ঐতিহাসিক, নৃতত্ত্বত্ত্ববিদ, সমাজ বিজ্ঞানী প্রভৃতিদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠন করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এই কমিটি দিক নির্দেশনা দেবেন কিভাবে পুরাতন ইমারতের সংরক্ষণ হবে। এছাড়া সংরক্ষণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়ার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে। যারা ইমারতের সংস্কারের কাজ করবেন, তারা যদি এব্যাপারে সঠিক ভাবে ওয়াকেবহাল না হন তাহলে অভিষ্ঠ লক্ষ্য সিদ্ধি হবে না।

ষষ্ঠতঃ

স্থান সংকুলানের নিমিত্তে পুরানো মসজিদের পূর্বদিকে অস্থায়ীভাবে সম্প্রসারণ করা যায়। যেমনটি লালবাগ কিল্লা মসজিদ ও শাহবাজ মসজিদে লক্ষ্য করা গেছে। সেখানে বাঁশ ও ত্রিপোল দিয়ে অস্থায়ীভাবে সম্প্রসারণ করা হয়। এধরনের সম্প্রসারণ অনেক মসজিদের ক্ষেত্রেই করা যায়। যদি এধরণের সম্প্রসারণ করা সম্ভব না হয়, তাহলে কোন রকম সম্প্রসারণ না করাই যুক্তিযুক্ত। গুটি কয়েক পুরাতন মসজিদকে তাদের পূর্বাবস্থায়

Dhaka University Institutional Repository

রেখে দেয়াই বাঞ্চনীয়। কারণ, এসব মসজিদ হচ্ছে আমাদের মূল্যবান প্রত্নসম্পদ, আমাদের ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। কোন অবস্থাতেই তাই এদের ক্ষতিগ্রস্থ হতে দেয়া যায় না। পুরাতন মসজিদের সম্প্রসারণ না ঘটিয়ে নতুন মসজিদ নির্মাণে উৎসাহী করা যায়। এছাড়া ঢাকা শহরের প্রতিটি এলকাতেই এত অধিক সংখ্যক মসজিদ রয়েছে যে পুরাতন মসজিদের সম্প্রসারণ না করলেও বিভিন্ন এলাকার লোকদের তাদের এলাকারই অপরাপর মসজিদে স্থান সংকুলান হবে। উদাহরণ স্বরূপ প্রত্নতত্ত্ববিভাগের অধীনে মসজিদ গুলো সম্পর্কে বলা যায়, এই পাঁচটি মসজিদের সম্প্রসারণ হয়নি বলে কি ঐসব এলাকার জনসাধারণ অন্যান্য মসজিদে নামাজ পড়তে পারছেন না? একান্তভাবে যদি সম্প্রসারণ করতেই হয় তাহলে যেন পুরানো ইমারতকে যতদুর সম্ভব অবিকৃত রেখে সম্প্রসারণ করা হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

সপ্তমতঃ

পুরাতন মসজিদগুলোর মধ্যে যে সকল মসজিদের বিভিন্ন দিকে সম্প্রসারণ ঘটেছে সে সকল মসজিদগুলোর আদিরূপ ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা নেয়া যায়। তবে এই প্রক্রিয়াটি হবে অত্যন্ত ধীর ও সতর্ক। সংস্কার কালে লক্ষ্য রাখতে হবে আদি অবস্থায় মসজিদটি কিরূপ ছিল এবং এ বিষয়ে বিবেচনা যতটা সম্ভব যথার্থ হওয়া প্রয়োজন। তানা হলে দেখা যাবে ইমারতটিকে কাঠামগত ভাবে ঠিক করা হলেও এর বহিরাবরণে দেয়া হয়েছে এমন রঙ যা একটি পুরানো স্থাপত্যের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যপূর্ণ, যেমনটি আহসান মঞ্জিলের ক্ষেত্রে ঘটেছে। আহসান মঞ্জিলের সার্বিক সংস্কার উত্তম হলেও ইমারতটির বহিরাবরণের গোলাপী রঙ সম্পূর্ণরূপে বৈসাদৃশ্যপূর্ণ। লক্ষ্য রাখা উচিত ছিল আদিতে আহসান মঞ্জিলের বহিরাবরণের রঙ কেমন ছিল। প্রকৃতপক্ষে ইমারতের সংস্কার করতে হবে তার পুরানো রূপ ধরেই অর্থাৎ যতটা সম্ভব আদিরূপ দিতে হবে নতুন সংস্কারকৃত ইমারতে।স্মরণ রাখতে হবে, একটি পুরানো ইমারতের সৌন্দর্য নিহিত রয়েছে তার প্রাচীনত্বের মধ্যে। সুতরাং পুরানো ইমারতের সংস্কার করে যদি আধুনিক রূপ দেয়ার প্রচেষ্টা নেয়া হয় তাহলে পুরাকীর্তিটি তার সকল সৌন্দর্য হারাবে নিঃসন্দেহে।

অষ্টমতঃ

কেবল মসজিদটি রক্ষা করলেই চলবে না, মসজিদের পারিপার্শ্বিক এলাকাটি যেন মসজিদটির সাথে সংগতিপূর্ণ হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। শাহ্বাজ মসজিদ, সাতগম্বুজ মসজিদ, ঈদগাহ্, মির্ধা মসজিদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধীন হওয়া সত্ত্বেও এদের পরিপার্শ্বিক এলাকার সংগতি রক্ষা করা হয়নি। এছাড়া পুরানো ঢাকায় অবস্থিত অধিকাংশ মসজিদ ঘিরে গড়ে উঠেছে অসংখ্য দোকান–পাট, ঘরবাড়ি। যার ফলে, অনেক ক্ষেত্রে বাইরে থেকে মসজিদকে বোঝা যায় না। কাজেই পুরানো মসজিদকে যত উত্তম রূপেই সংস্কার করা হোক না কেন, যদি বহুতল ভবনের অন্তরালে চলে যায় মসজিদটি তাহলে সেই সংস্কার হয়ে পড়বে মূল্যহীন।

নবমতঃ

যে সকল মসজিদ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গেছে, মসজিদের আদিরূপের কিছুই বর্তমানে অবশিষ্ট নেই, সে সকল মসজিদকে পুরানো মসজিদ হিসেবে পরিচিত করতে হলে মসজিদগুলোর প্রধান প্রবেশ দ্বারের ওপর আদি নির্মাণ তারিখ লিখে দিতে হবে। তাহলে এটুকু অন্ততঃ উপলব্ধি করা যাবে যে, বর্তমানে পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া মসজিদগুলোর মূল কত প্রাচীন।

Dhaka University Institutional Repository

সুতরাং বলা যায় জনসচেতনতা, স্থপতি ও ঐতিহাসিকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টা, সরকারী উদ্যোগ এ সবকিছু একযোগে কাজ করলে তবেই আমরা সক্ষম হবো আমাদের ঐতিহাসিক নিদর্শন সমূহকে রক্ষা করতে। সরকারের পক্ষে সবগুলো মসজিদের রক্ষনাবেক্ষণের ভার নেয়া সম্ভব নয়। স্থানীয় ভাবে স্থানীয় জনগণ দ্বারা মসজিদগুলোর যথার্থ সংরক্ষনের ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে, আর এজন্যই জনসাধারণকে এ বিষয়ে সচেতন করার বিষয়টি এতটা প্রয়োজনীয়। তবে, প্রাথমিক অবস্থায় সরকার যা করতে পারেন তা হচ্ছে প্রত্নতত্ত্ব সংরক্ষন আইনের কার্যকর প্রয়োগ। পুরানো ইমারতগুলো ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার প্রথম পদক্ষেপ হবে এটাই।

পাদটিকা ঃ

১। চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন,* শাহ্ মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৯১, পৃঃ ২০ ।

২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৯

৩। Shaheda Rahman Imam, Muntassir Mamun, 'Archictural Conservation in Practice' in Abu H Imamuddin (ed.), *Archictural Conservation, Bangladesh,* Dhaka, 1993, p, 52.

৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৩

৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫২

৬। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৯

৭। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫

৮। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৪

৯। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫

১০। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৬

১১। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২

১২। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২

১৩। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪২

১৪। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৬৬

১৫। প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫০

Dhaka University Institutional Repository

মানচিত্র, ভূমিনক্সা ও চিত্র

Dhaka University Institutional Repository

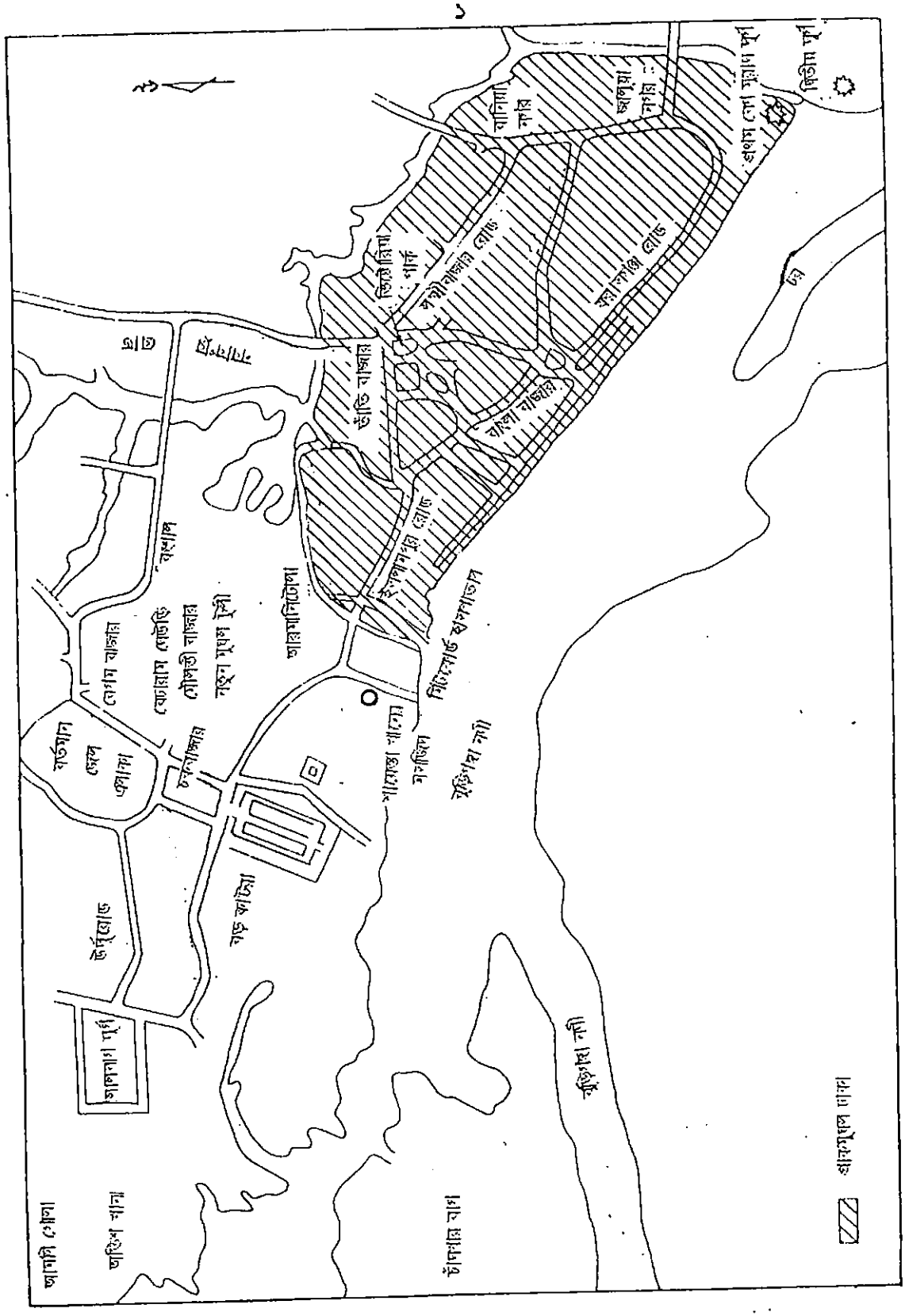

মানচিত্র ১৪ প্রাক মুঘল ও মুঘল ঢাকার সীমারেখা

Dhaka University Institutional Repository

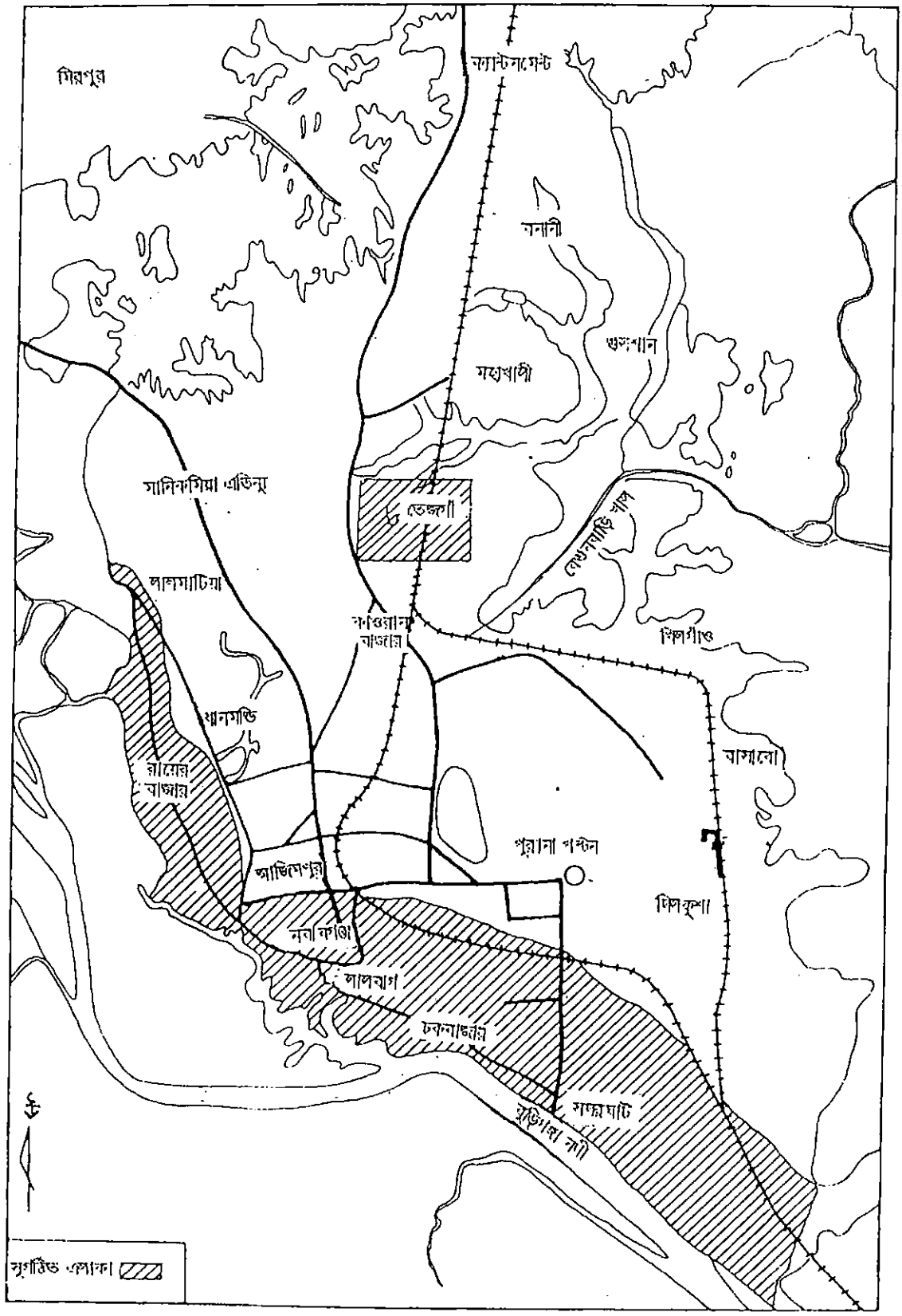

মানচিত্র ২: মুঘল রাজধানী ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

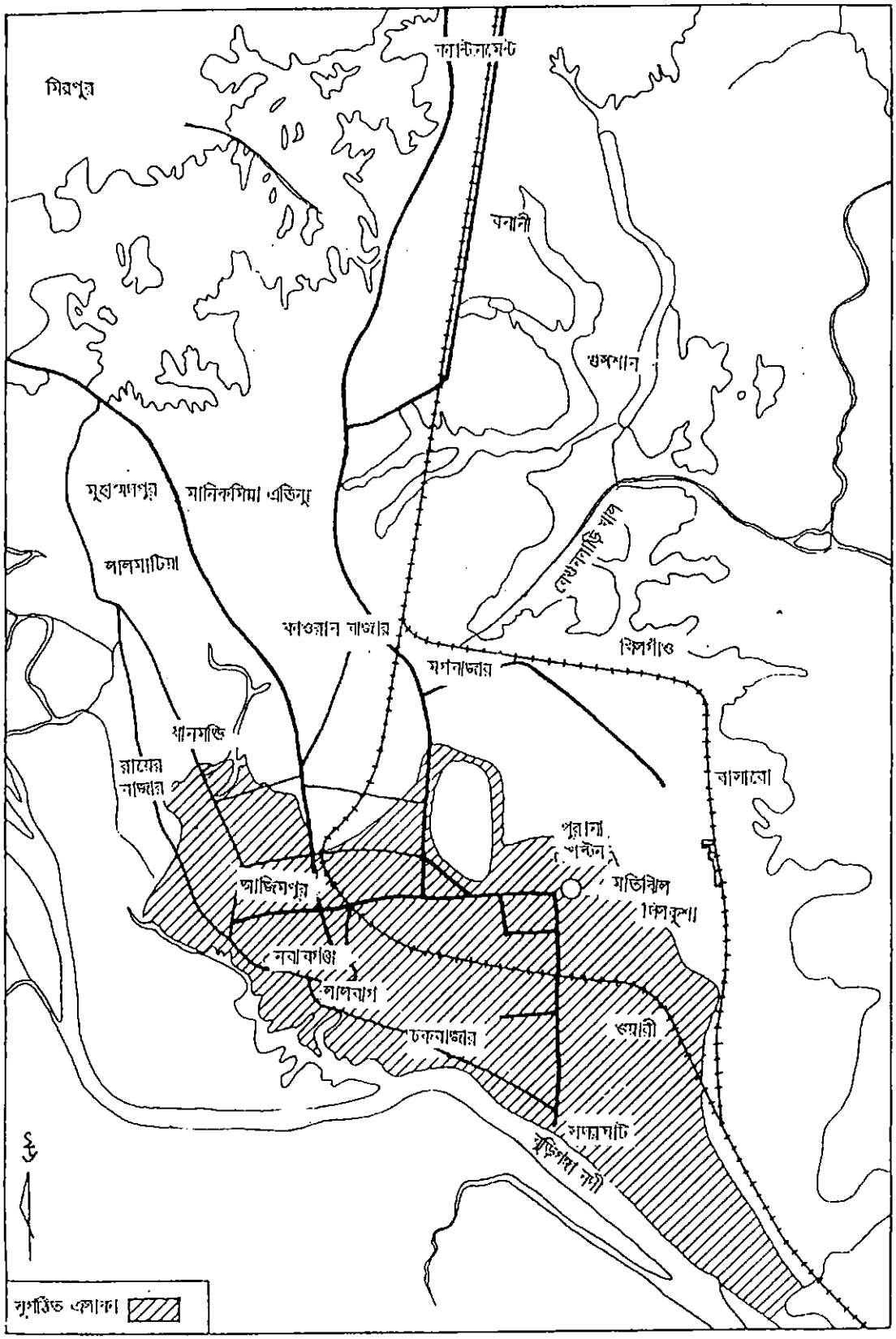

মানচিত্র ৩ঃ ১৮৫৯ সালে ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

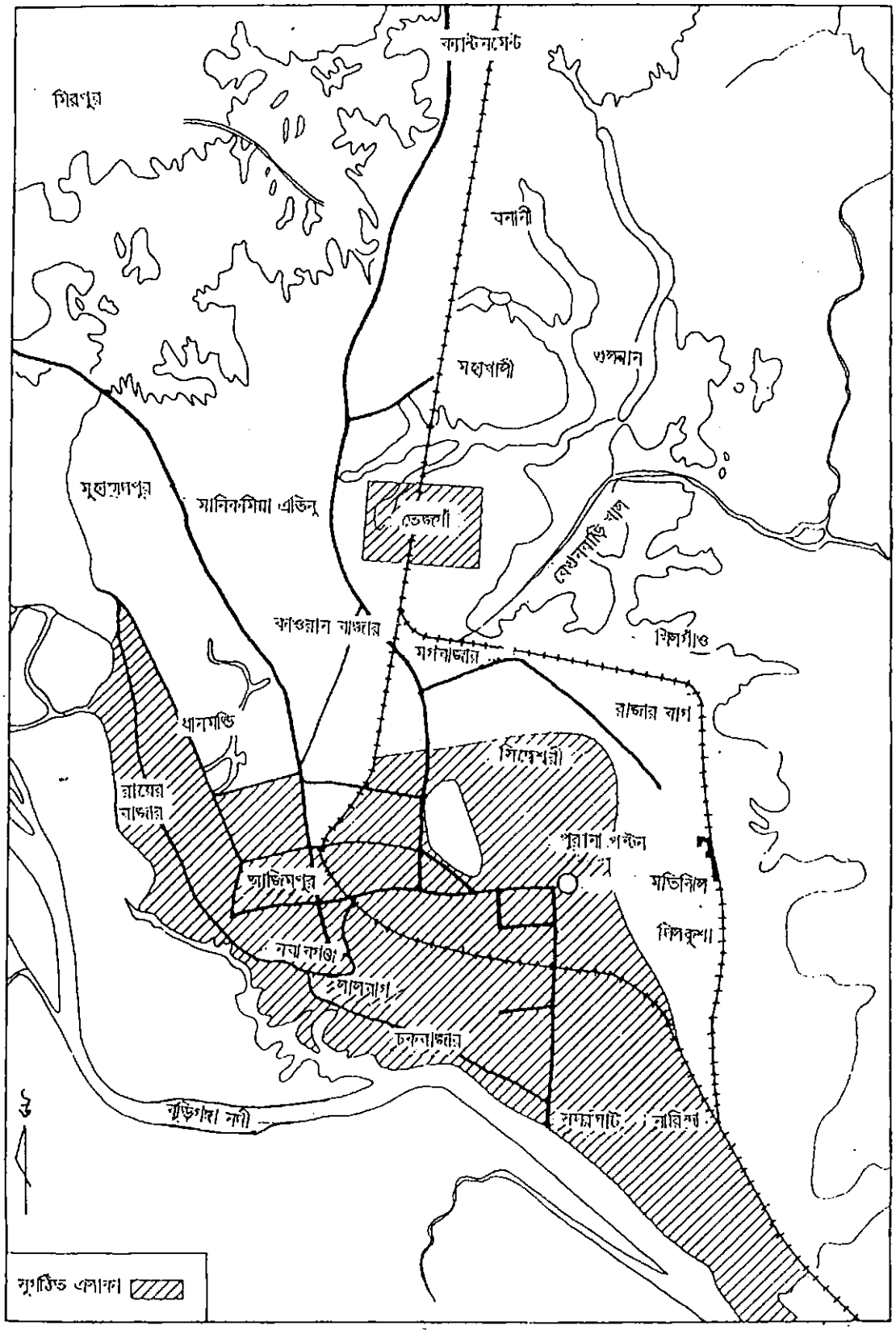

মানচিত্র ৪ঃ ১৯০৫–১১ সালে ঢাকা

Dhaka University Institutional Repository

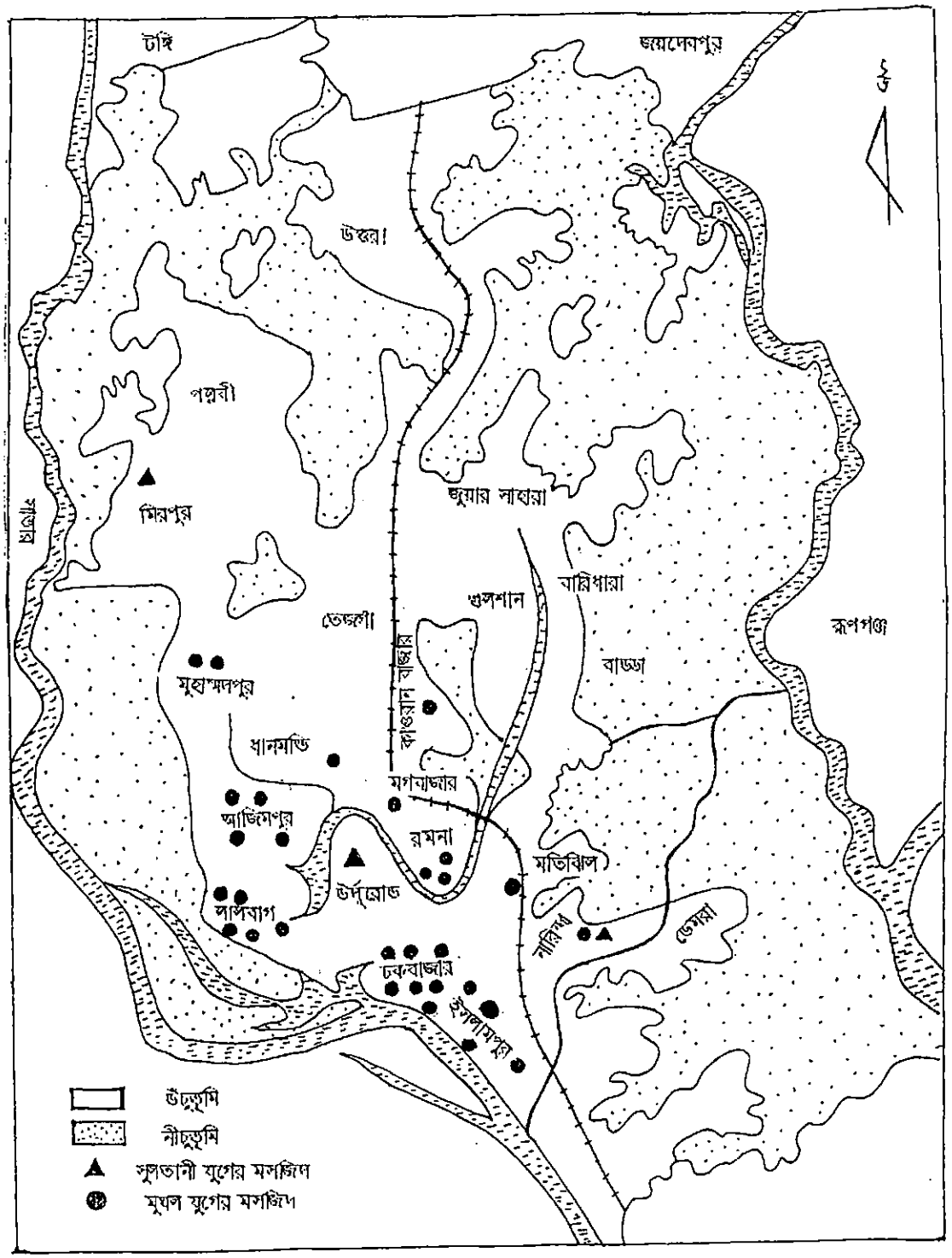

মানচিত্র ৫ঃ ঢাকা শহরে সুলতানী ও মুঘল যুগের মসজিদের অবস্থান।

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৭

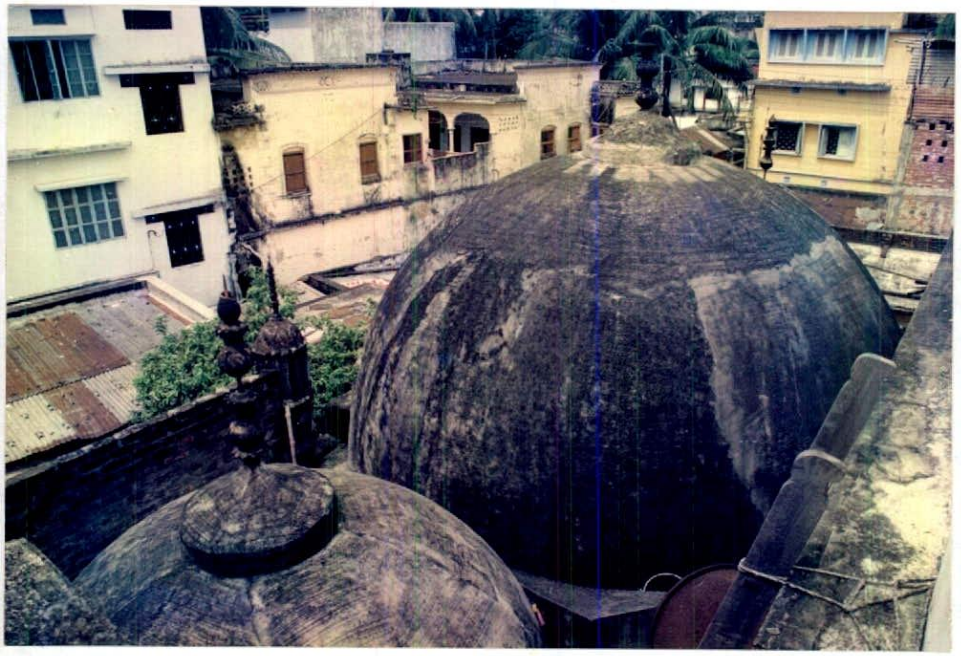

চিত্র -৮

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৯

চিত্র -১০

Dhaka University Institutional Repository

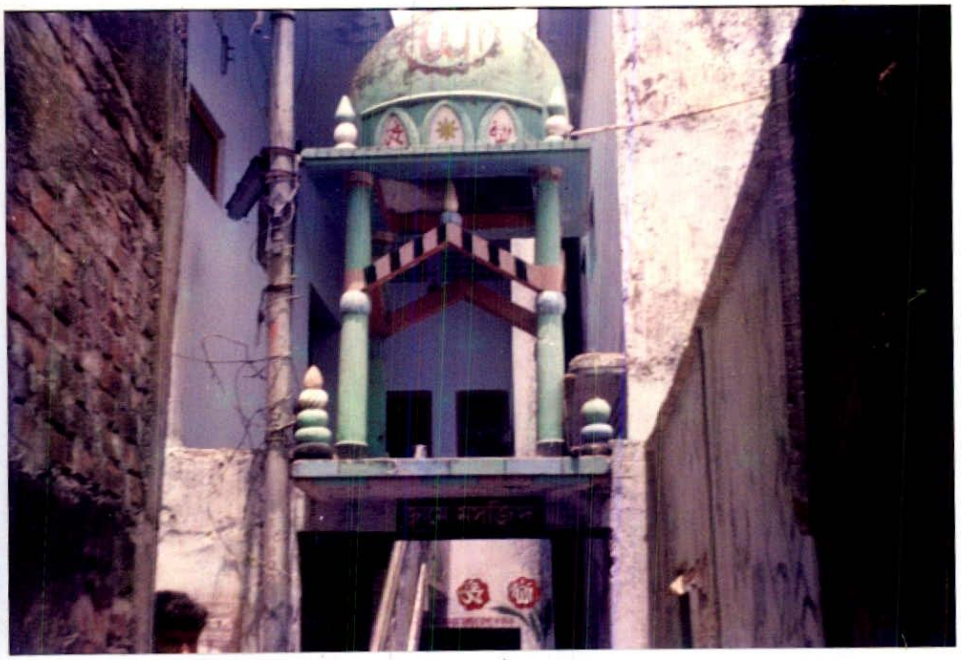

চিত্র -১১

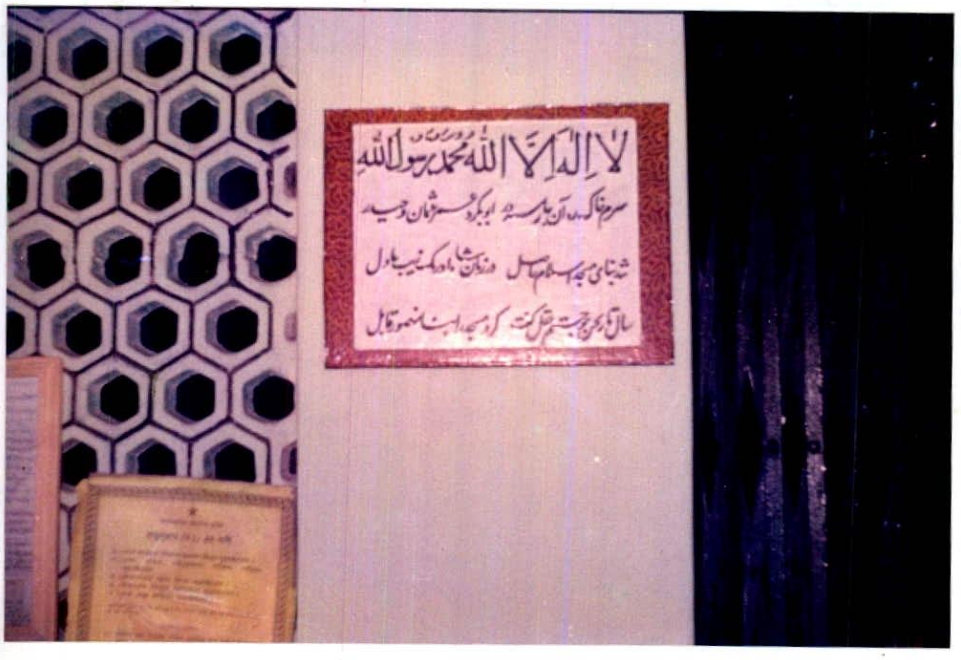

চিত্র -১২

Dhaka University Institutional Repository

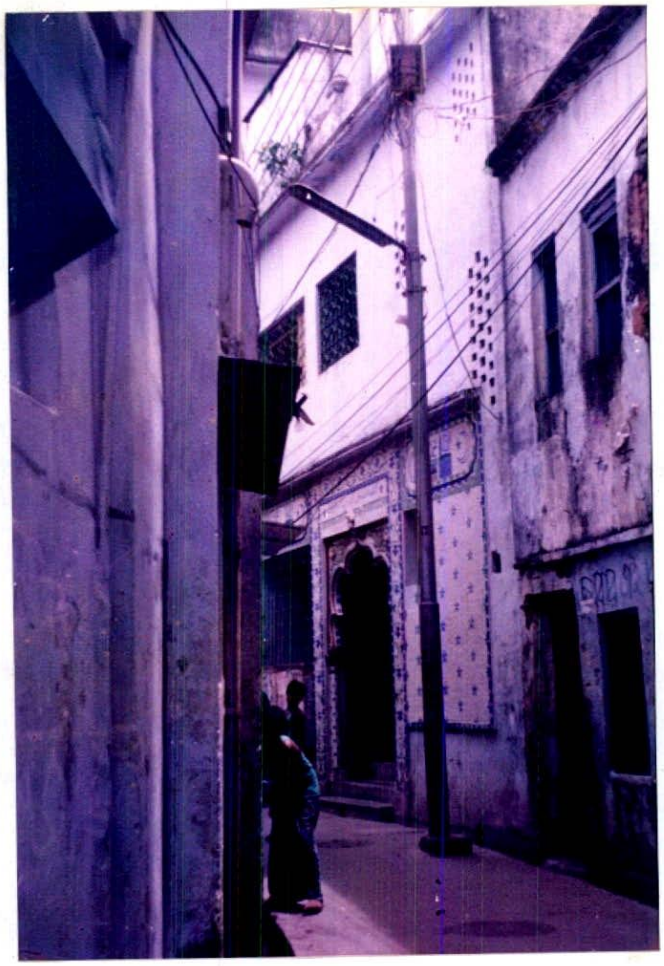

চিত্র -১৩

চিত্র -১৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -১৯

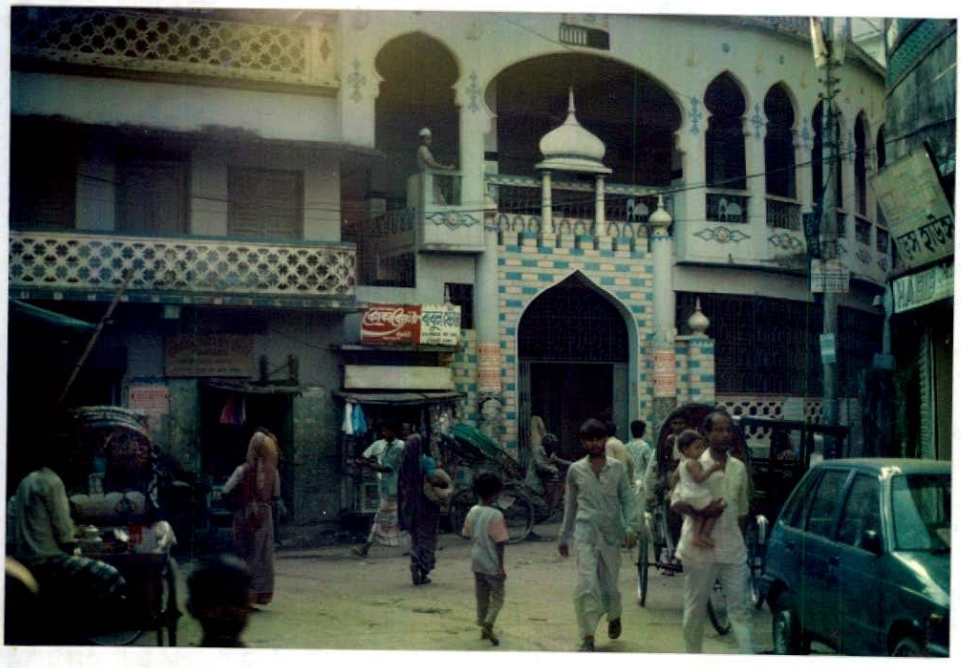

চিত্র -২০

Dhaka University Institutional Repository

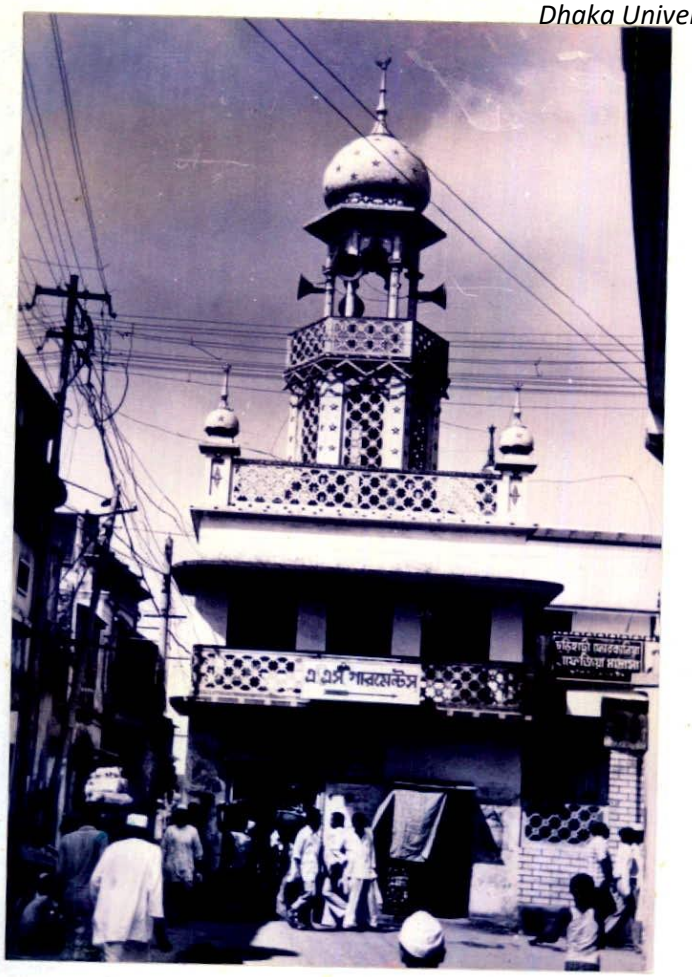

চিত্র -২১

চিত্র -২২

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -২৩

চিত্র -২৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -২৫

চিত্র - ২৭

চিত্র - ২৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৩৪

চিত্র -৩৫

চিত্র -৩৬

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৩৭

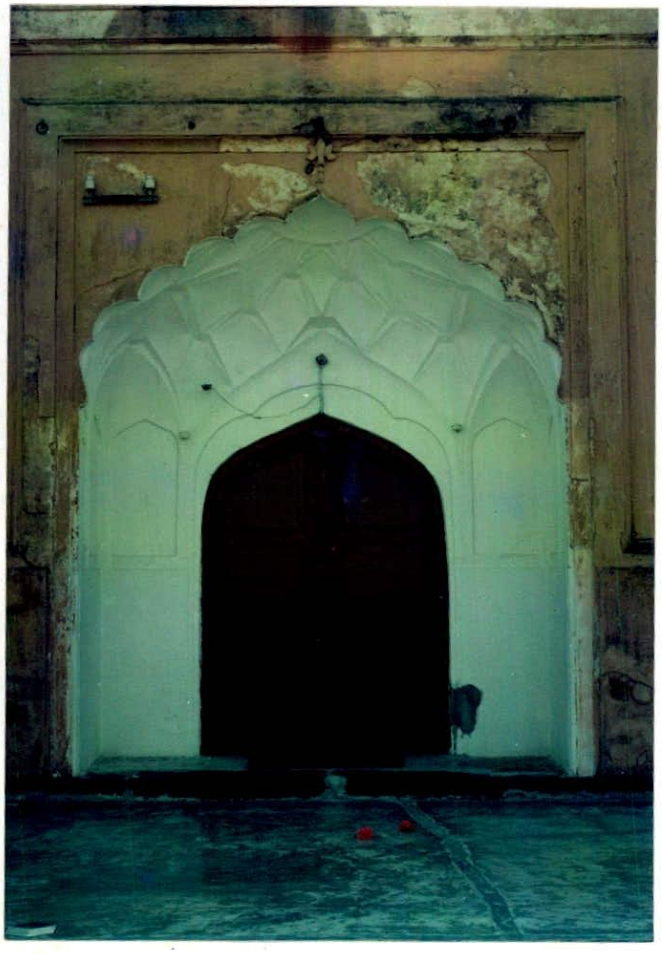

চিত্র -৩৮

Dhaka University Institutional Repository

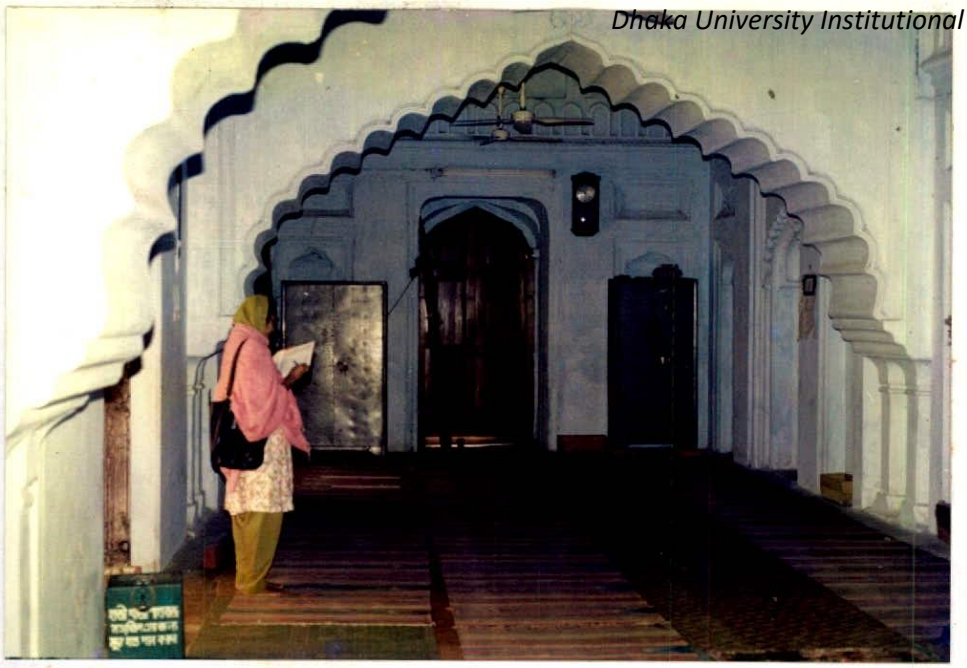

চিত্র -৪২

চিত্র -৪৩

চিত্র -৪৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৪৭

চিত্র -৪৮

চিত্র -৪৯

Dhaka University Institutional Repository

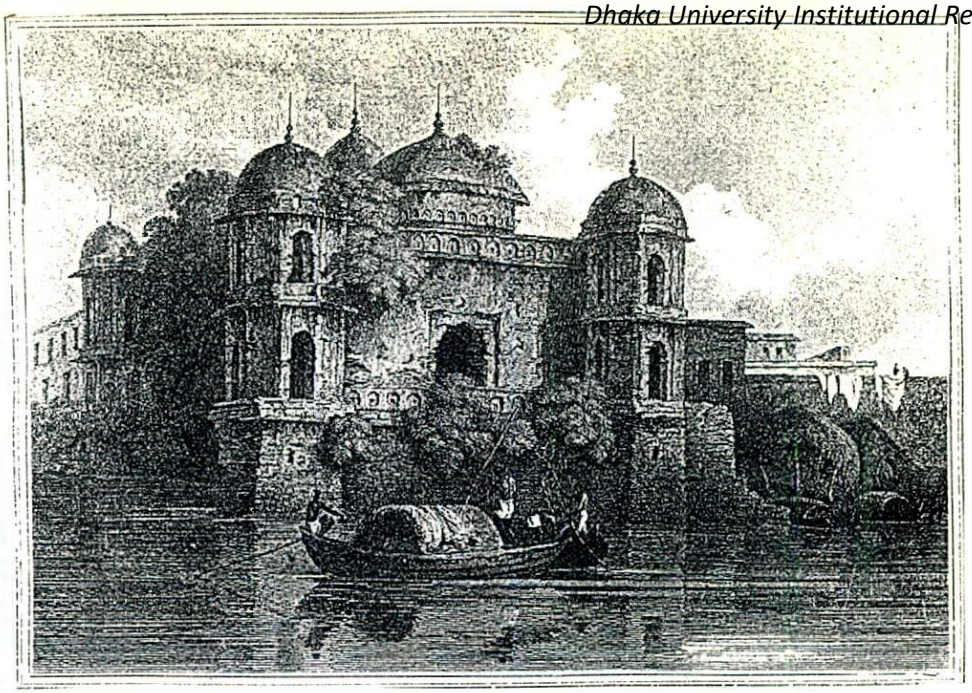

চিত্র -৫০

চিত্র -৫১

Dhaka University Institutional Repository

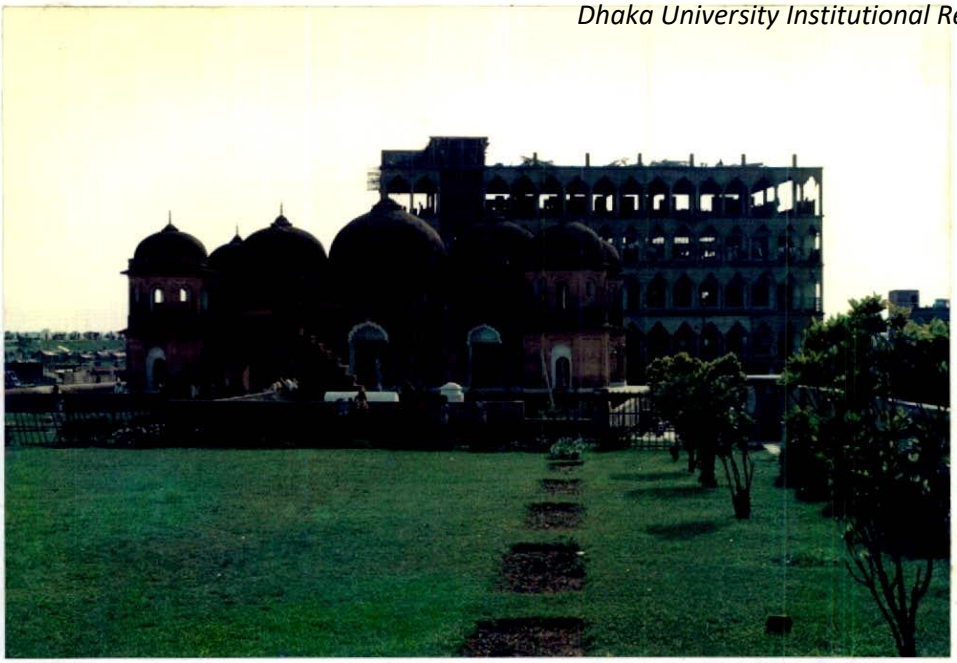

চিত্র -৫২

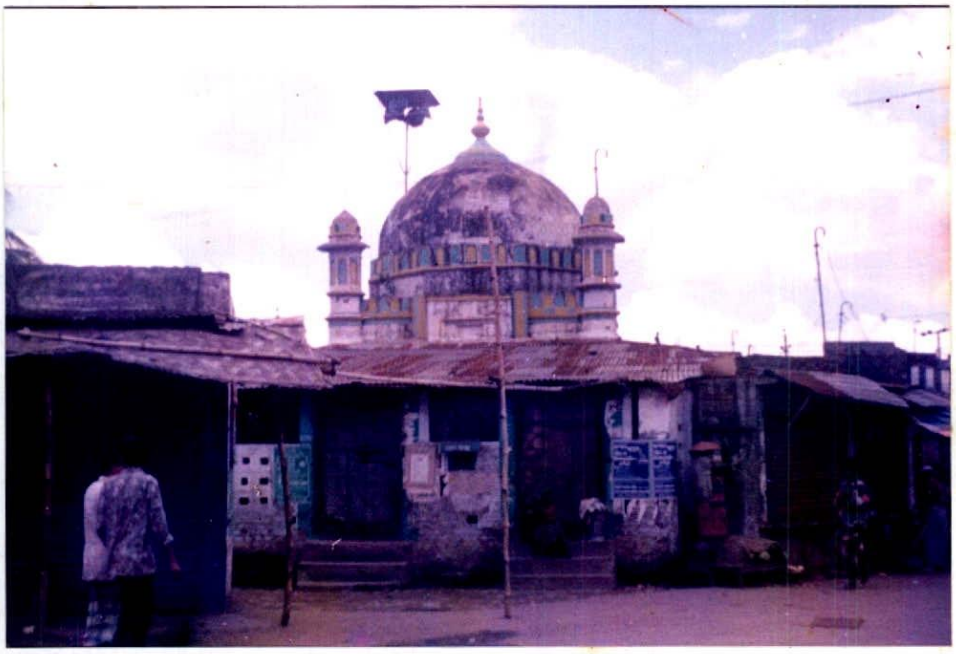

চিত্র -৫৩

চিত্র -৫৪

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৫৫

চিত্র -৫৬

Dhaka University Institutional Repository

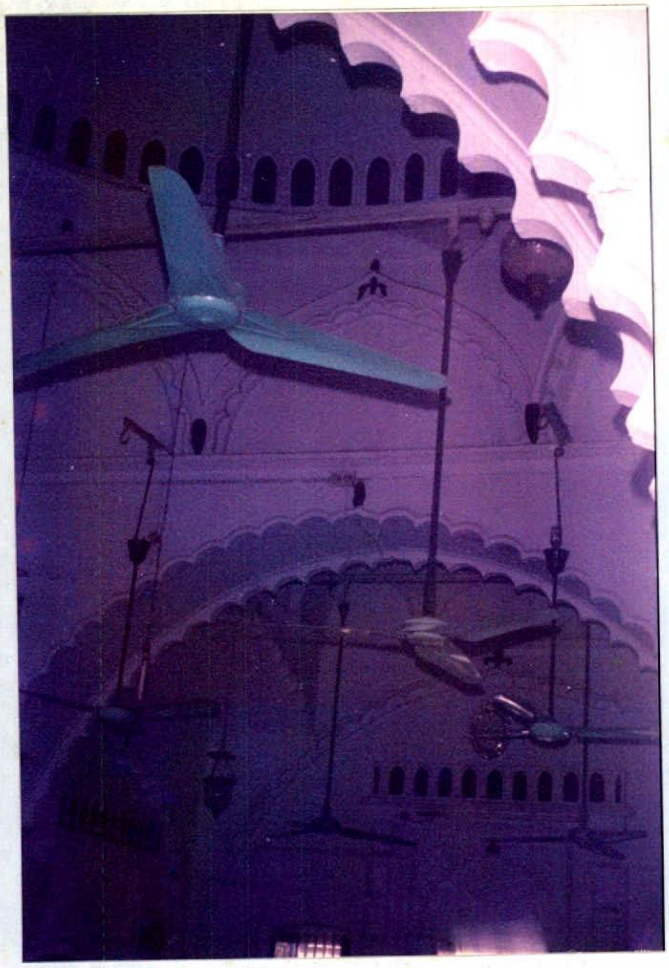

চিত্র -৫৭

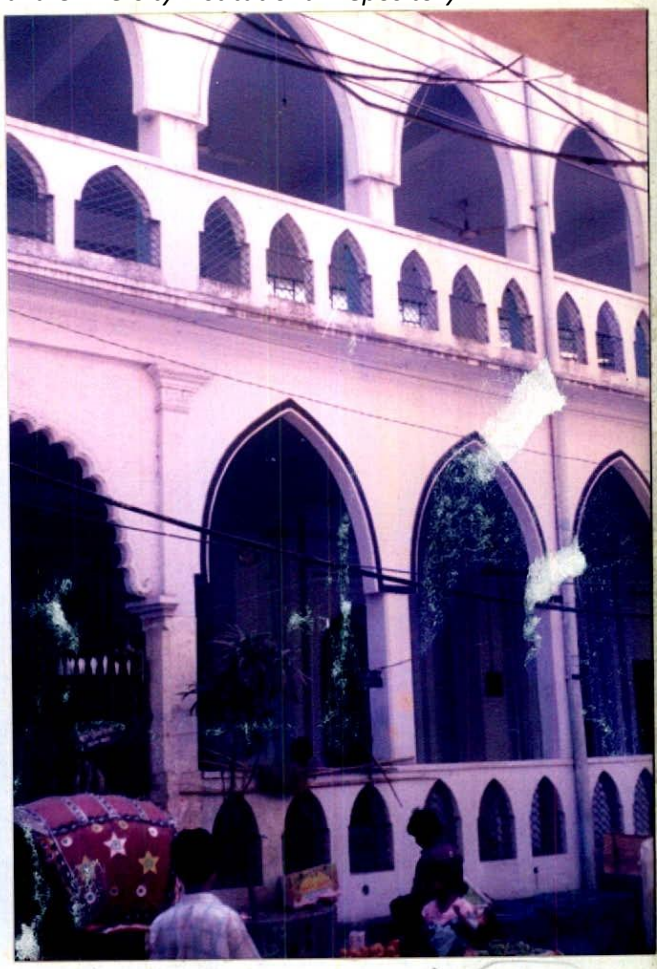

চিত্র -৫৮

চিত্র -৫৯

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৬৫

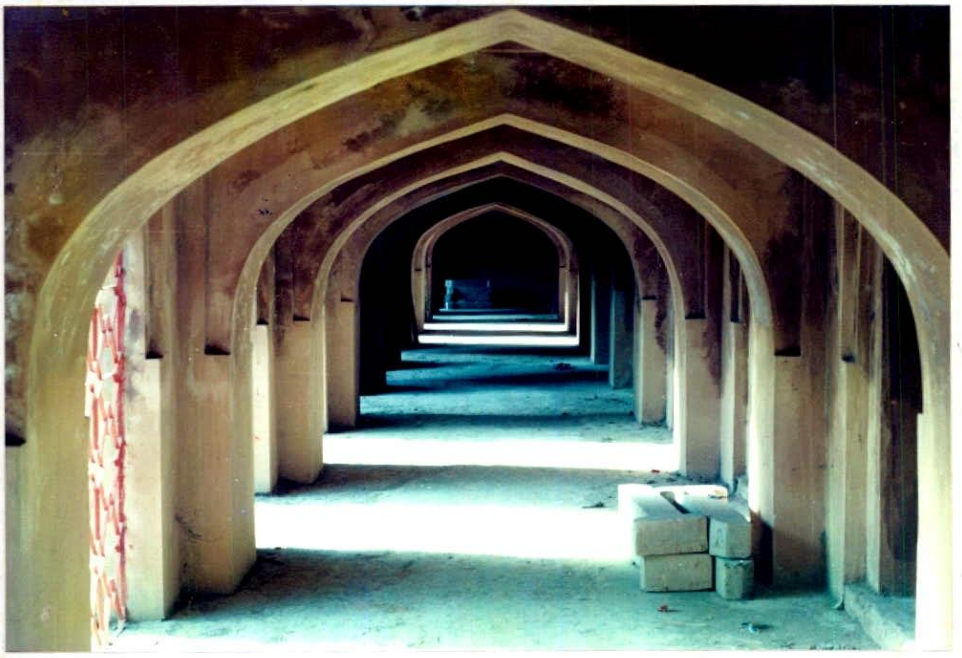

চিত্র -৬৬

চিত্র -৬৭

Dhaka University Institutional Repository

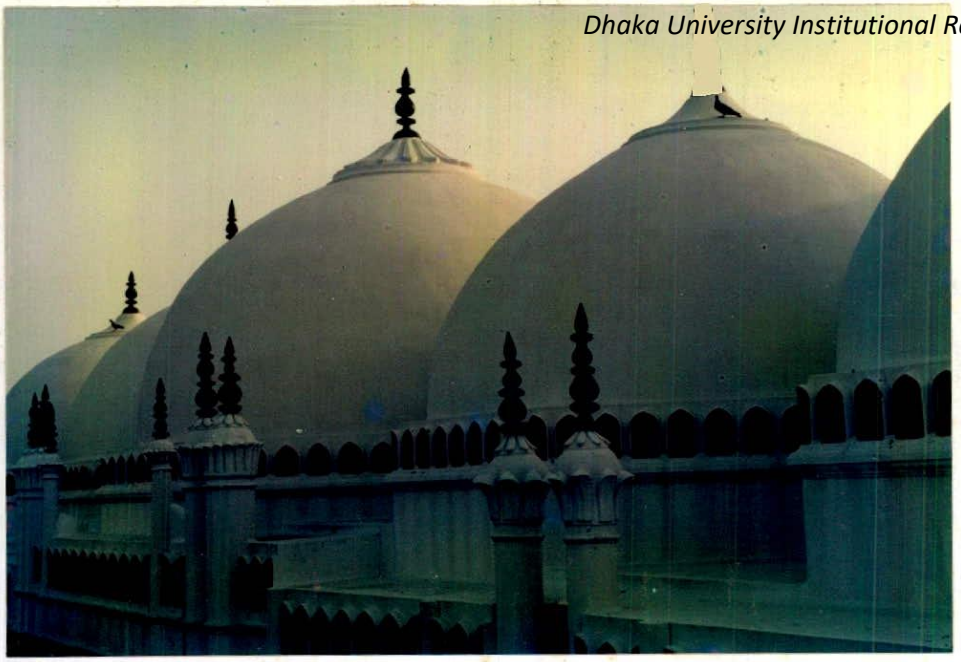

চিত্র -৬৮

চিত্র -৬৯

চিত্র -৭০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৭১

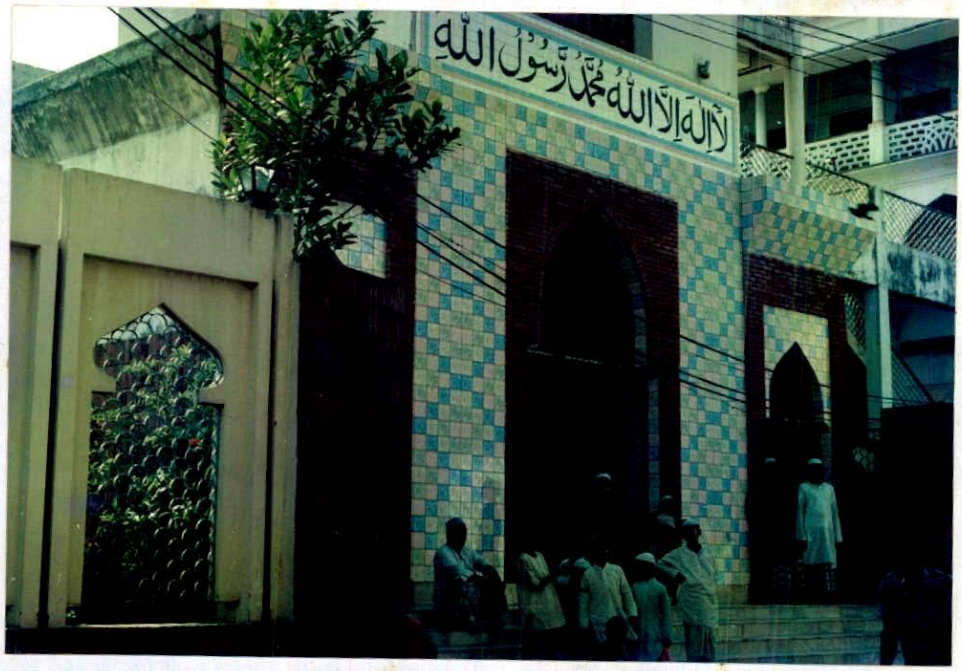

চিত্র -৭২

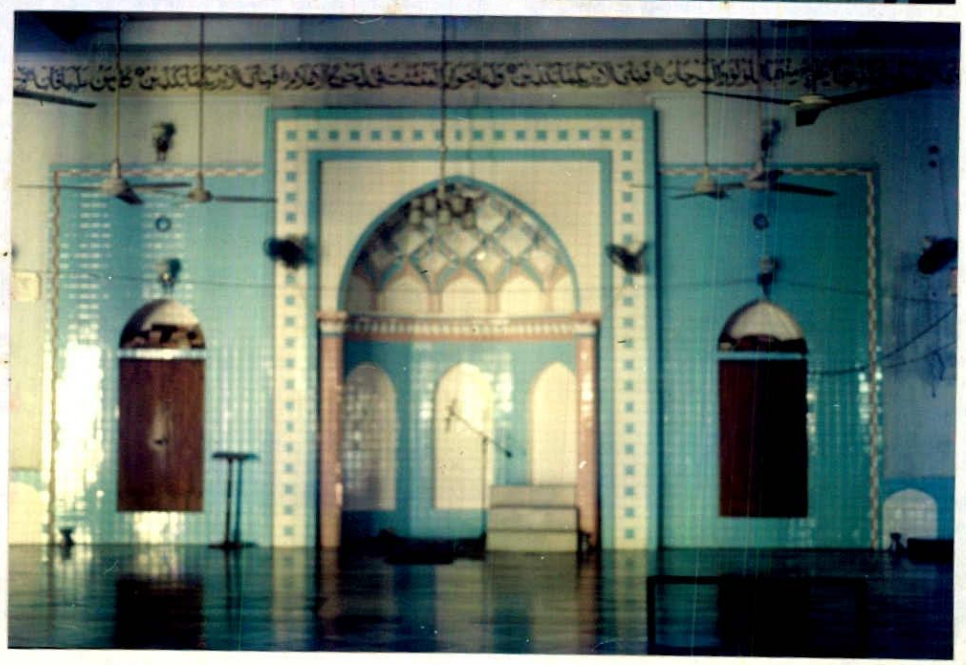

চিত্র -৭৩

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৭৪

চিত্র -৭৫

Dhaka University Institutional Repository

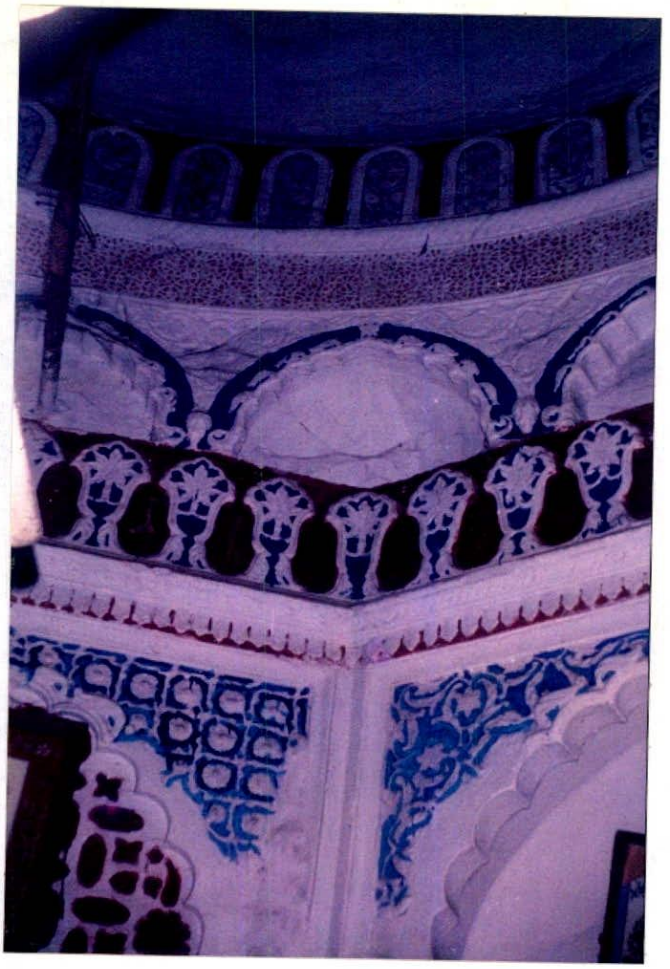

চিত্র -৭৯

চিত্র -৮০

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৮১

চিত্র -৮২

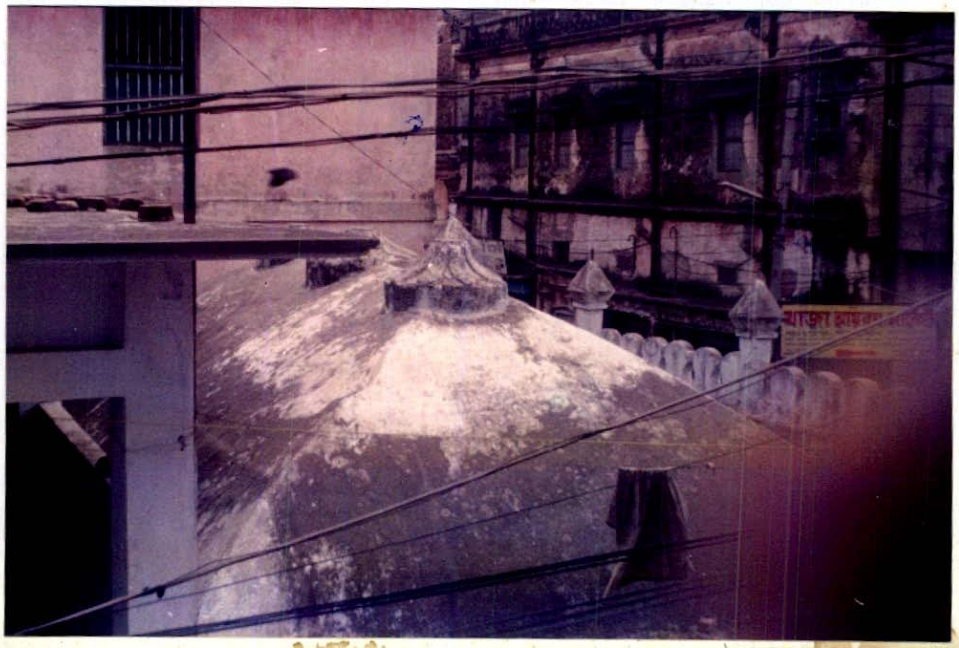

চিত্র -৮৩

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৮৪

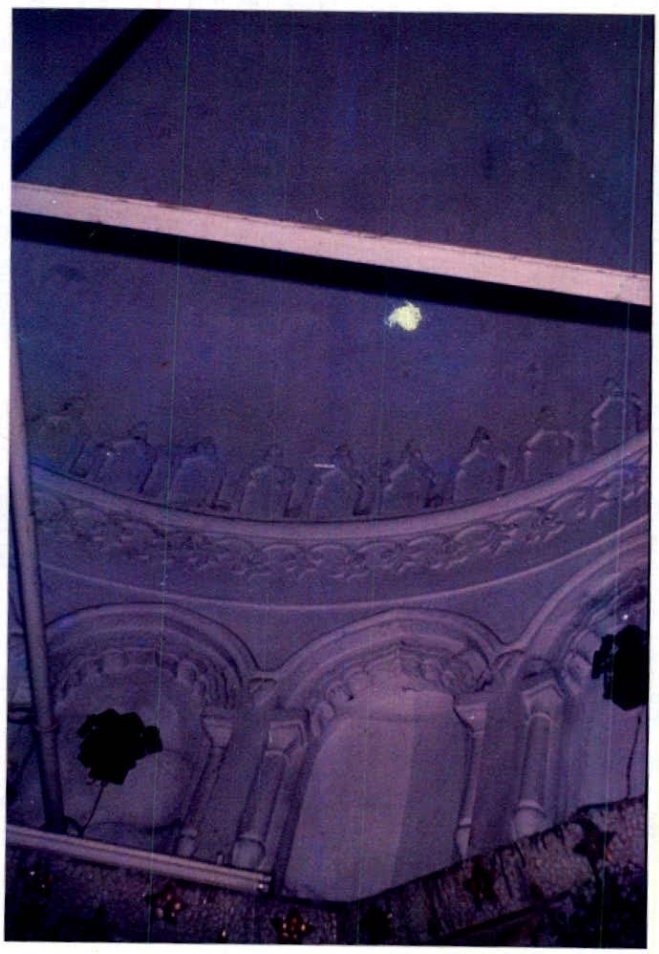

চিত্র -৮৫

Dhaka University Institutional Repository

চিত্র -৮৬

চিত্র -৮৭

চিত্র -৮৮

Dhaka University Institutional Repository

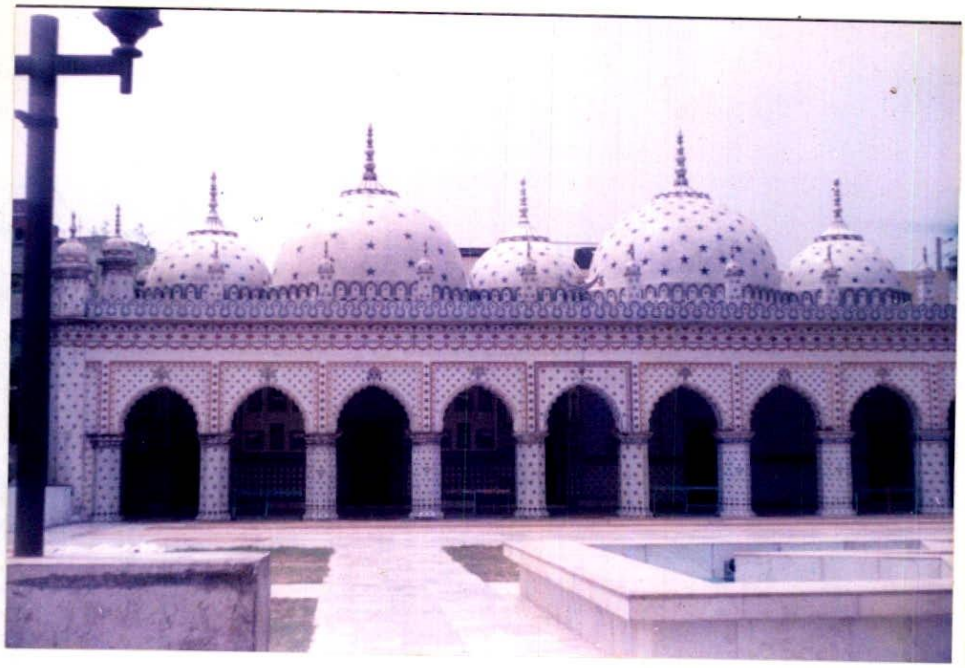

চিত্র -৮৯

চিত্র -৯০

Dhaka University Institutional Repository

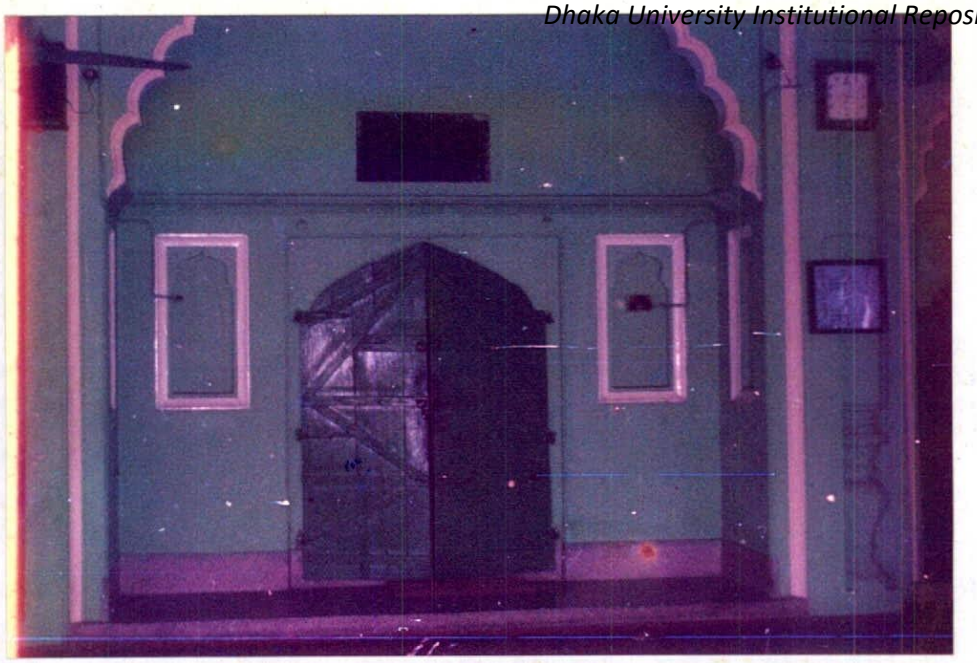

চিত্র -৯১

চিত্র -৯২

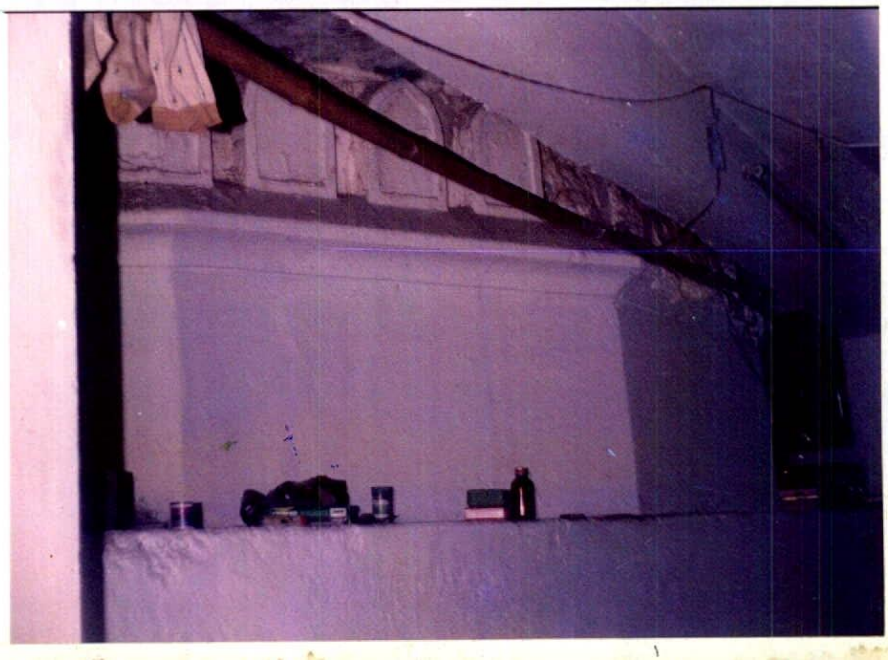

চিত্র -৯৩

Dhaka University Institutional Repository

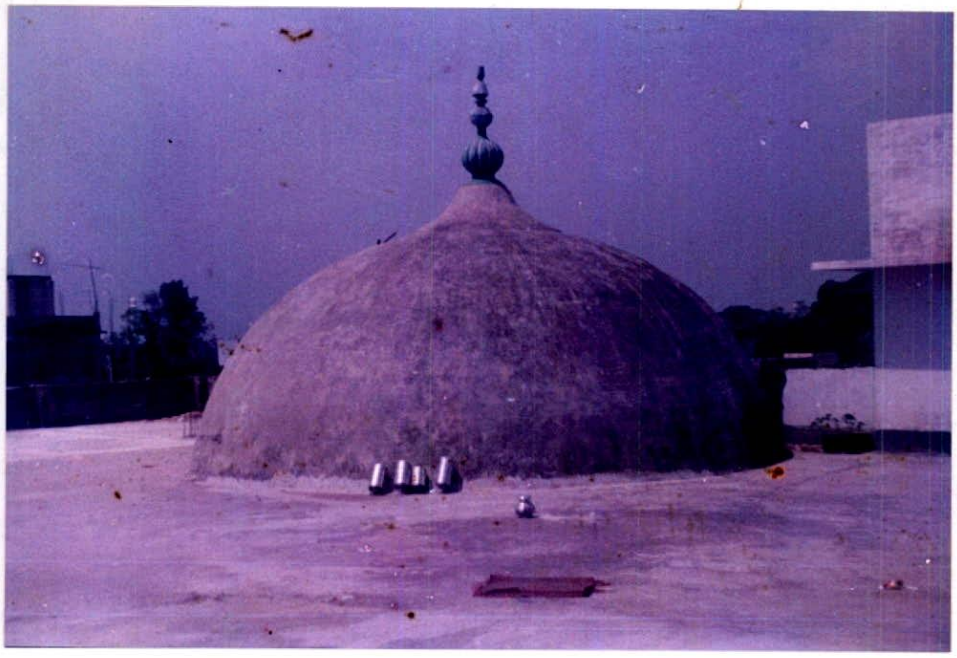

চিত্র -৯৪

চিত্র -৯৫

Dhaka University Institutional Repository

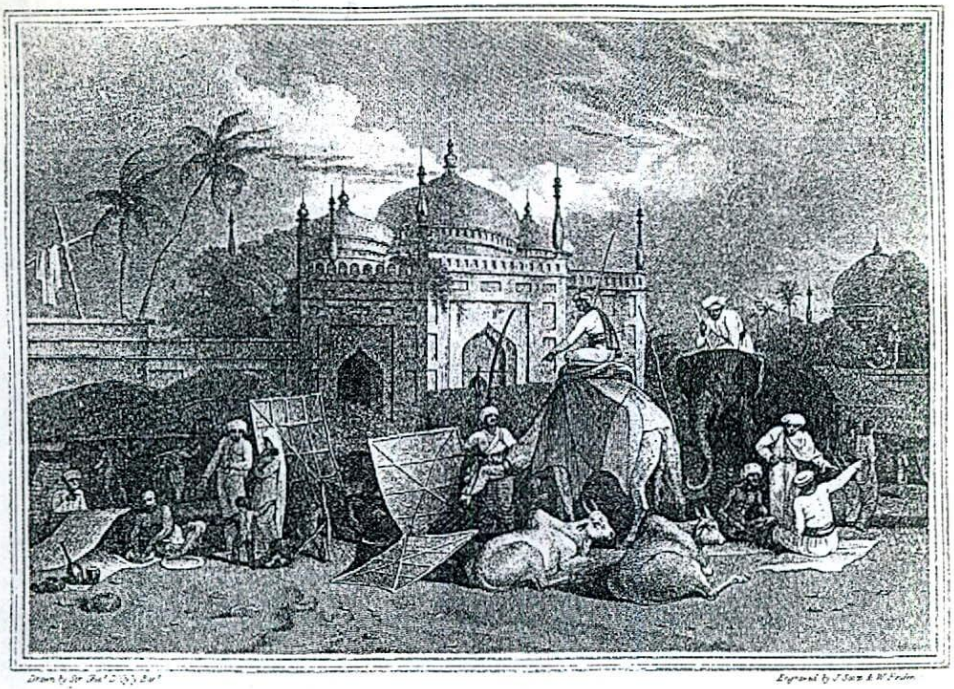

THE CHOUK, or Market Place, and HUSSEINEE DELAUN.

চিত্র -৯৬

THE SMALL KUTTRA WITH ITS ENCLOSED MOSQUE . DACCA.

চিত্র -৯৭

Dhaka University Institutional Repository

Proof

MOSQUE IN THE SUBURBS OF DACCA,

চিত্র -৯৮

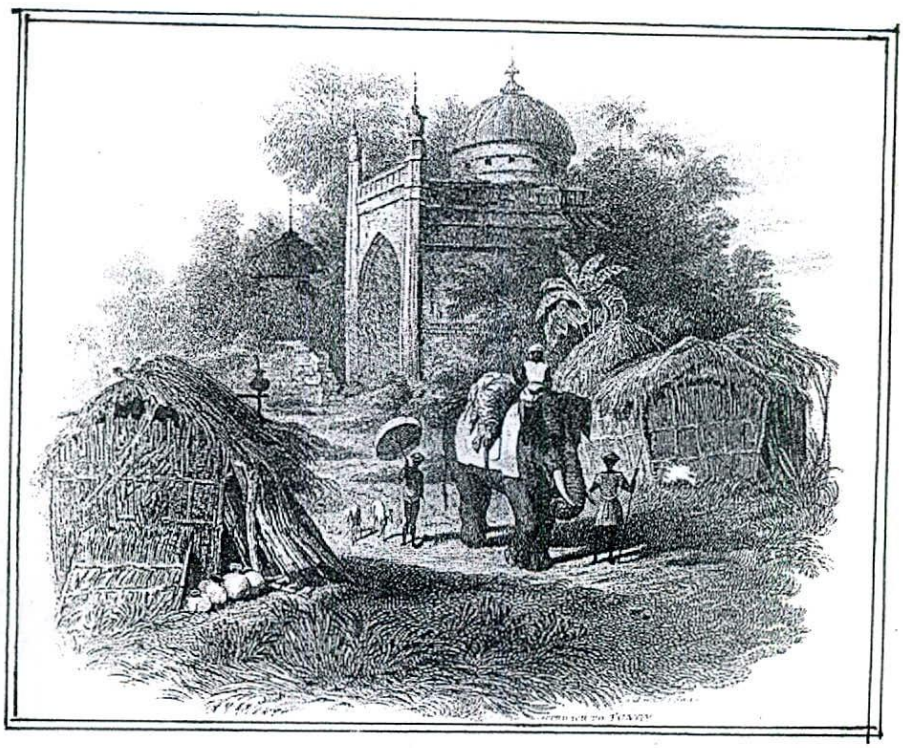

চিত্র -৯৯

Dhaka University Institutional Repository

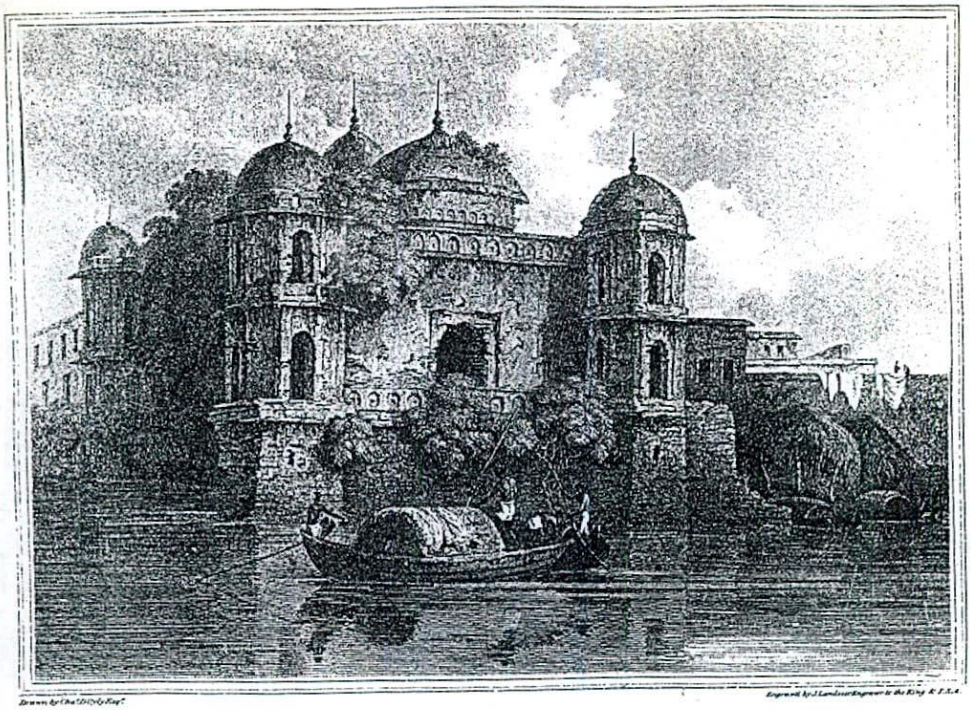

MOSQUE on the BOORAGUNGA BRANCH of the GANGES.

চিত্র -১০০

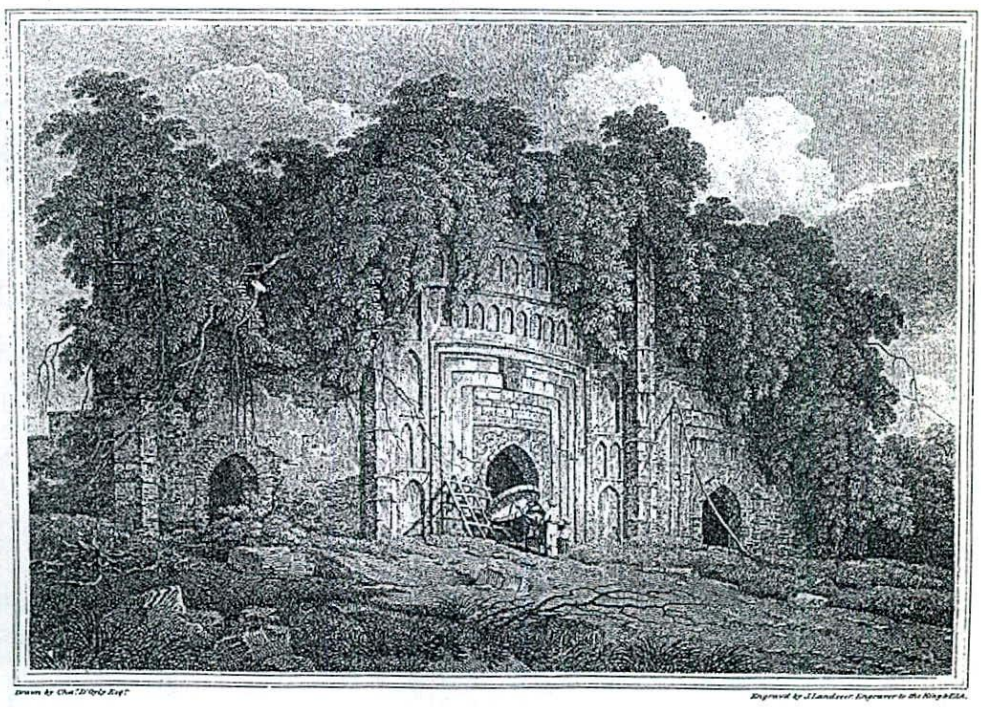

MOSQUE OF STUFF KHAN DACCA.

চিত্র -১০১

Dhaka University Institutional Repository

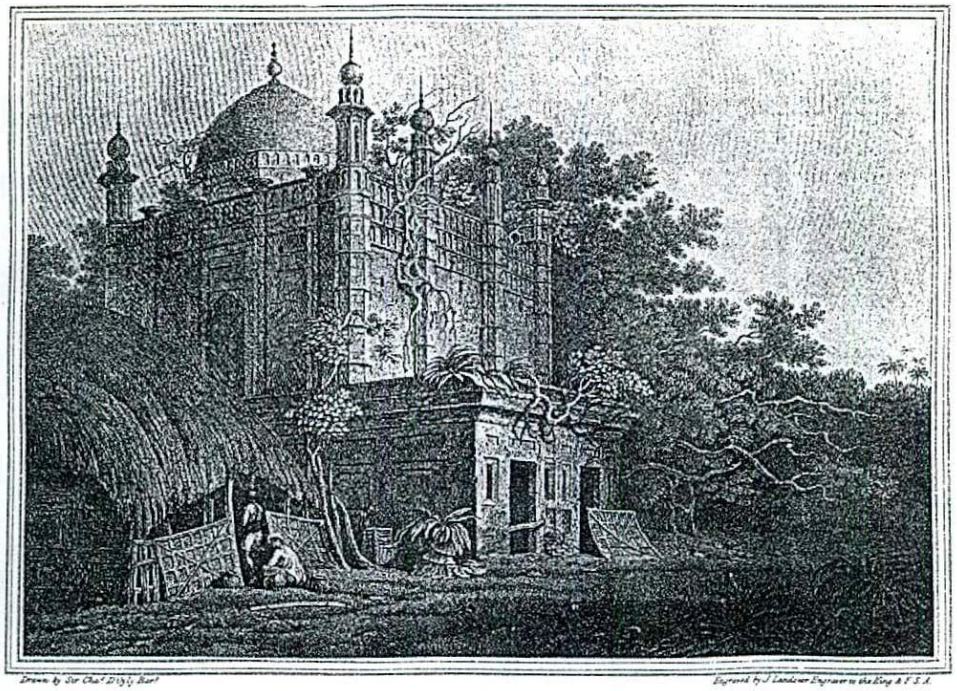

MOSQUE ON THE MUG-BAZAR ROAD, DACCA.

চিত্র – ১০২

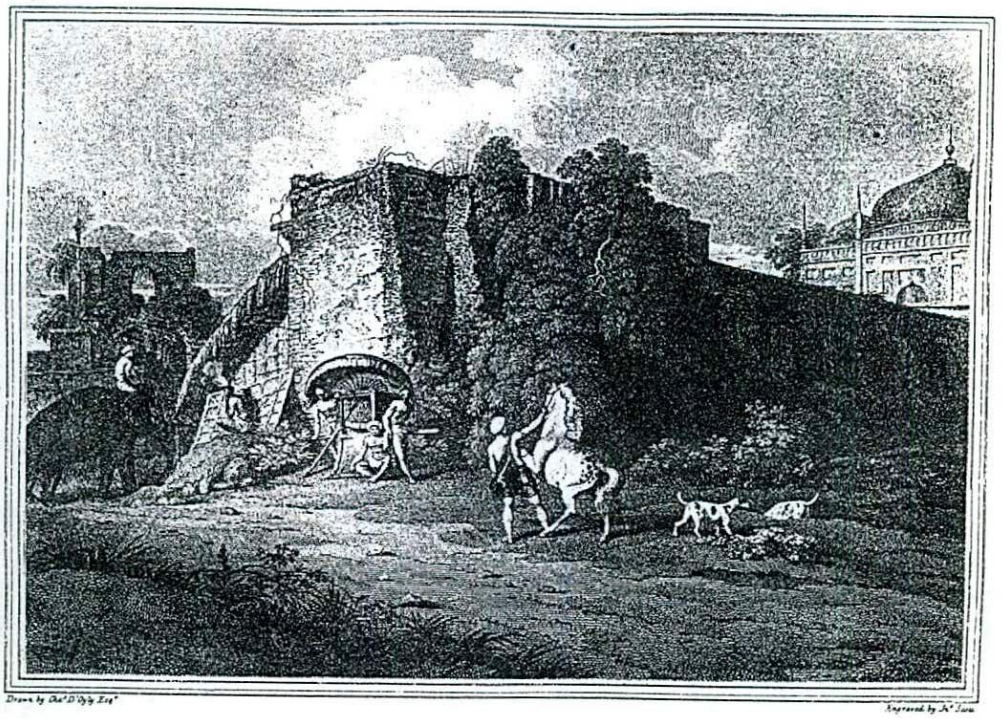

THE FORT, & G. GATEWAY OF THE GREAT KUTTRA, DACCA.

চিত্র – ১০৩

Dhaka University Institutional Repository

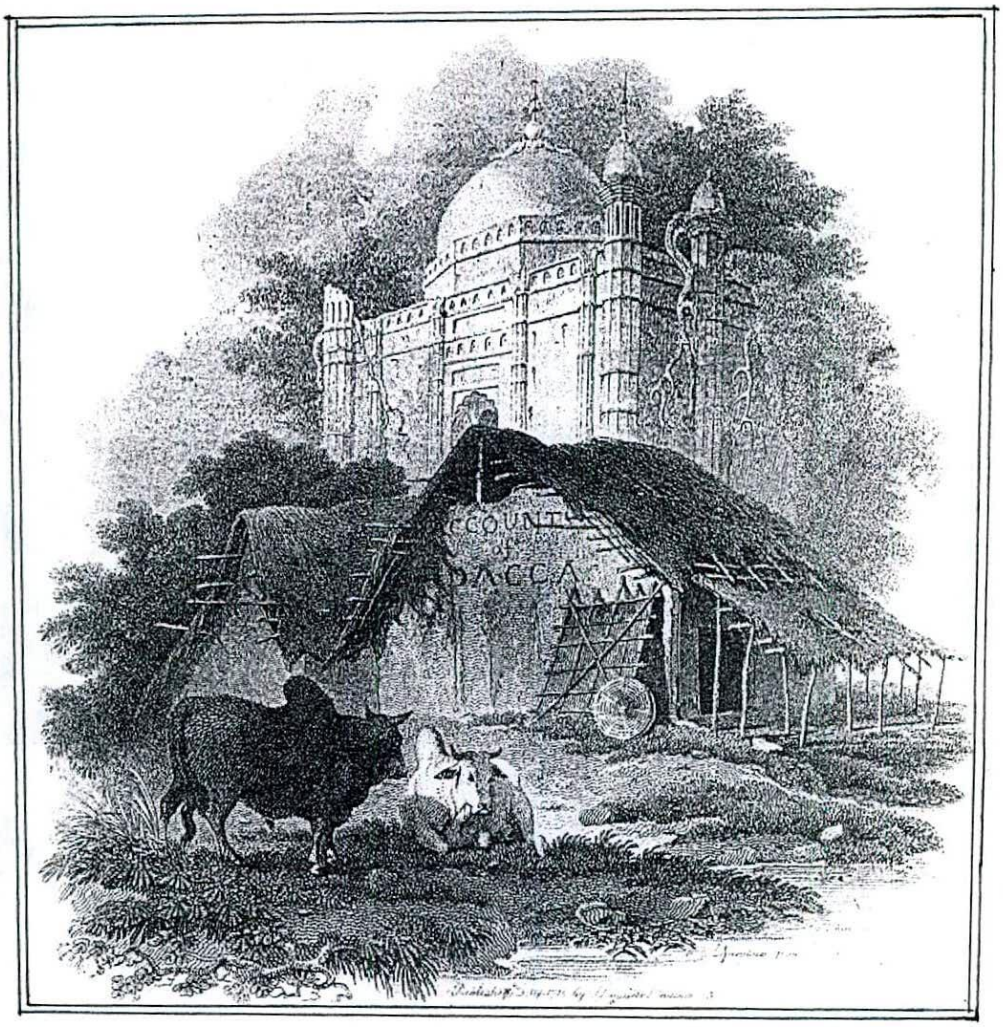

চিত্র—১০৪

Dhaka University Institutional Repository

গ্রন্থপঞ্জী

বাংলা ঃ

১। আব্দুল করিম, *ঢাকাই মসলিন,* ঢাকা, ১৯৬৫

২। কেদার নাথ মজুমদার, *ঢাকার বিবরণ,* ঢাকা, ১৯১০

৩। চার্লস ড'য়লী, *ঢাকার প্রাচীন নিদর্শন,* শাহ্ মুহাম্মদ নাজমুল আলম (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৯১

৪। নির্মল গুপ্ত, *ঢাকার কথা,* কলকাতা, ১৯৪০

৫। নাজির হোসেন, *কিংবদন্তীর ঢাকা,* ঢাকা, ১৯৭৬

৬। মুহাম্মদ আব্দুর রশীদ, *ঢাকা নগরীর মসজিদ নির্দেশিকা,* ঢাকা, ১৯৮৭

৭। মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী,* ঢাকা, ১৯৯৩

৮। মুনতাসীর মামুন, *ঢাকার কথা,* চট্টগ্রাম, ১৯৮১

৯। ডঃ মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, ডঃ আব্দুর মমিন চৌধুরী, ডঃ এ, বি, এম মাহমুদ, ডঃ সিরাজুল ইসলাম, *বাংলাদেশের ইতিহাস,* ঢাকা, ১৯৭৭

১০। মোঃ মুনিরুজ্জামান (সম্পাদিত), *ঢাকার লোক কাহিনী,* ঢাকা, ১৯৬৫

১১। রহমান আলী তায়েস, *তাওয়ারিখে ঢাকা,* আ, স, ম, শরফুদ্দীন (অনুদিত), ঢাকা, ১৯৮৫

১২। রফিকুল ইসলাম, *ঢাকার কথা,* ঢাকা, ১৯৮২

১৩। সরলানন্দ সেন, *ঢাকার চিঠি,* কলকাতা, ১৯৭২

Dhaka University Institutional Repository

English

1. Ahmed Hasan Dani, *Dacca A Record of its Changing Fortune (2nd Edn.)* Dhaka, 1962
2. " *Muslim Architecture in Bengal*, Dhaka, 1961.
3. Abdul Karim, *Dacca the Mughal Capital,* Dhaka, 1964.
4. " *Corpus of the Arabic and Persian Inscriptions of Bengal,* Dhaka, 1992.
5. " *Murshid Kuli Khan and his time*, Dhaka, 1963.
6. Azimusshan Haider, *Dacca, History and Romance in place names,* Dhaka, 1967.
7. Abul Fazal, *The Akber Nama, (Translated by H. Beveridge) Delhi,* 1972.
8. Allan, B. C. *Dacca,* Allahabad, 1912.
9. A. B. M. Husain, *Fathpur - Sikri and its Architecture,* Dhaka, 1970.
10. Abu H. Imamuddin, *Architectural Conservation Bangladesh*, Dhaka, 1993.
11. Bradly - Birt, *The Romance of An Eastern Capital,* London, 1906.
12. Blochman, *H. Contributions to the Geography and History of Bengal,* Calcutta, 1968.
13. Clay, *History and Statistics of Dacca Division,* Calcutta, 1868.
14. Enamul Haque, *Glimpses of the Mosques of Bangladesh,* Dhaka, 1985.
15. Hridayanath Majumder, *Riminiscences of Dacca,* Culcutta, 1926.
16. James Taylor, *Topography and Statistics of Dacca,* Culcutta, 1840.
17. Mirza Nathan, *Baharistan-i-Ghaybi,* (Transtaled by M. I. Borah), Assam, 1936.

Dhaka University Institutional Repository

18. Nazimuddin Ahmed, *The Mughal Monuments of Dhaka,* Dhaka, 1984.

19. " *Mughal Dacca and the Lalbagh Fort,* Dhaka, 1984.

20. Percy Brown, *Indian Architecture,* Bombay, 1981 (7th edn)

21. Rajput, A. B. *Architecture in Pakistan,* Karachi, 1966.

22. Sayed Aulad Hasan, *Notes on the Antiquities of Dacca,* Dhaka, 1904.

23. Sayed Mahmudul Hasan, *Muslim Monuments of Bangladesh,* Dhaka, 1991.

24. " *Glimpses of Muslim Art and Architecture,* Dhaka, 1988.

25. " *A Guide to Ancient Monuments of East Pakistan,* Dhaka, 1970.

26. " *Dacca, Gateway to the East,* Dhaka, 1983.

27. " *Mosque Architecture of Pre-Mughal Bengal,* Dhaka, 1979.

28. S. M. Taifoor, *Glimpses of Old Dhaka,* Dhaka, 1956.

29. Sharifuddin Ahmed, *Dacca, A Study in Urban History and Development,* London, 1986.

30. Sharifuddin Ahmed (ed.) *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, 1991.

31. Wheeler, R. E. M., *Five Thousand years of Pakistan,* London, 1950.

Articles

1. Abdul Karim, 'The Inscription of Khan Md. Mirdha's Mosque of Dhaka,' *Journal of the Asiatic Society of Pakistan,* Vol: Ix, No. 2, Dhaka, 1966

2. Abdul Karim, 'Origin and Development of Mughal Dhaka,' in Sharifuddin Ahmed (ed.) *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, 1991

Dhaka University Institutional Repository

3. A. M. Chowdury, Shabnam Faruqui, 'Physical Growth of Dhaka City,' in Sharifuddin Ahmed (ed.) *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, 1991.

4. Allen B. C, *Eastern Bengal District Gazetters : Dacca,* Allahabad, 1912.

5. Abu Imam, 'Origin of the name of Dhaka; *Journal of the Asiatic Socity of Pakistan,* Vol.-III, Dhaka, 1958.

6. Abdul Quader, 'Dacca, its Origin as City and Capital.' *Morning News,* Dhaka, August 14, 1959.

7. Dutt, 'Echos from Old Dhak,' *Bengal Past and Present,* Vol. - 3, Calcutta, 1909.

8. H. E. Stapleton, 'Contributions to the History of Ethnology of North Eastern India, The Antiquity of Dacca.' *Journal and the Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* Vol.-6, Calcutta, 1910.

9. K. M. Mohsin, 'Commercial and Industrial Aspects of Dhaka in the Eighteenth Century,' in Sharifuddin Ahmed (ed.) *Dhaka Past Present Future,* Dhaka, 1991

10. Khaleda Rashid, Mosques of Dhaka, *The Daily Star,* March, 17, Dhaka, 1995.

11. Monomohan Chakravarti, 'Notes on Gour and other Places in Bengal,' *Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal,* Vol.- 5, Calcutta, 1909.

12. Muhammed Fazil Pahariani, 'Dhaka ki Gholi (Lanes of Dhaka), *Morning News,* Dhaka, October, 1951.

13. Md. Abdul Bari, 'Mughal Mosques of Dhaka A typalogical Study,' in Sharifuddin Ahmed (ed.) *Dhaka Past Present Future*. Dhaka, 1991.

14. Nalini Kanta Bhattasali, 'Some Facts about Dacca,' *Bengal Past and Present*, Vol.- 51, Calcutta, 1936.

15. Parween Hasan, ' Eight Sultanate Mosques of Dhaka,' *Islamic Art Heritage of Bangladesh*, UNESCO, 1984.

16. Patrick Geddes, Report on Town Planing Dacca, *Bengal Secretariate Book Report*, Calcutta, 1917.

17. Qanungo, '*Dacca and its medieval History*,' *Bengal Past and Present*, Vol.-66, Calcutta, 1946-47.

18. Rankin, J. T., Dacca Dairies, *From the Journals and Proceedings, Asiatic Society of Bengal*, Calcutta, 1920.

19. Roxana Hafiz, 'Khan Muhammad Mridha's Mosque,' in Abu H. Imamuddin and Karen Longeteig (ed.) *Architecture and Urban Conservation in the Islamic World*, Switzerland, 1990.

20. Shaheda Rahman Imam, Muntassir Mamun, 'Architectural Conservation in Practice,' in Abu H. Imamuddin (ed.) *Architectural Conservation Bangladesh*, Dhaka, 1993.

21. S. M. Taifoor, 'The Precious Stones,' *Morning News*, Dhaka, December, 11, 1955.